প্রথম পরিচ্ছেদ

কৌশুলী সাহেব

সুশীল চাটার্জ্জী মস্ত ব্যারিষ্টার। বারো বৎসরে যে প্র্যাকটিশ গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে সকলেই আশা রাখে, অচির-ভবিষ্যতে মিষ্টার চাটার্জ্জি…

সম্প্রতি একটা বড় মকর্দ্দমা করিতে তিনি চাটগাঁ গিয়াছিলেন; চিটাগঙ্গ-মেলে সদ্য কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। ফিরিয়া গৃহিণীকে গৃহে দেখিলেন না; বয়কে প্রশ্ন করিলেন,—মেম-সাব কোথায়?

বয় জানাইল, বেলা পাঁচটায় তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—একলা?

বয় জানাইল, না; আরো দুজন মেম সাহেব এবং এক জন সাহেব সঙ্গে গিয়াছেন।

সুশীল চাটার্জ্জী স্নানের ঘরে গেলেন; ফিরিয়া ডিনার্-টেবলে বসিলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে ন'টা।

চাটার্জ্জী বলিলেন,—তারক বাবুকে খপর দে।

তারক আসিল। তারক—চাটার্জ্জী-সাহেবের বাবু।

সুশীল চাটার্জ্জি কহিলেন,—এখানকার খপর কি? সলিমন বিবির মকর্দ্দমার তারিখ কবে? ক্যালকাটা ড্রাগিষ্ট্ কোম্পানির সেই ইন্‌জাংশন্ অর্ডার?

তারক যথাযথ সংবাদ দিল; কহিল,—শিম্পশন্ সাহেব নিজে আজ ছ'বার চেম্বারে এসেছিলেন। তাঁদের অফিসের একটা জরুরি মোশন আছে। আমায় বলেচেন, আপনি এলে তাঁকে যেন তখনি ফোন করি।

চাটার্জ্জী সাহেব কহিলেন,—করো ফোন।

কুণ্ঠিতভাবে তারক কহিল—এই রাত্রে? এত পরিশ্রম হয়েছে...

হাসিয়া চাটার্জি-সাহেব কহিলেন—কিছু না। লক্ষ্মীকে কখনো সরিয়ে রাখতে নেই, তারক। তুমি ফোন করো। বলো, সাহেব ফিরেচেন—যখন খুশী, দেখা হতে পারে।

তারক গিয়া সাহেবের গৃহে ফোন করিল। সাহেব গৃহে নাই। খানশামা জবাব দিল, ক্লাবে গিয়াছেন। ক্যালকাটা ক্লাব।

শিম্পশন বড় এটর্ণি; শিম্পশন এ্যাণ্ড জোন্স্ ফার্ম্মের অংশীদার।

তারক আসিয়া চাটার্জি-সাহেবকে সংবাদ দিল, সাহেব ক্লাবে।

চাটার্জির ভোজন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। চাটার্জী-সাহেব কহিলেন,—তুমি ক্লাবে ফোন করো।

তারক গিয়া আবার ক্লাবে ফোন করিল। সাহেবকে পাওয়া গেল। তারক সংবাদ দিল, চাটার্জী-সাহেব ফিরিয়াছেন; কথা কহিতে চান্।

শিম্পশন্-সাহেব কহিলেন,—অল্ রাইট।

চাটার্জী-সাহেব আসিয়া রিশিভার ধরিলেন। শিম্পশন্ কহিলেন,—জরুরি ব্যাপার।

উত্তরে চাটার্জ্জী সাহেব বলিলেন,—প্রয়োজন হইলে আজ এই রাত্রে কাগজ-পত্র দেখা যাইতে পারে।

শিম্পশন কহিলেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইবেন। জানাইলেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে সাহেব আসিতেছেন কাগজ-পত্র সমেত।

অগ্রবাতনা

ভোজন শেষ করিয়া চাটার্জী সাহেব লাউঞ্জে আসিয়া বসিলেন। মন ভালো নয়। মিসেস্ চাটার্জী এখনো ফিরিলেন না! রাত প্রায় দশটা। কোথায় এমন মিটিং করিয়া বেড়াইতেছেন...?

মিসেস্ চাটার্জী গ্রাজুয়েট—শ্রীমতী ফুল্লরা দেবী, বি-এ। যেমন-তেমন বি-এ নন্; ইংলিশে ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্শ লইয়া পাশ করিয়াছেন।

দেশের যে-কাজে যখন ডাক আসে, তিনি গিয়া দাঁড়ান। পলিটিক্স হইতে সুরু করিয়া নারী-ধর্ম্ম-রক্ষা সমিতি, মায় গো-রক্ষিণী সভায় মিটিংয়ে পর্য্যন্ত। এ দিকে স্বামীর ঢালাও-হুকুম আছে। চাটার্জী-সাহেব বলিয়া দিয়াছেন, যে দিন-কাল পড়িয়াছে, তাহাতে শুধু ঘরের ছোট গণ্ডীটুকু লইয়া মাতিয়া থাকিলে নারীর চলিবে না; সকল কাজে তাঁকে পুরুষের সহকর্ম্মিণী হইতে হইবে। তাঁর নিজের অবসর অল্প; অতএব তাঁর প্রতিনিধি হইয়া দেশের কাজে মিসেস্ চাটার্জীর দাঁড়ানো চাই। তবেই না দুজনে মিলিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন!

ফুল্লরা দেবী স্বামীর দেওয়া এই স্বাধীনতার সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেজন্য দেশের নানা কাজে তাঁহাকে...

এতখানি স্বাধীনতা দেওয়া-সত্ত্বেও সুশীল চাটার্জী গৃহে ফিরিয়া ফুল্লরা দেবীকে না দেখিয়া আজ একটু চঞ্চল হইলেন। দু'দিন গৃহে ছিলেন না। সেখানে খুব পরিশ্রম গিয়াছে। মন একটু বিরাম চাহিতেছিল। মনে হইতেছিল, প্রথম যৌবনে ফুল্লরা দেবী গানের ছন্দে প্রাণে যেমন আরাম রচিয়া দিতেন, আজ যদি তেমনি আবার...

কিন্তু উপায় নাই। অনেকখানি পথ একলা চলিয়া আসিয়া আসিয়াছেন। পাশে কেহ আছে কি না, দেখেন নাই। আগে

...থার থাকিবার কথা, তাঁকে আরো পাঁচটা কাজে জিনিষ প্রস্তুত করি পাশ হইতে বিদায় দিয়াছেন। অহরহ পাশে থাকিবার জন্ত আজ তাঁ ফিরাইয়া আনা হয়তো এখন সম্ভব নয়!

তবু...

ঘড়ির দিকে চাহিলেন। রাত্রি দশটা বাজিয়া ছত্রিশ মিনিট কোথায় আছে ফুল্লরা?

শিম্পশন সাহেব আসিলেন—একা। তাঁর হাতে এক গা কাগজ। সাহেবকে লইয়া সুশীল চাটার্জী আইনের জটিল গহনে প্রবে করিলেন। নিঃসঙ্গ মন অবলম্বন পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেল।

শিম্পশন সাহেব কহিলেন, মক্কেলটি মুসলমান। মস্ত জমিদারে জামাই। তরুণ বয়স। শ্বশুর মারা গিয়াছে। শাশুড়ীর পিছু দু'চারিটা ফন্দীবাজ আত্মীয় জুটিয়াছে। তারা চায় শাশুড়ীর নি দিতে। সেজন্য শাশুড়ীকে নিমন্ত্রণ-ছলে এক ধনী আত্মীয়ের গৃ লইয়া গিয়া আটক করিয়াছে। নিকার আয়োজন পাকা। নি ঘটাইতে পারিলে সম্পত্তির অনেকখানি তারা ছিনাইয়া বাহির করি লইবে,—যেহেতু স্ত্রীর হক্ সামান্য নয়! ব্যাপার খুব জরুরি! সম্ভ হইলে কালই হাইকোর্টে মোশন করিয়া...

ব্যারিষ্টার চাটার্জী কহিলেন,—নিশ্চয়। এফিডেভিট তৈরী?

এটর্ণি শিম্পশন কহিলেন,—সব আমি ড্রাফ্ট্ করিয়া রাখিয়াছি শুধু আপনাকে পাওয়ার ওয়াস্তা।

চাটার্জী সাহেব বিপুল অধ্যবসায়ে একগাদা মোটা বহি লইয়া সেগুলার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। মাহমেডান্ আইন ও ব নজির-পত্র দেখিয়া এফিডেভিটের দু'চারিটা ছত্রে কাটকুট্ করিয়া দিলেন; পরে দরখাস্ত যথারীতি মুশাবিদা হইলে এটর্ণিকে বলি

দিলেন,—সবুজ তৈরী রাখুন। কাল বোধনের দিন আছে। কিন্তু শাশুড়ীর মনের ভাব যদি...

শিম্পশন কহিলেন,—জামাই বলিতেছে, একবার যদি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় তো মায়ের মন টলিবেই। মেয়ের নাম জিন্নৎ বেগম। জিন্নৎ তাঁর একমাত্র সন্তান।

চাটার্জী-সাহেব কহিলেন,—রাইট ও!

শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া শিম্পশন-সাহেব বিদায় লইলেন। রাত্রি তখন এগারোটা বাজিয়া বারো মিনিট।

চাটার্জী সাহেব এক তলার বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। মনে-মনে নিকা-মামলার পয়েণ্টগুলার বিচার চলিতেছিল। পাঁচ মিনিট সময় কাটিয়াছে,—প্রকাণ্ড উল্‌স্‌লি-কার আসিয়া পর্চ্চের সামনে দাঁড়াইল। ফুল্লরা দেবী গাড়ী হইতে নামিলেন।

স্বামীকে বারান্দায় দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন,—এখনো তুমি জেগে আছ?

সুশীল চাটার্জী গম্ভীর দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—এত রাত্রি পর্য্যন্ত তোমাদের কিসের মিটিং চলছিল?

ছলাৎ করিয়া ফুল্লরা দেবীর কপোলে রক্তের মৃদু তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—মিটিং ছিল নারী-রক্ষা সমিতির। আটটায় মিটিং ভাঙ্গলো। তারপর বিধু সান্ন্যাল, তার স্ত্রী—আরো সকলে ধরলো, ওরা চ্যারিটি প্লের বন্দোবস্ত করচে, নারী-রক্ষা সমিতির ফণ্ড তোলবার জন্য—নিয়ে গেল ধরে সেই ধর্ম্মতলায়; সেখানে রিহার্শাল হচ্ছে—তাই দেখবার জন্য। রিহার্শাল ভাঙতে ফিরে আসচি। আসবার সময় আবার সেই গড়িয়া-হাটে যেতে হলো।

আমার গাড়ীতে ছিলেন হারীৎ বাঁড়ুয্যে—তাঁকে নামিয়ে দিয়ে এলুম।

—হারীৎ বাঁড়ুয্যে! সুশীল চাটার্জী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। কহিলেন, —কে হারীৎ? সেই শম্ভু বাঁড়ুয্যে ষ্টেভেডোর ছিলেন, তাঁর ছেলে?

ফুল্লরা দেবী কহিলেন,—হ্যাঁ।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—তোমাদের সভায় সে এসে জুটলো কোথা থেকে?

ফুল্লরা দেবী কহিলেন,—সে এই থিয়েটারের অর্গাইনাজার। অনেক বনেদী ঘরের সঙ্গে তার মেলামেশা আছে। প্লের জন্য মেয়ের দল সে জোগাড় করেচে। দলটি ভালো—বাছাই চেহারা। প্লে হবে 'চন্দ্রাবলী'। ভালোই হবে, মনে হয়। মিসেস গুহ আগাগোড়া গান শেখাচ্ছেন। মিষ্টার রহমন বলে একজন মুসলমান ভদ্রলোক নাচ গান শেখাবার ভার নিয়েচেন। শুনলুম, ইনি ট্রান্স-গ্যাঞ্জেটিক ফিল্ম কর্পোরেশনের একজন ডাইরেক্টর। নাচটা জানেন ভালো। নমুনা যা দেখলুম...কিন্তু আমি ভারী ক্লান্ত তার উপর খুব ক্ষিদে পেয়েচে। তোমার খাওয়া হয়েছে?

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—হাঁ।

ফুল্লরা দেবী কহিলেন,—'তাহলে আমার কাছে বসবে, চলো। খেতে খেতে আমি গল্প করবো। কিন্তু তার আগে পাঁচ মিনিট—মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে আসি।

ফুল্লরা দেবী ক্ষিপ্র চরণে চলিয়া গেলেন। সুশীল চাটার্জী লাউঞ্জে একখানা বেতের চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। জ্যোৎস্নায় চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। দূরে কে ফ্লুট বাজাইতেছিল। সে সুরে বাতাসে বেদনার করুণ আভাস।

সুশীল চাটার্জী আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। মনের মধ্যে পুরানো দিনের বহু স্মৃতি প্রকাণ্ড ভিড় তুলিয়া অস্পষ্ট আব-ছাওয়ার মত জাগিয়া নিবিয়া সরিয়া সরিয়া চলিয়াছে।

ফুল্লরা দেবী আসিয়া সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলেন; কহিলেন,—এসো···

সুশীল চাটার্জী ভোজন-কামরায় আসিলেন। ফুল্লরা দেবী ডিনারে বসিলেন।

ফুল্লরা দেবী বলিলেন,—সত্যি, আজ যে-রিপোর্ট পড়া হলো, তা থেকে বুঝচি, বাঙলা দেশে কটা পরিবারই বা মেয়েদের স্বাধীনতা দেছে বলে গর্ব্ব করে! স্বাধীনতার মানে, ট্রামে-বাসে ঘোরা নয়, বা ছেলেদের সঙ্গে এক-কলেজে পড়তে দেওয়া নয়! বদমায়েসের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াবে, মেয়েদের সে মন, সে শক্তি কৈ? হট্‌হটিয়ে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি—কিন্তু কোনো বদমায়েস-শয়তান যদি আক্রমণ করে, অমনি সেই কামিনী ফুলের পাপড়ির মত ঝরে পড়া—তার প্রতিকার কিসে হয়, সেদিকে চেষ্টা কৈ? ইংরেজদের মেয়েরা যে যেখানে-খুশী বেড়িয়ে বেড়ায়, মনে এতটুকু ভয়-ডর নেই—তার কারণ, এ স্বাধীন-স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে আছে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রচণ্ড শক্তি। আমাদের স্বাধীনতার পিছনে সে শক্তি নেই।···কাজেই আমাদের নিরাপদ থাকবার উপায় কৈ? মেয়েদের মনে মর্য্যাদা-বোধ জাগানো চাই। তার দেহের উপর অপরে যেমন-খুশী পীড়ন করবে—যেন সে জামা, বা জুতো, ছাতা, বা ছড়ি!—এ তো ভালো কথা নয়। পুরুষকে বোঝানো দরকার,—তার পকেটে পার্শ থাকলে সে-পার্শ নেবার অধিকার যেমন অপরের নেই, তেমনি মেয়েদের উপর পুরুষের লোভ আর বাসনা জাগবামাত্র তাকে আত্মসাৎ করবে, সে অধিকারও পুরুষের নেই। পুরুষের যেমন নিজের সত্তা আছে, নিজস্ব মর্য্যাদা আছে, সম্ভ্রম আছে,

মেয়েদেরও তেমনি সত্তা, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম আছে! তাতে হস্তক্ষেপ করতে পুরুষের যে-আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষার মানে পীড়ন, অত্যাচার, পশুত্ব...নয় কি?

সুশীল চাটার্জী হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—মেয়ে-জাতের দেহের উপর যে সব দুর্বৃত্ত পুরুষ অত্যাচার করে, যুক্তি দিয়ে তাদের বুঝোতে চাও,—মনুষ্যত্ব কি? এ তোমাদের পাগলামি।

ফুল্লরা দেবী কহিলেন,—তাহলে প্রতিকারের উপায় তুমি কি বলো?

চাটার্জী সাহেব কহিলেন,—প্রহার।

কথাটা বলিয়া চাটার্জী সাহেব হাসিলেন।

ফুল্লরা দেবী কহিলেন,—ঠাট্টা করচো?

চাটার্জী সাহেব কহিলেন—জেলের ভয় আছে, তা বলে চোর চুরি ছাড়ে, ফুল্লরা? লোকে ঘৃণা করবে, তা ভেবে দুর্বৃত্ত তার লালসা দমন করে নিজেকে সংযত রেখেচে কোনোদিন? অসম্ভব। দুর্বৃত্ত আক্রমণ করতে এলে যে-নারী প্রহারে তাকে জর্জ্জরিত করতে পারবে, সে-ই শুধু পথে-ঘাটে একা নিরাপদে বেরুবার যোগ্য। আমাদের দেশে 'লাঠ্যোষধি' বলে যে-ব্যবস্থা আছে, এ-সব দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করতে সেইটিই হলো অমোঘ উপায়।

বিস্ফারিত নয়নে বিস্ময়-মগ্ন কণ্ঠে ফুল্লরা দেবী কহিলেন,—তাহলে তোমার মত, মোটা লাঠি-সোঁটায় সজ্জিত হয়ে মেয়েরা পথে বেরুবে?

ফুল্লরা দেবী হাসিলেন। চাটার্জী সাহেব কহিলেন,—তা ছাড়া আত্মরক্ষার জন্য উপায় আমি জানি না। কিন্তু শুধু সবল দুর্বৃত্তের দিক-টাই তুমি দেখচো ফুল্লরা। আর এক জাতের দুর্বৃত্ত আছে,—তারা অতি-সূক্ষ্ম কলাকৌশলে মেয়ে-জাতের দেহ-মনকে বিপর্য্যস্ত করে বেড়ায়।

তারা বর্ণচোরা—তাদের হাত থেকে নিরাপদ থাকা…তাতে প্রচুর বুদ্ধি আর কৌশলের প্রয়োজন।

ফুল্লরা দেবী সকৌতূহলে স্বামীর পানে চাহিলেন। চাটার্জী সাহেব কহিলেন,—এ-সব দুর্বৃত্ত ধোপদোস্ত পোষাক গায়ে এঁটে সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে—হাসি-ভরা মুখ, বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি! দেখলে ভদ্রতা-সৌজন্যের আদর্শ বলে মনে হয়। কিন্তু মনের মধ্যে ধারালো ছুরি! চেনবার উপায় নেই বলে এদের জন্য ভাবনা খুব বেশী।

ফুল্লরা দেবী মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—কৈ, তেমন লোক দেখেচি বলে মনে হয় না!

ফুল্লরা দেবী চুপ করিলেন। বয় পুডিং আনিয়া দিল, এক-চামচ মাত্র প্লেটে তুলিয়া ফুল্লরা দেবী কহিলেন,—আজ বড্ড রাত হয়ে গেছে। সত্যি, এত রাত অবধি তুমি কখনো জেগে থাকো না তো! একে এই লম্বা জার্নি তার উপর রাত্রি জাগা…আমার জন্য তোমার রাত হলো! আমায় ক্ষমা করো…

চাটার্জী সাহেব কহিলেন—আর কখনো এত রাত অবধি বাইরে থেকো না।

কথাটা ফুল্লরা দেবীর বুকে বিঁধিল ছুরির ফলার মত! জীবনে স্বামীর এই প্রথম নিষেধ-বাণী। কোনো দিন কোনো ব্যাপারে তিনি 'না' বলিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। ফুল্লরা দেবী কোনো জবাব দিলেন না। বুকের মধ্যে কোথায় ছোট একটা ঢেউ ফুটিয়া বহিয়া গেল—সমস্ত প্রাণকে দুলাইয়া, চমক দিয়া!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোড়ার কথা

এ সংসারের পরিচয় বুঝিতে হইলে আগেকার কথা জানা দরকার।

ব্রজেন্দ্র চৌধুরী ছিলেন নামজাদা স্কলার। অব্যবসায়ে পৈত্রিক জমিদারী জীর্ণ হইতেছিল, এমন সময় ব্রজেন্দ্রের সখ হইল, বিলাত যাইবেন। বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারী দিলেন; কিন্তু এ বিদ্যাটা পুরাণের কচের মত নিষ্ফল হইয়া রহিল। ব্যারিষ্টারী করা পোষাইল না। লোকে বলিল, বিদ্যার জাহাজ হইলে কি হইবে, চৌধুরী বড় মুখচোরা! কাজেই পাঁচজন এটর্ণির কৃপায় রিশিভারী করিয়া চৌধুরী নিজের কর্ম্ম-জীবন খাড়া রাখিলেন।

বিদ্যার আদর চৌধুরী জানিতেন। ছেলেমেয়েদের পণ্ডিত করিয়া তুলিতে তাঁর যত্ন ছিল অপরিসীম। কিন্তু নিজের যত্ন না থাকিলে শুধু মা-বাপের যত্নে কোন্ ছেলে-মেয়ে কবে লেখাপড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইয়াছে! চৌধুরীর দুটি ছেলে—নিশানাথ আর উষানাথ।

চৌধুরীর পত্নী চৌধুরাণী ছিলেন শান্ত স্বভাবের মেয়ে—সাত চড়ে কথা কহিতে জানিতেন না। সনাতন আব-হাওয়া স্বামীর বিদ্যার ভারে কোথাও নুইয়া টোল্ খায় নাই। ব্রজেন্দ্র চৌধুরী যখন পাঠ্য গ্রন্থ এবং নানা এষ্টেটের অপাঠ্য হিসাব-নিকাশ লইয়া মত্ত থাকিতেন, তখন সেই ফাঁকে পুত্র নিশানাথ এক খৃষ্টান-পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা পাকাইয়া তাহাদের ঘরে বিবাহ করিয়া বসিল। মা কাঁদিলেন। বাপ বলিলেন—

তাহাতে কি! ধর্ম্মানুষ্ঠানের এ ভেদ কিছুই নয়। এগুলোর অন্তরালে সব মানুষ সমান।

মা বুঝিলেন না, বলিলেন,—তাও কি হয়? একটা নিয়ম চলিয়া আসিতেছে!

মা যাহাই বুঝুন, ছেলে নিশানাথ গৃহে রহিল না। শ্বশুরের সুপারিশে কি একটা চাকরি লইয়া চলিয়া গেল সোজা সেই শীলোনে।

উষানাথ একটু জবরদস্ত প্রকৃতির। তাকে বশে রাখা ছিল দায়। মেয়ে দুটি—খুল্লনা আর ফুল্লরা। ছেলে দুটির লেখাপড়ায় চাড় ছিল না—সে জন্য ব্রজেন্দ্র চৌধুরী দুঃখ করিতেন; তাঁর সে দুঃখ মোচন করিয়াছিল মেয়েরা। দুটি মেয়েই লেখাপড়ায় ভালো। খুল্লনা ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিত,—সকলে বলিত, তরু দত্ত এ-জন্মে ব্রজেন্দ্র চৌধুরীর ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন!

বাপ মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটিয়া উষানাথকে বলিতেন,—তুমি শাড়ী পরে তোমার মায়ের কাছে ঘর-সংসারের কাজ শেখো বাপু—এর পরে দুই বোনের গলগ্রহ হয়ে থাকবে তো! ওদিক্‌কার কাজ একটু শিখে রাখো। ওরা তাহলে নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া করতে পারবে।

এ শ্লেষ-ব্যঙ্গের ঝাল উষানাথ তুলিত দুই বোনের উপর দিয়া। খুল্লনা মায়ের কাছে গিয়া নালিশ করিত। মা বলিতেন—ও ছেলে। ওর দুরন্তপনা সহ্য করতে হবে বৈ কি মা—যখন মেয়ে হয়ে জন্মেচো!

খুল্লনা ঝাঁজিয়া জবাব দিত—ছেলে বলে পীর—বটে!

হাসিয়া উষানাথ বলিত,—নিশ্চয়। ছেলের সাত খুন মাপ!

ফুল্লরার এগ্‌জামিন। লেখাপড়া লইয়া সে ব্যস্ত, উষানাথ আসিয়া বলিল—কাল ভোরে আমি চলেছি হাজারিবাগ। মোটর-এক্সকার্শন বন্ধুদের সঙ্গে···আমার হোল্ড-অল-ট্রাঙ্ক সব গুছিয়ে দে, ফুলি···

ফুল্লরা কহিল—কাল আমার এগজামিন, ছোটদা।

—এগজামিন তা হয়েচে কি! আমার কাজটা ফ্যালনা নয়!

ফুল্লরা কহিল—হিষ্ট্রী এগ্‌জামিন। আজ একবার গোড়া থেকে পাতাগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি, ছোটদা। নাও না ভাই, তুমি গুছিয়ে…

একে মেয়ে-মানুষ, তায় বয়সে ছোট। ঊষানাথ রাগিয়া উঠিল, বলিল—আমার সময় থাকলে তোমার খোসামোদ করতুম না। আমাকে বেরুতে হচ্ছে—দেখে-শুনে এক জোড়া গগ্‌লস্‌ আনতে হবে। না হলে মোটর-জার্নিতে চক্ষুরত্ন বাঁচানো দায় হবে। বুঝলে!

কথাটা সহজ। ফুল্লরা তবু বুঝিল না। বই খুলিয়া সে তখন ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য-পরিচ্ছেদে মনোনিবেশ করিয়াছে।

বোনকে সহজ কথা বুঝাইয়া ঊষানাথ গিয়াছিল মায়ের কাছে টাকা সংগ্রহ করিতে। টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে, ফুল্লরার খেয়াল নাই। হোল্ড-অল যেমন তেমনি পড়িয়া আছে—কাপড়-চোপড়ও ছত্রখান!

রাগ হইল। টানিয়া বইখানা ফুল্লরার হাত হইতে ছিনাইয়া লোষ্ট্রবৎ সে নিক্ষেপ করিল বাতায়ন-মধ্য দিয়া একেবারে বাহিরে রাস্তায়।

ফুল্লরার মনে হইল, বই নয়, যেন তার টুঁটি ধরিয়া তুলিয়া ছোটদা সবেগে পথে ছুড়িয়া দিয়াছে! বিস্ময়ের চমক কাটিবার পরক্ষণেই সে বলিল,—কি করলে, ছোটদা! সত্যি-সত্যি বইখানা ছুড়ে পথে ফেলে দিলে!

ঊষানাথ কহিল,—সত্যিই দিয়েচি।

ফুল্লরা কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিয়া সে বলিল,—আমি যাচ্ছি। গিয়ে বাবাকে বলে দিচ্ছি…

উষানাথ কহিল,—ওঃ, তবেই আমার ফাঁশির হুকুম হয়ে যাবে আর কি!

ফুল্লরা কহিল,—ফাঁশি যাও, কি কাশী যাও, সে বোঝাপড়া করো তুমি বাবার সঙ্গে…

অভিযোগে ব .রম্ভ—ফল লঘুক্রিয়া! ফুল্লরাকে বাপের ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া উষানাথ বাড়ী হইতে সরিয়া পড়িল। জানে, বাবা সাড়ে ন'টা বাজিলে শয়ন করেন—তার পূর্ব্বে এ সময়টুকু তার বাহিরে কাটিবে গগ্‌লশের সন্ধানে—তার পর কাল প্রত্যূষে হাজারিবাগ-যাত্রা! সুতরাং…

কিন্তু মুস্কিল বাধিল রাত্রি দশটায় গৃহে ফিরিয়া। ফুল্লরা আজ এ দৌরাত্ম্যের শোধ লইয়া ছাড়িয়াছে। হোল্ড-অল্‌টার সেলাই কাটিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া উষানাথ ডাকিল,—মা…

মা কহিলেন,—কেন?

উষানাথ কহিল,—তোমার পণ্ডিত মেয়ে দু'খানা বই পড়ে ধরাকে সরা দেখেচে না কি?

মা কহিলেন,—কেন? কি করেচে?

উষানাথ কহিল,—আমার হোল্ড-অল্‌টায় জিনিষ-পত্র ভরে রাখতে বলেছিলুম তোমার ঐ ফুলিকে। তা করা চুলোয় যাক্, হোল্ড অল্‌টার দশা কি করে রেখেচে, দ্যাখো…

মা দেখিলেন; দেখিয়া ডাকিলেন,—ফুলি…

ফুলি ওরফে ফুল্লরা তখনো টেবিলের সাম্‌নে বসিয়া বই পড়িতেছে। খুল্না শুইয়াছে। কাল তার এগজামিন নাই।

মার কথায় ফুল্লরা সন্ধ্যাবেলার কথা খুলিয়া বলিল। বলিল, ভৃত্যকে দিয়া বই কুড়াইয়া আনাইয়াছে—বইয়ের পাতা কাদায় কাদা! বইয়ের চেহারাখানা সে মাকে দেখাইল।

মা তখন উষার পানে চাহিয়া কহিলেন—তোর অন্যায়। কি বলে তুই ওর বই ফেলে দিলি ?

উষানাথ বলিল,—ওঁর পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ কমাবার জন্যে। ধরাকে সরা দেখেচেন! কিসের এত অহঙ্কার! এখনকার দিনে কোন্ বাড়ীর মেয়ে না পাশ করচে ? হুঁঃ!

ফুল্লরা কহিল,—অন্য বাড়ীর সঙ্গে তুমি তুলনা দিয়ো না। অন্য বাড়ীর ছেলেরা পাশ করে। এ বাড়ীর ছেলের মত মুখ্যু চণ্ডী সেজে ঘুরে বেড়ায় না!

উষানাথ গর্জ্জিয়া উঠিল—কি! বড় ভাইকে দুর্ব্বাক্য বলা! লেখা-পড়া শিখচেন! ওরে আমার পণ্ডিতা রমাবাই···

কথার শেষে উষা এক বিচিত্র ভঙ্গীতে ফুল্লরার সামনে হাত নাড়িল।

ফুল্লরা কহিল,—খবর্দ্দার! অসভ্যতা করতে হবে না আমার সামনে! কি বলতে এসেচো? তোমার হোল্ড-অল্ তো? আমি কাঁচি দিয়ে ওর সেলাই কেটে দিয়েছি। তুমি আমার বই ছুড়ে পথে ফেলতে পারো যদি তো আমি তোমার জিনিষ কেন নষ্ট করবো না, বল্তে পারো?

উষানাথের দুই চোখ কপালে উঠিল। এত বড় সাহস হইয়াছে ফুল্লরার···আশ্চর্য্য!

ফুল্লরা কহিল,—ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—এ জ্ঞান যদি তোমার এ-বয়সেও না হয়ে থাকে, কবে আর তবে হবে, শুনি?

উষানাথ শুধু বলিল,—হুঁ···তার পর সে চাহিল মায়ের পানে, ডাকিল,—মা···

ফুল্লরা তখন টেবলের ধারে বসিয়া হিষ্ট্রির কেতাবে আবার মনঃসংযোগ করিয়াছে।

মা বলিলেন—সব কথা শুনেছি। তোর অন্যায়, উষা।

—আমার অন্যায় ? বই পথে ছুড়ে ফেললে তখনি সেটা কুড়িয়ে আনা যায়। আর হোল্ড-অল এমন করে কেটে রাখলে তাতে অসুবিধার অন্ত থাকে না! জানো, কাল সকালে আমি বেরুচ্ছি—কত দূরে সেই হাজারিবাগ!

মা কোন জবাব দিলেন না, কি একখানা বই পড়িতেছিলেন। ঊর্ষা লাফ দিয়া সবলে ফুল্লরার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল—যে-হাতে কাঁচি চালিয়ে হোল্ড-অল্ কেটেচো, সেই হাতে গুণ ছুঁচ ধরে করো সে কাটা সেলাই করতে হবে।

প্রবল ঝট্‌কায় হাত ছাড়াইয়া ফুল্লরা কহিল—গুণ্ডামি করতে হয়, পথে গিয়ে করো, ছোটদা। আমার ভালো লাগে না।

ঊষানাথ কহিল—ঘরেই গুণ্ডামি করবো। আমায় তুমি চেনো না? করো আমার হোল্ড-অল সেলাই···

বলিয়া সে ফুল্লরার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিল। আচম্‌কা সে টান সামলাইতে না পারিয়া ফুল্লরা মেঝেয় পড়িয়া গেল।

মা কহিলেন—তোর বড্ড বাড় হয়েছে, ঊষা···

ফুল্লরা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঊষা কহিল—দিক্ আমার হোল্ড-অল সেলাই করে···নাহলে আমি ছাড়বো না।

ফুল্লরা কহিল—বয়ে গেছে আমার সেলাই করতে! কখ্‌খনো করবো না! ওঁর মাইনে-করা বাঁদী আমি—বটে!

মা কহিলেন,—আচ্ছা, থাম্ বাপু···আমি সেলাই করে দিচ্ছি। নিয়ে আয় গুণ-ছুঁচ আর টোন-সুতো।

ঊষা কহিল,—তুমি কেন? যে কেটেছে, সে সেলাই করবে। কেন ও সেলাই কাটলো?

ফুল্লরা রাগে ফুঁশিতেছিল। সে কহিল—তুমি আমার পড়ার বই পথে

ফেলে দিয়েছিলে কেন? শুধু শুধু আমি তোমার হোল্ড-অলের সেলাই কাটতে যাইনি।

রাগে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া উষা কহিল—তোমার পাণ্ডিত্যের শ্রাদ্ধ যদি না করি তো আমার নাম উষা চৌধুরী নয়।

কথাটা বলিয়া সজোরে ফুল্লরার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল,—তোমার ঘাড় যে, সে সেলাই করবে আমার হোল্ড-অল।

—ছাড়ো ছোটদা…ফুল্লরা চীৎকার করিল।

উষা বলিল—ছাড়চি।

সঙ্গে সঙ্গে উষার আর্ত্তনাদ—পোড়ারমুখী রাক্ষুসী! দেখলে মা, আমার হাতে কামড় দেছে!

মার সামনে উষা হাতখানা প্রসারিত করিয়া ধরিল,—হাতে কামড়ের দাগ। মা চাহিলেন ফুল্লরার পানে। ফুল্লরার দুই চোখ রক্তবর্ণ, মুখে রক্তিম আভা! ফুল্লরা ফুঁশিতেছিল।

মা কহিলেন—কামড়ে দিলি, ফুলি!

ফুল্লরা কহিল,—আমার হাতের নুন-ছাল তুলে দিয়েচে—এই ছাখো?

মা কহিলেন—হাজার হোক তুই মেয়েমানুষ—ও বেটাছেলে।

ফুল্লরা কহিল—তুমি থামো, মা। বেটাছেলে! বেটাছেলে বলে সত্যি পীর নয় যে বুকের উপর দিয়ে মোটর গাড়ী চালিয়ে যাবে! মাথায় মারবে হাতুড়ির ঘা! কেন? বেটাছেলে শুধু মানুষ? মেয়েছেলে মানুষ নয়—না? তার লাগে না? তার মন মন নয়? তার শরীর শরীর নয়? ওঃ—বেটাছেলে! ও সব আবদার আমি শুনবো না! বেটাছেলে বলে ধরাকে সরা দেখবে! বটে! না, আমি মানবো না।

মেয়ের সে-মূর্ত্তি দেখিয়া মা অবাক! ফুল্লরাকে এমন কখনো দেখেন

নাই! চিরদিন শান্ত স্বভাব···লেখাপড়া লইয়া আছে! কাহাকে একটা রূঢ় কথা বলে না! সেই ফুল্লরা···

উষা হাঁকিল,—তুমি বিচার করো মা···না হলে এ বিচারের ভার, আমায় নিজের হাতে নিতে হবে!

মা বলিলেন,—হাজার হোক, ও তোর দাদা ফুলি···

ফুল্লরা কহিল,—দাদা দাদার মত থাকবে—মাথায় করে রাখবো। দাদা যদি চার্লস দি ফার্ষ্ট হয় তো আমিও ছেড়ে কথা কইবো না!

উষা কহিল—ওঃ! হিষ্ট্রী! হিষ্ট্রীতে এম-এ! মেয়ে হিষ্ট্রী কোট্ করচেন!

ফুল্লরা কহিল—এই হিষ্ট্রীই এবার থেকে কোট্ করবো। ঠাট্টা করচো—এম-এ বলে! ও মুখে কালি লাগবে, যে দিন তোমার মতো মুখ্যু বেটাছেলের মুখের উপর এম-এর ডিগ্রী এনে ছুড়ে দেবো। এম-এ! হাঁা, আমি এম-এ হবো—আর হবো এই হিষ্ট্রীতে! বিচারের কথা বলছিলে না? কার বিচার কে করবে—এসো, দেখি। আমি আর সহ্য করবো না তোমার অত্যাচার—এ আমি স্পষ্ট বলে দিলুম!

উষা ডাকিল,—মা···

মা বলিলেন—তুই যা···এখনো দোকান-পাট সব বন্ধ হয়নি। চাকরদের বল্, সেলাই করিয়ে আনবে'খন! সত্যি, ওর এগজামিন—তোর অন্যায়!

উষা কি ভাবিল, ভাবিয়া দুই চোখের দৃষ্টিতে যতখানি আগুন ছিল, তার সবটুকু ফুল্লরার অঙ্গে বর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল।

মা কহিলেন—মেয়ে-মানুষ হয়ে আজ তুই যে-কাজ করলি ফুলি···

মায়ের কথা শেষ হইল না। ফুল্লরা বলিল,—তুমি আমায় শাসন করো মা, তোমার সে-শাসন আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু বেটাছেলে বলেই ওদের পায়ের জুতো অকারণে মাথায় বইতে পারবো না। আমি তা বইবো না—এ আমার স্পষ্ট কথা!

একটা ঘটনার কথা বলিলাম। গৃহে-বাহিরে মেয়েদের এমনি নিরুপায় অসহায়তা দেখিয়া ফুল্লরার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। পুরুষের এত তেজ, এত আস্ফালন কেন? রোজগার করিয়া আমাদের খাইতে দাও—আশ্রয়ে কৃতার্থ করো—তাই? এ আশ্রয় সে চায় না। লেখাপড়া লইয়া সে জীবন যাপন করিবে। প্রয়োজন হয়, চাকরি করিবে। মেয়েদের এখন চাকরির অভাব কি! কত দিকে কত পথ খোলা রহিয়াছে!…

বি-এ পড়িবার সময় খুল্লনার বিবাহ হইয়া গেল। স্বামী মাণ্ডালের কোন্ কলেজে প্রফেশর। বিলাত-ফেরত। ইণ্টারমিডিয়েটে খুল্লনা ভালো রেজাল্ট করিয়াছিল; কাগজে কগেজে খুল্লনার ছবি ছাপা হয়। মাণ্ডালের কোন্ প্রজাপতি সেই ছবি ধরিয়া দেয় কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েট প্রফেশর মল্লিনাথ চক্রবর্ত্তীর সামনে। এবং…

ফুল্লরা বি-এ দিল; পাশ করিল ইংলিশে ফার্ষ্টক্লাশ অনার্শ লইয়া। গুটিচারিটা পাত্র ব্রজেন্দ্র চৌধুরীর শিষ্য সাজিয়া আসরে আসিয়া দেখা দিল। চৌধুরীর কাছে বসিয়া স্পিনোজার আসল বক্তব্য কি বুঝিবার জন্য বাক্যে প্রচণ্ড আগ্রহ জানাইলেও তাদের মন ঘূর্ণিত চঞ্চরীকার মত ইংলিশে-অনার্শ এই বি-এ রূপসীটির পিছনে-পিছনে…

বিবাহের কথা উঠিল। হাসিয়া ফুল্লরা জানাইল, এম-এ পাশ করিবার পূর্ব্বে বিবাহের চিন্তা তার মনে জাগিবে না। সকলে যেন তাকে ক্ষমা করেন!

কিন্তু তারা ক্ষমা করিলেও প্রজাপতি তাহাকে ক্ষমা করিল না। ব্রজেন্দ্র চৌধুরী যে সকল এষ্টেটের রিশিভার, তাহারই কোন্ এষ্টেটের কাজে সদ্য-নাম-লেখানো জুনিয়ায় কৌঁশুলী সুশীল চাটার্জ্জীর হাতে ব্রীফ গেল। এবং কথায়-বার্ত্তায় ব্রজেন্দ্রর বড় ভালো লাগিল এই সুশীলকে। সম্প্রতি যে সব নব্য ও-পার হইতে ব্যারিষ্টারীর সনদ হাতে ফিরিয়া দেশের মাটীতে সদ্য পা রাখিয়া নামিতেছে, সুশীল ছেলেটি তাদের মত 'চালে'ই আবদ্ধ নয়। সুশীলের বাক্যে ও আচরণে সেই পুরাকালের বিলাত-ফেরতদের বনিয়াদী সম্ভ্রমবোধ এবং সাধক মনের সুস্পষ্ট আভাস তিনি দেখিলেন।

এমনি করিয়া পরিচয় সুরু। তারপর চায়ের নিমন্ত্রণে ফুল্লরার সঙ্গে সুশীল চাটার্জ্জীর দেখা। ইংলিশে অনার্শ-পাশ বাঙালীর মেয়ে—সুশীলও ইংলিশে এম-এ—ফার্ষ্ট-ক্লাশ ফার্ষ্ট! সুশীল বলিল—আপনি এম-এ দিন। I am sure···

কিন্তু এ নিশ্চয়তার ইঙ্গিতে অদৃশ্য দেবতা অলক্ষ্যে হাসিলেন। তাই একদিন সুশীল চাটার্জ্জী আভাসে মনের কথা জানাইলেন মিস্ ফুল্লরা দেবী বি-এ-কে। সে কথা ফুল্লরার ভালো লাগিল।

কিন্তু···

ফুল্লরার একটা সঙ্কল্প ছিল। সে কহিল,—সে সঙ্কল্প রক্ষা করতে চাই।

সস্নেহে সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—কি সঙ্কল্প, বলুন···

ফুল্লরা কহিল,—এ যেন আমাদের পার্টনারশিপ কারবার। এতে ভালোবাসা হবে মূলধন! দু'জনেই আমরা বাঁচতে চাই—আপনি জাগিয়ে তুলুন আপনার জীবন, আমি আমার···বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে! অর্থাৎ যাকে বলে দুজনের সমান অধিকার—সমান দাবী, সমান স্বাধীনতা।

হাসিয়া সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—তাই হবে। ব্যস!

এমনি সর্ত্তে এ সংসারের পার্টনারশিপ-কারবার সুরু হইয়াছে। সুশীল চাটার্জী মক্কেল আর তাদের মামলা মকর্দ্দমা লইয়া পয়সা রোজগার করিতেছেন; স্ত্রী ফুল্লরা পয়সা রোজগার করিতে বাহির হয় নাই। প্রয়োজন নাই! সে তার শক্তি আর প্রতিভা নিয়োগ করিতেছে নানা ক্ষেত্রে।

দিনের পর দিন, মাস এবং বৎসর এমনি ভাবে কাটিতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঝড়ো হাওয়া

অনেক দিন আগেকার কথা।

সুশীল চাটার্জী কোর্টে গিয়াছেন,—বেলা প্রায় দু'টা বাজিয়াছে। পিয়ানোর ধারে বসিয়া ফুল্লরা একখানা ইংরেজি গৎ বাজাইতেছেন। কাল বায়োস্কোপে গিয়াছিল; গৎটা ভালো লাগিয়াছে, আজ দশটার পর লোক পাঠাইয়া বেভানের দোকান হইতে নোটেশন আনাইয়া সেই গৎ লইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় জগু বেয়ারা একখানি কার্ড আনিয়া সামনে ধরিল।

কার্ড লইয়া ফুল্লরা দেখে, নাম লেখা,—ইভা সান্যাল। ইভা ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়িত ফুল্লরার সঙ্গে।

ফুল্লরা কহিল,—নিয়ে এসো...

ইভা আসিল। অভ্যর্থনা চুকিলে ফুল্লরা কহিল,—কি খপর? এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়লো যে!

ইভা কহিল,—মানে, আমি ইন্‌শিওরেন্সের দালালী করছি। এলুম তোর কাছে—তোকে একটা ইনশিওর করতে হবে।

ফুল্লরা কহিল,—কিন্তু আমি তো পয়সা-কড়ি উপার্জ্জন করি না, ইভা। আমি বিবাহিতা মহিলা...স্বামীর স্ত্রী।

ইভা কহিল,—নিজে উপার্জ্জন না করলেও পত্নীত্বের অধিকারে অনেক টাকা তোর হাতে আসে। তোর স্বামী মিষ্টার চাটার্জী একজন লীডার অফ দি বার!

ফুল্লরা কহিল—মানি। কিন্তু এ উপসর্গের জন্ম তাঁর কাছে হাত পাততে আমার আপত্তি আছে।

ইভার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে কহিল—স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী টাকা নেবে—বিশেষ যে-ক্ষেত্রে স্বামীর উপার্জ্জনের সীমা নেই—তাতে তোর কোথায় বাধে, আমি বুঝতে পারছি না ফুল্লরা!

ফুল্লরা কহিল—ও কথা থাক্। ইনশিওর করতে বলচিস্' কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন আছে? ইনশিওর করে পুরুষ-মানুষে—উদ্দেশ্য, মারা গেলে বিধবা স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের জন্ম সংস্থান থাকবে! আমার সে সংস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই, ইভা।

ইভা কহিল—লেখাপড়া শিখে এত-বড় ভুল ধারণা! ইনশিওর করতে বলছি—এনডাউমেণ্ট সিষ্টেমে। ধর্' পনেরো বছরের জন্ম···with profit···পনেরো বছর পরে কত টাকা পাবি, বল্ তো!···আমাদের কোম্পানি বিশেষ ব্যবস্থা করেছে মেয়েদের লাইফ ইনশিওরেন্সের জন্ম···। এ কাজের ভার নিয়ে ইস্তক জানিস, কত টাকার কাজ কোম্পানিকে দিয়েছি? প্রায় দেড় লাখ। বড় বড় ঘরে যার কাছে গিয়েছি, সেই-সেই ঘরেই বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকার কাজ করেছি। এবারে তোর পালা। বেশী নয় ফুল্লরা, পঁচিশ হাজার টাকা ইনশিওর! এ বছর আমাকে পাঁচ লাখ টাকার কাজ দিতে হবে···

ফুল্লরা কহিল,—আমায় মাপ কর, ইভা। এ-সবের জন্ম ওঁর কাছে আমি টাকা চাইতে পারবো না।···বিয়ের আগে আমাদের দু'জনের মধ্যে সর্ত্ত-অধিকার নিয়ে কতকগুলো বোঝাপড়া হয়ে গেছে···

আরো কথায় কথায় অনেক কথা উঠিল।

ইভা খৃশ্চান। তার দাদা রেলে কাজ করিত; মারা গিয়াছে। ছোট ছোট দু-তিনটি ছেলেমেয়ে আছে। ইভার উপর সংসারের ভার।

ইভা মেয়েটীর বুদ্ধি বেশ। আই-এ পাশ করিতে পারে নাই। বাপ মারা গেলে কিছু দিন রেলে বুকিং ক্লার্কের কাজ করে। সে কাজে উন্নতির বিশেষ আশা নাই, তাই সে-চাকুরী ছাড়িয়া ইন্‌শিওরেন্সের কাজে লাগিয়াছে। এ কাজে পয়সা খুব। বিশেষ মেয়ে-ক্যানভাসারের জন্ত রেট্ আলাদা। অফিস হইতে সে একখানা মোটর-গাড়ী পাইয়াছে।

ফুল্লরা কহিল,—বিয়ে করবি না?

হাসিয়া ইভা কহিল—করবো না, এমন পণ অবশ্য নেই। তাব এ-কথা ঠিক, বিবাহ করলে এমন লোককে করবো—আমার এই স্বাধীন পেশায় যে বাধা দেবে না। মনে আছে ফুল্লরা, সেই বিদ্যুৎবরণী ঘোষকে? সেই মাথায় খাটো চুল—কার্ল করতো আঙুরের থোলোর মত...পুরুষালি চাল?...বিদ্যুৎবরণী বি-এ পাশ করে' স্কুল মাষ্টারী করচে...এ্যাসিষ্টান্ট হেড মিষ্ট্রেশ। কলকাতায় চাকরি। ইংলিশে এম-এ দেবে। সে বিয়ে করেচে মর্চ্চেন্ট অফিসের এক কেরাণীকে। স্বামী ভারী পোষ মেনেচে। বিদ্যুৎবরণী হলো দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী!...কোথাও বাধচে না। মাসে পঁচিশটি করে টাকা স্বামী দেয় সংসারে। বেচারা মাহিনা পায় চল্লিশ টাকা। স্বামীকে কেমন বশে রেখেচে! স্বামীর পাণ-তামাক নিষেধ—সিগারেট-বিড়ি নিষেধ। অফিসে যায় ট্রামে—ফেরে হেঁটে। ফেরবার সময় বাজার-টাজার করে। সত্যি, অনেক পুরুষের চোখ টাটায়—ঠাট্টা-টিটকিরি করে। কিন্তু দিন-কাল যা পড়েচে, তাতে যদি আমরা সংসারে হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে শুধু পড়ে থাকি তো দুঃখ এ-জীবনে কখনো ঘুচবে না! তোদের কথা অবশ্য আলাদা। আমাদের মত মধ্যবিত্ত বা গরীব গৃহস্থের ঘরে সমস্যা-সমাধানের এইটিই একমাত্র উপায়।

ফুল্লরা এ-কথার কোনো জবাব দিল না—চুপ করিয়া রহিল। বুঝি, দেশের সমস্যা চোখের সামনে নিরুপায় অসহায় মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিল!

নিজের দেহ বেচিতেছে—তার মূল্য? ছি! এই কি নারীর নারীত্ব! এ-ভাবে দেহ বেচিয়া তার দাম লওয়া...

সে আশ্রয়ের মূল্য-হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাস চিরদিন যে-ইঙ্গিত দিয়া আসিয়াছে, সে ইঙ্গিতে কতখানি হীন কদর্য্যতা!

শিক্ষায় সভ্যতায় দুনিয়া আজ অনেকখানি আগাইয়া আসিয়াছে—আজো সে বর্ব্বর কেনা-বেচা-রীতির অবসান হইবে না? পুরুষ বলে, স্ত্রী-পুরুষের সাম্য! কোথায় সে সাম্য? এ যেন করুণা করিয়া মমতা করিয়া একটা অর্থহীন কথার পিছনে মস্ত বড় অপমানকে প্রচ্ছন্ন রাখা! আসলে...

তার এ গৃহে স্বামী যা করেন, যা বলেন তাই হয়!...সে? তার স্বতন্ত্র সত্তা কোথায়? স্বামীর সে ছায়া...

সুন্দরার মনের মধ্যে মস্ত বিরোধ বাধিল। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায়-সংস্কারে বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল।

যেন ঝড় বহিতেছে—চোখের সামনে সারা বিশ্ব-নিখিলকে ধূলায় ঢাকিয়া, মনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যকে আতঙ্কে মূর্চ্ছাহত করিয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাতল সৈকতে

স্বামী সুশীল চাটার্জী গৃহে ফিরিলেন—সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। ফুল্লরা লনে পায়চারি করিতেছিল। সুশীল চাটার্জীকে ফিরিতে দেখিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। চাটার্জী আসিয়া আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করেন। সে সময়টায় ফুল্লরার সহিত কথাবার্তা। কখনো বা দু'জনে ময়দানের দিকে একটু ঘুরিয়া আসে। চাটার্জীরই এদিকে যা কিছু আগ্রহ।

আজ ফুল্লরা স্বামীর কাছে আসিল না। না আসার বিশেষ কারণ ছিল, তা নয়। এমনি।

ইভার কথাগুলা মন হইতে এখনো মুছিয়া যায় নাই। সে কথা-গুলাকে ঘিরিয়া একটু অভিমান…

নিজের সঙ্গে সে বুঝাপড়া করিতেছিল। কেন এ অভিমান? স্বামীকে সে ভালোবাসে; স্বামীও তাকে ভালোবাসেন। এই ভালোবাসার কথাটাই মনকে খোঁচা দিতেছিল!…এ ভালোবাসার সত্যই কোন দাম নাই? ইভা যা বলিয়াছে, এ ভালোবাসা সত্যই তাই? শুধু দেনা-পাওনার কারবার? নারী তার দেহ দিয়া, রূপ দিয়া, যৌবন দিয়া পুরুষের পরিচর্য্যা করিবে, তাকে বিরাম জোগাইবে, আরাম জোগাইবে; আর সেই আরাম-বিরামের বিনিময়ে পুরুষ তাকে মূল্য-স্বরূপ দিবে আশ্রয় …বেশ-ভূষা…"আরাম"!…

লতা-বিতানের কাছে একটা বেতের চেয়ারে ফুল্লরা আসিয়া বসিল। বসিয়া এই কথা ভাবিতেছিল…কিন্তু এ ভাবনার অন্তরালে প্রচণ্ড আগ্রহে

প্রতীক্ষা করিতেছিল স্বামীর পায়ের ধ্বনি! কখন্ তিনি আসিয়া হাসি-মুখে ডাকিবেন—ফুল!

আজ সে পায়ের ধ্বনি জাগিল না! প্রতীক্ষায় ফুল্লরার পল-বিপল-গুলা বহিয়া যাইতে লাগিল...

অবশেষে চারিদিক যখন সন্ধ্যার ছায়ায় মলিন হইয়া আসিয়াছে, দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল, তখন ফুল্লরার হুঁশ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, স্বামী তো আসিলেন না! ধীর পায়ে সে আসিল গৃহাঙ্গনে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ফ্লোরের উপরে বারান্দা। বারান্দার ডান দিকে সুশীলের বসিবার ঘর; মাঝখানে প্রকাণ্ড হল। এই হলের মধ্য দিয়া গৃহাভ্যন্তরে যাইবার পথ।

বারান্দায় আসিয়া ফুল্লরার কেমন কৌতূহল হইল। বেয়ারা ছিল সামনে; বেয়ারাকে প্রশ্ন করিল—সাহেব কোথায়?

বেয়ারা জবাব দিল—আপিস-কামরায়।

—আর কেউ আছে সাহেবের কাছে?

—না।

পা দু'খানা ফুল্লরাকে তার অজ্ঞাতে সুশীলের অফিস-কামরায় টানিয়া আনিয়া একেবারে তাঁর সামনে দাঁড় করাইয়া দিল।

সুশীল চাটার্জী মোটা একখানা বই খুলিয়া আইনের কি একটা জটিল তত্ত্ব খুঁজিতেছিলেন, ফুল্লরা আসিয়া সামনে দাঁড়াইলে চোখ তুলিলেন, কহিলেন—ফুল!...হুঁ...আজ আর তোমার দরবারে হাজরে দিতে পারিনি। একটা জটিল ব্যাপার নিয়ে পড়েচি। ভালো কথা, এর পরে তোমাকে বল্‌বো'খন। তোমার মন্দ লাগবে না...

কোনোমতে কথাটুকু শেষ করিয়া সুশীল চাটার্জী আবার কেতাবের অক্ষর-গহনে প্রবেশ করিলেন।

ফুল্লরা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল—নীরবে; তার পর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিল।

আসিয়া দাঁড়াইল না। নীচেকার ড্রয়িং-রুমে ঢুকিয়া সোফায় বসিয়া পড়িল। মনের উপর যেন পাহাড়ের ভার! ভাবিতেছিল, যেদিন অবসর পাও, সেদিন আসো আমায় লইয়া পুতুল-খেলা করিতে... বটে! আজ অবসর নাই, তাই আমার কথা মনে পড়িল না। ভালো যদি বাসো,—তবে এ ভালোবাসা তোমার অবসর ধরিয়া চলিবে? চমৎকার! পুরুষ বলিয়া তোমার কাজ-কর্ম্ম সকলের আগে। ভালোবাসা তার পাশে ঘেঁষিতে পারিবে না!

আর নারী? তাকে বসিয়া থাকিতে হইবে তোমার পথ চাহিয়া ...কখন তোমার সময় হইবে, তাকে মনে পড়িবে। তোমার কৃপা হইবে!...তুমি আসিয়া

পাশে কোথায় গ্রামোফোনে গান চলিয়াছিল,—

> আমি নিশি-দিন হেথায় বসে আছি
> তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।

ফুল্লরার রাগ হইল। কেন এত অপমান সহিয়াও নারী বসিয়া থাকিবে পুরুষের এক-কণা কৃপার প্রার্থী হইয়া...কেন? তার নিজের মন নাই? সে-মনের দাম নাই?

ফুল্লরা উঠিল। এবং কখনো যা করে নাই, তাহাই করিতে উদ্যত হইল। জোগুকে ডাকিয়া বলিল—গাড়ী তৈরী কর্‌তে বল্‌। আমি বেরুবো।

চট্‌পট্ বেশভূষা সারিয়া লইয়া ফুল্লরা নিঃশব্দে আসিয়া গাড়ীতে বসিল; শোফারকে কহিল,—ময়দান।

ময়দানে কয় চক্র ঘুরিয়া ভালো লাগিল না। এমন নিঃসঙ্গ-জীবন সত্যই বহা যায় না। ঐশ্বর্য্য আছে...তাহাতে মনের দুঃখ ঘোচে কখনো!

ফুল্লরা গাড়ী হইতে নামিল,—নামিয়া বসিল গিয়া প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটের সামনে বেঞ্চে। বসিয়া ভাবিতে লাগিল নিজের জীবনের কথা।...

নারীর কাজ সত্যই শুধু স্বামীর পরিচর্য্যা আর সেবা? ঘর-সংসার গুছানো? তাই যদি তো তার বুকের মধ্যে এত বড় মনটাকে ভগবান কেন পূরিয়া দিয়াছিলে? সে মনে আশা-নিরাশা, হর্ষ-বেদনা, সুখ-দুঃখ? কলের পুতুল দিয়া অনেক কাজ করানো যায়। নারীর যদি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন না থাকিবে, তাহা হইলে, কলের পুতুল না করিয়া ভগবান তাকে জীবন্ত-মনের মানুষ করিয়া গড়িবেন কেন?

পুরুষের মত নারীর কোন্ শক্তির অভাব? সুযোগ পাইলে লেখা-পড়ায় পুরুষের সঙ্গে সমানে পা ফেলিয়া নারী চলিতে পারে! প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় পুরুষকে সে হারাইতে পারে

তার পর কাজ! এদেশে না হয় সে রীতি নাই—তাই। কিন্তু যে দেশে সে রীতি আছে, সে-দেশে চাকরির ক্ষেত্রে নারী পটুতা কতখানি দেখাইতেছে! না দেখাইলে অত বড় পার্লামেণ্ট সভায় নারীর আজ প্রবেশাধিকার ঘটিত না! মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়িল। অত বড় মারণ-যজ্ঞে শক্তির কি পরিচয় না দিয়া গিয়াছেন! মাদাম ক্যুরি...জীয়ান্ অ আর্ক...এদেশে অহল্যা বাই, চাঁদ সুলতানা! তাঁদের বহু পূর্ব্বে খনা, গার্গী, মৈত্রেয়ী...

আজ নারী শুধু রান্না-বান্নার চার্জ্জ লইয়া খুশী-মনে ঘরে বসিয়া আছে!

তার সমস্ত জগৎ ছোট্ট ঐ গৃহ-নীড়টুকুর একাংশমাত্রে কেন্দ্রিত পরিপূর্ণ হইয়াছে! অথচ এক দিন...

স্বার্থপরতা! নারীকে দাস্যে লিপ্ত রাখিয়া তার মনকে শাসন-পেষণে দলিয়া পঙ্গু দুর্ব্বল করিয়া পুরুষ মুখে শুধু বলে,—ভালোবাসি!

এ কি ভালোবাসা? ভালোবাসা হয় সমানে সমানে!...
এ ভালোবাসা নয়...করুণা! অনুকম্পা!

এতখানি লেখাপড়া শিখিয়াও সে আজ সেই চিরাচরিত প্রথায় সংসারে আস্‌বাবের মত পড়িয়া আছে!...

ফুল্লরার চোখের সাম্‌নে সমস্ত জগৎ যেন পাথরের নির্জীব দেউল বলিয়া মনে হইল! সে কঠিন দেউলের বাহিরে যাইবার শক্তি তার নাই! বুঝি, সে উপায়ও নাই!

মন যখন এমনি চিন্তায় তন্ময়, তখন পাশে কে ডাকিল,—ফুল! না, না, মাপ চাইছি...মিসেস্ চাটার্জ্জী...

চমকিয়া ফুল্লরা ফিরিয়া চাহিল; চাহিয়া দেখে, ছবি রায়। ছবি কহিল,—চন্দ্রলোক-যাত্রা?...না, সত্যি, একা-একা এখানে বসে যে?

ফুল্লরা কহিল—এমনি...বেড়াতে এসেছিলুম।

ছবি বেঞ্চে বসিল, কহিল,—মিষ্টার চাটার্জ্জী আসেন নি?

ফুল্লরা জবাব দিল,—না, তাঁর কাজ আছে।

ছবি কহিল,—তা বটে!...এই দুঃখেই তো বিয়ে করতে চাই না।

কুতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরা ছবির পানে চাহিয়া রহিল। গ্যাসের আলো তার মুখে পড়িয়াছে...

ছবি কহিল,—যদ্দিন বিয়ে না হয়, পুরুষজাত তদ্দিনই আশে-পাশে গুঞ্জন তুলে বেড়ায়, যেমন সেই কবিতায় পড়ি, কমলের পাশে মৌমাছির মত! বিয়ে হবামাত্র কোথায় চলে যায় সে রোমান্স, সে মোহ!

কথাটা ফুল্লরার কেমন ভালো লাগিল না। সে কহিল,—বিয়ে করিস নি?

—না।···স্বাধীন জীবন নিয়ে বেশ আছি···ruling over so many hearts! (এতগুলা জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতেছি)!

ফুল্লরার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল!···

ছবি কহিল,—আমাদের মধ্যে যারা-যারা বিয়ে করেছে, সকলেই দেখছি স্বর্ণগর্দ্দভ বনেছে! টাকা-পয়সার অন্ত নেই! গহনা, শাড়ী, বাড়ী গাড়ী··চমৎকার··· গ্র্যাণ্ড! কিন্তু বোঝার ভার বইতেই জন্ম হয়েছিল এই মেয়ে-জাতের? কবিরা যে এত কথা লিখে গেছেন··· চাঁদের আলো, দখিণ বাতাস···সেগুলোর কোন দাম নেই?···আমি বিয়ে করবো না, ঠিক করেচি···এবং আমার পষ্ট কথা, আমার স্তাবকের অভাব নেই—তারা আমায় পূজা করে ···যাকে যা হুকুম করচি, বুঝলি ফুলু···

ছবির বেশ-ভূষা ভালো···ফুল্লরা লক্ষ্য করিল। অথচ তার সংসারের অবস্থা···যখন কলেজে পড়িত···ফুল্লরার কিছুই অবিদিত নাই। তেমন সংসারে বাস করিয়া এ বেশ-ভূষা···

ফুল্লরা কহিল,—বিয়ে না করে তুই কি করচিস?

ছবি কহিল,—আমি এখন কটা অফিসের হয়ে ক্যানভাশ করচি। খুব বড় পাব্লিশিং হাউস···মিল···সিগারেট-কোম্পানি···তা মাসে তিনশো-চারশো টাকা হাতে আসে। বুঝলি ফুলু, পুরুষগুলো নিরেট···কাজ-কর্ম্মের পাথরে বুক চাপা থাকলেও রোমান্সের রেশ মরেনি। বিয়ে-থা করেছে—বয়স হয়েছে—তবু গিয়ে হাসি-মুখে যাকে ধরেছি—শেয়ার নিতে হবে, কিম্বা বই কিনতে হবে, কেউ আমাকে ফেরাতে পারে নি। শুধু একটু হাসি···এই হাসির জোরে আমরা দুনিয়া জয় করতে পারি! কিন্তু

এমন মজা, যেমনি এদের কাকেও বিবাহ করে স্ত্রী হবে, এ হাসির আর কোনো দাম থাকবে না! স্বামীর কাছে স্ত্রীর হাসির দাম নেই, কথার দাম নেই, রূপের বা বেশভূষার দাম নেই; অথচ স্ত্রীবেচারীর ঐ স্বামী ভিন্ন গতি নেই। এই তো বিয়ের মন্ত্রের তত্ত্বকথা।

ফুল্লরার মন এ কথায় রী-রী করিয়া উঠিল। কথাগুলা ভালো নয়।...

এ কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে ফুল্লরা কহিল,—এখানে এলি কিসে?

—মোটরে। ক্যালকাটা পাব্লিশার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শোভন বিশ্বাস...সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে আছে। তার গাড়ীতে এসেচি...গাড়ী বিগড়েচে। সে এ্যাটেণ্ড করচে। ঐ যে! আমি গাড়ীতে বসে থাকতে পারলুম না, নেমে পড়লুন। নামতেই তোকে দেখলুম...চলে এলুম।

ফুল্লরা কহিল,—কিন্তু এভাবে আগুন নিয়ে খেলা—এ কি ভালো?

ছবি হাসিল, হাসিয়া বলিল,—আগুন নিয়ে খেলতে যে জানে, তার পাখায় এতটুকু আগুন লাগে না! এই সব বোকাগুলো—এদের চরিয়ে বেড়ানোয় কম আনন্দ পাই না।...না ভাই ফুলু, সত্যি...এদের পানে চেয়ে দেখেচি কি, এরা ওমনি পায়ে লুটিয়ে পড়েচে। কখনো যদি কিছু চাই, সে চাওয়া পূরণ করতে এরা এমন কাণ্ড করে, হাসি চেপে রাখা দায় হয়!

ফুল্লরা কহিল,—আমার কিন্তু বিশ্রী লাগচে তোর মনের এ দুর্মতি দেখে!...নিজেকে নিয়ে এ-ভাবে মৃগয়া করা...এতে অপমান! শুধু তোর নয় ছবি, সমস্ত মেয়ে-জাতটার তুই অপমান করচিস্!

ছবি হাসিল, হাসিয়া বলিল,—কিন্তু আমি খাশা আছি...জীবনটা আরামে ভোগ করচি!

ছবির হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ব্যাগ খুলিয়া সে পাউডার বাহির করিল; এবং একটা সিগারেট...

ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—এ বিদ্যেও হয়েচে ?

ছবি কহিল,—অপরাধ ? মেয়েরা পাণ-দোক্তা খেতে পারে, গুণ্ডি-জর্দ্দা খেতে পারে—তাতে যদি দোষ না ঘটে, এতেই বা কেন ঘটবে ? সে তামাক—এ-ও তামাক। তবে দুটোতে রূপভেদ আছে! এটা পাণ-দোক্তার মত নোংরা নয়।

ছবি সিগারেট ধরাইল।

দূরে কোথায় ঘড়ি বাজিল। ন'টা।

ফুল্লরা কহিল,—উঠি ছবি। অনেক রাত হয়ে গেছে। তোর এ ফিলজফির সমর্থন আমি করি না।...একদিন পস্তাবি...

হাসিয়া ছবি কহিল,—সে ভয় নেই ফুলু। এ মনে জোর আছে, বুঝলি!

শোভন বিশ্বাসের গাড়ী ঠিক হইয়া গেল। সে আসিয়া ডাকিল,—মিস্ রায়...গাড়ী ঠিক হয়েছে।

ছবি কহিল,—এঁকে চেনেন না ? মিসেস চাটার্জ্জী...সুশীল চাটার্জ্জী প্রকাণ্ড ব্যারিষ্টার...তাঁর স্ত্রী। আমরা একসঙ্গে পড়তুম। ইনি ইংলিশ-অনার্শে বি এ...খুব বড় স্কলার।

কৃতাঞ্জলি-পুটে শোভন বিশ্বাস কহিল,—নমস্কার।

সলজ্জ ভঙ্গীতে ফুল্লরা কহিল,—নমস্কার।

ছবি কহিল,—একদিন আসবো মিষ্টার চাটার্জ্জীর কাছে। এঁদের একটা বাঙলা সিরিজ মহাভারত বেরুচ্ছে। সে-বই সাবস্ক্রাইব্ করতে হবে।...যে কোনো একটা রবিবারে...কি বলিস্ ?

ফুল্লরা কহিল,—বেশ।

ফুল্লরা গাড়ীর দিকে চলিল, কাণে গেল ছবির কথা। ছবি বলিতে-ছিল—কনটিনেণ্টালে...আর কোথাও নয়।

উত্তরে শোভন বিশ্বাস কহিল,—তাই হবে। আসুন...

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিকল মন

বাড়ী ফিরিয়া ফুল্লরা দেখে, ন'টা বাজিয়া গিয়াছে! স্বামী তখনো তাঁর অফিস-কামরায়। আরো ক'জন ভদ্রলোক আসিয়াছেন, তর্ক চলিয়াছে। এটর্ণি ও জুনিয়ার কৌশুলীর দল মক্কেল সহ আসিয়াছে,—ফুল্লরা বুঝিল।

রাত্রি সাড়ে নটায় সুশীল চাটার্জ্জী ভোজন করেন। যত কাজ থাকুক, কাজ বন্ধ করিয়া খাইতে আসেন। আহারের পর আধ ঘণ্টা কাজ করেন। সাড়ে দশটার পর ফী দিয়া কেহ তাঁহাকে কোর্টের কাজ করাইতে পারে না। এ-নিয়ম পরম নিষ্ঠা-ভরে তিনি পালন করিয়া আসিতেছেন।

ফুল্লরা আসিয়া বেশভূষা বদল করিয়া ভোজ-কামরায় বসিল। সুশীল চাটার্জ্জী অচিরে আসিয়া দেখা দিলেন, হাসিয়া কহিলেন—তুমি বেরিয়ে ছিলে?

ফুল্লরা কহিল,—হ্যাঁ।

—একটু অবসর পেতেই তোমার খোঁজ করেছিলুম।

ফুল্লরা এ কথার জবাব দিল না।

বয় আহার্য্য আনিল। দু'জনে ভোজনে মনোনিবেশ করিলেন।

খাইতে খাইতে সুশীল চাটার্জী কহিলেন—কোর্টে আজ দত্ত সাহেব বলছিলেন, মেয়েদের জন্য ওঁর স্ত্রী একটা স্কুল খুলচেন, তোমায় তার কমিটিতে থাকতে হবে। মিসেস দত্ত সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসবেন। কি বলো? তোমার মত আছে?

ফুল্লরা কহিল,—কি ওঁদের প্ল্যান, শুনি। যদি আমার মতের সঙ্গে ওঁদের মত মেলে, মন্দ কি!

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—সত্যি, মেয়েদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা মেয়েদেরি করা উচিত। তোমাদের কোন্‌টা প্রয়োজন, তোমরা যেমন বুঝবে, আমরা তেমন বুঝবো না। এই জন্যই মনে হয়, তোমরা যদি দেশের নাড়ী বুঝে উচিত ব্যবস্থা করো, বাঙালী জাতটা তা'হলে বর্ত্তে যায়

ফুল্লরা মৃদু হাসিল; হাসিয়া কহিল,—ব্যবস্থা যেমনই হোক, তোমাদের পানে চেয়েই সে-ব্যবস্থা করতে হবে। তার কারণ, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর আসল উদ্দেশ্য হবে সংসারে শৃঙ্খলা রাখা—অর্থাৎ তোমাদের জীবন যাতে স্বচ্ছন্দ নিরাময় থাকে—এই তো? তা'হলে তোমরাই বা সে ব্যবস্থায় মাথা দেবে না কেন, বলতে পারো?

কথাটায় অতি মৃদু শ্লেষের রেশ মিশানো ছিল। সুশীল চাটার্জ্জী তাহা উপলব্ধ করিলেন না। সরল ভাবে তিনি কহিলেন,—তা নয়। আমরা এতে মাথা দিতে গেলে রুটীন বেঁধে দেবো, ইংরেজি পড়াও, জিওমেট্রি পড়াও, হিষ্ট্রী-জিওগ্রাফি পড়াও—অর্থাৎ ছেলেদের যা কোর্শ, তাই হবে মেয়েদের কোর্শ! কিন্তু তাতে মেয়েদের কি লাভ হবে, বুঝি না। যে সময়টা জিওমেট্রি পড়বে, সে সময়টা যদি রান্না বা সেলাই শেখে, তা'হলে সংসারে সাশ্রয় হবে! তাই আমার মনে হয়, মেয়ে-স্কুলের কমিটি থেকে বাক্যবাগীশ পুরুষ-প্রফেশরদের হঠিয়ে সে জায়গায় তোমাদের বসানো উচিত।

ফুল্লরা কহিল,—এ নিয়ে মিছে বাদানুবাদ করচো! মিসেস দত্ত আছেন—তাঁকে এ কথা বলে দেখতে পারো।

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—আমার যদি সে অবসর থাকতো, এ নিয়ে

আলোচনার চেষ্টা করতুম! কিন্তু সত্যি, ও-সব আলোচনা থাক। তার চেয়ে তুমি বলো, তোমার খপর···কোথায় ঘুরে এলে? সিনেমা? না, কোনো বন্ধুর বাড়ী?

ফুল্লরা কহিল,—কোনোটাতেই যাইনি। গিয়েছিলুম মাঠে—ট্রাণ্ডের দিকে।...সেখানে দেখা হলো এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে। ছবি রায়···বিয়ে থা করেনি। কতকগুলো কোম্পানির কাজে কান্‌ভাস্ করছে। আসবে এক দিন তোমার কাছে বৈষয়িক কাজে! বলছিল।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—বৈষয়িক কাজ! কি? কোনো মামলা-মকর্দ্দমা?

ফুল্লরা হাসিল, হাসিয়া বলিল—মকর্দ্দমা ছাড়া মানুষের আর কোনো বৈষয়িক কাজ-কর্ম্ম থাকতে পারে না?

হাসিয়া সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—কৌঁশুলীর সঙ্গে মানুষের বৈষয়িক কাজ তো ঐ একমেবাদ্বিতীয়ং—মামলা-মকর্দ্দমা!

এমনি পাঁচটা কথার মধ্য দিয়া ভোজন শেষ হইল। সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—একটু কাজ বাকী আছে—ওঁদের বসিয়ে রেখেছি। আচ্ছা, তোমার অনুমতিক্রমে উঠলুম তাহলে...

সুশীল চাটার্জ্জী উঠিয়া আবার গিয়া অফিস-কামরায় প্রবেশ করিলেন।

ফুল্লরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। টেব্‌ল্ সাফ হইয়া গেল!

ফুল্লরার মনে জাগিতেছিল ছবির কথা···যেমনি বিবাহের পর স্ত্রী হইবে···

অথচ বিবাহের পূর্ব্বে এই স্বামী প্রচুর অবসর পাইতেন পিতার গৃহে নিত্য গিয়া ফুল্লরার সঙ্গে কথা কহিবার, আলাপ করিবার!···কাজের তখন জোর সংগ্রাম চলিয়াছে! সে কাজ আজো আছে, কিন্তু অবসর নাই। অথচ দুজনে এক গৃহে বাস করিতেছে!

সে তবে মায়ের কাছে, ছোটদার কাছে কি পণ করিয়াছিল? সে নারী—তাই চিরদিনকার মতই তুচ্ছ নগণ্য!

মনে হইল, নারী সত্যই এমন অসহায় থাকিবে চিরকাল? সে পণ করিয়াছিল, পুরুষের উপর নির্ভর করিবে না! সেই জন্যই পাশ করিয়াছে। পাশ করিয়াও যদি সেই মামুলী-সমাজের স্ত্রীর মত ঘরের কোণে স্বামীর মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকে তো এ পাশ করিবার কি তার প্রয়োজন ছিল!

স্বামী পুরুষ—কাজের পর যদি অবসর পান, স্ত্রীর সঙ্গে দুটা সরল আলাপ করিবার বাসনা যদি তখন তাঁর মনে জাগে, তবে তিনি আসেন স্ত্রীর কাছে! নহিলে এই স্ত্রী—কি করিয়া তার সময় কাটে, সে দিকে হুঁশ থাকে না!

এ তো সেই দাস্য! জীবনে যে-দাস্য, যে-অবজ্ঞা সে চির দিন ঘৃণা করিয়াছে!

ঐ ইভা! ঐ ছবি রায়!...

কুন্তলা শিহরিয়া উঠিল। ছবি যে-কথা বলিল...হাসির মূল্যে পুরুষের মন কিনিয়া...

ছি!

ঐ যে শোভন বিশ্বাসকে বোটের মত বাঁধিয়া ফিরিতেছে! শোভন নিশ্চয় মনে কোনো দুর্ব্বার লোভ লইয়া এভাবে তার চিত্তরঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছে। এ দাস্যে শোভন বিশ্বাসের এতখানি নিষ্ঠা—নিশ্চয় ছবির আচরণে সে এমন কিছু দেখিয়াছে, এমন কিছু পাইয়াছে, যে দেখা বা যে পাওয়ার জন্য তার মন আশার নেশায় মাতিয়া আছে!

বিবাহ না করিয়া এমনি ভাবে যে-সে পুরুষকে দাস্যে বাঁধিয়া রাখা

—পুরুষের চোখে নিজেকে এমন ছোট, এতখানি হেয় করিয়া তোলা—মানুষ সত্যই পারে?

যদি খেলা হয়, খেলার শেষ আছে! এ খেলার শেষে হয়তো ছবি নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিবে! তা যদি না করে, শোভনকে কঠিন আঘাতে বিপর্য্যস্ত করিয়া খেলার শেষ করিবে! কিন্তু এ খেলার নেশায় একবার মাতিয়া সে-নেশা ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে? আবার নূতন খেলা খেলিতে নামিবে। এবং কাকে লইয়া নূতন খেলায় মাতিবে, ছবিকে কি চোখে সে দেখিবে?

ভাবিল, এ তো খেলা নয়। এ যে নিজেকে অপমানে জর্জ্জরিত করা—নিজেকে চূর্ণবিচূর্ণ করা! একটা জন্ম এমন করিয়া যে ভাঙিয়া ফেলিতে পারে, জীবনের মূল্য সে বোঝে না—জানে না। তার মত দুর্ভাগ্য আর কারো নাই।

ইভা?

সে চায় দাস-দাসী, মোটর-গাড়ী, আরামে বাস করিতে! এ কি অপরাধ? স্বাচ্ছন্দ্য কে না চায়? কে না চায় সুখ? আরাম?

ইভা বিবাহ করিতে চায়! এমন স্বামী চায়—যে তার উপার্জ্জনের কাজে বাধা দিবে না! দু'জনের উপার্জ্জনে অভাব-অভিযোগ থাকিবে না!

এ পথে নারীর বিপদ আছে, মানি! কিন্তু বিপদ কোথায় নাই? গৃহ-সংসারেও আগুন লাগে! ইভা বলিল, যার মনের জোর থাকে, প্রলোভনকে সে জয় করে; সবলের পীড়ন সে রোধ করিতে পারে!

ইভার কাজ মেয়েদের আসরে। কি দোষ? পুরুষের দলে মিশিয়া কাজ করিলে মেয়েদের বিপত্তির সীমা থাকিবে না! পুরুষের মনের ...তার উপর নির্ভর করিয়াই ছবি বড় হইতে চায়!

ছবির এ মনোবৃত্তির কথা স্মরণ করিয়া ফুলরা আবার শিহরিয়া উঠিল...

এমনি চিন্তায় ফুল্লরা একেবারে তন্ময়। সুশীল চাটার্জী আসিয়া কহিলেন,—এ কি ! এখানে বসে আছো !

ফুল্লরার চমক ভাঙ্গিল। একটা উদ্‌গত নিশ্বাস ! ফুল্লরা সে নিশ্বাস রোধ করিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—শোবে না ?

ফুল্লরা কহিল,—চলো...

ফুল্লরা উঠিল এবং স্বামীর সঙ্গে দোতলার শয়ন-কক্ষে আসিল।

পাশাপাশি দু'খানি ঘর। দু'জনে দু'ঘরে শয়ন করে। ফুল্লরা নিজের ঘরে গেল। সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—গুড্ নাইট্ !

দু'ঘরের মাঝখানে দ্বার। দ্বারে ভারী পর্দ্দা। পর্দ্দাখানা টানিয়া দিয়া ফুল্লরা সরিয়া আসিল ; শয়ন করিল না ; খোলা খড়খড়ির সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

মনে চিরদিন যে সুর বাজিত, আজ যেন সে সুর কাটিয়া গিয়াছে ! মন সচেতন হইয়া ওঠা-অবধি যত কথা ভাবিত, সেই সব কথা মনের উপর দিয়া ভিড় করিয়া যাতায়াত সুরু করিল। কোন কথাই স্থির হইয়া দাঁড়ায় না, মনকে বিব্রত করিয়া তোলে না—পর-পর শুধু মনকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে···

সহসা দূরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। ফুল্লরার চেতনা হইল। মনে মনে সে হাসিল ; হাসিয়া খড়খড়ির পর্দ্দা টানিয়া দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইল।

স্বামী ঘুমাইতেছেন !

চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় চারিদিক দেখাইতেছে যেন স্বপ্নে ঘেরা! স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছিল ! ফুল্লরার বুকের মধ্যে কোথায় যেন অনেকখানি খালি হইয়া গিয়াছে ! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া ফুল্লরা আসি নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আহ্বান

শনিবার। দুপুর বেলায় সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—চলো, আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক!

ফুল্লরা কহিল,—কোথায়?

সুশীল চাটার্জী জবাব দিলেন,—একটা লম্বা ট্রিপ দেওয়া যাক্! যদি বলো, বরাকর ডাকবাংলো পর্য্যন্ত!

ফুল্লরা কহিল,—কখন্ ফিরবে?

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—যদি কাল ফিরি?

ফুল্লরা বিস্ময়ে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল, মুখে কোনো কথা কহিল না।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—অবাক হয়ে আছো যে!

—তোমার এতখানি অবসর হবে? লোকজন আসবে না?

হাসিয়া সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—না। আজ আমি ছুটী নিয়েছি। সত্যি, ক'দিন বড্ড বেশী পরিশ্রম করেছি। আজ সকাল পর্য্যন্ত তার জের গেছে। কাল বেলা তিনটে পর্য্যন্ত কোন কাজ করবো না।...

ফুল্লরার দুই চোখের বিস্মিত দৃষ্টি তখনো স্বামীর মুখে নিবদ্ধ। সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—সত্যি, মন একটু বিশ্রাম চাইছে, আরাম চাইছে...

এ-কথায় কোন দোষ নাই—অথচ কথাটা ফুল্লরার বুকে বিঁধিল তীর মত। সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটা নিশ্বাস...

ফুল্লরা এ নিশ্বাস রোধ করিতে পারিল না।

সুশীল চাটার্জী তাহা লক্ষ্য করিলেন; লক্ষ্য করিয়া ফুল্লরাকে বুকে

টানিয়া বলিলেন,—মুখখানি মলিন হলো! কেন ফুল? মাই···ডার্লিং···

এ আদরে ফুল্লরার বুকে চিরদিনের নারী—একেবারে ভুমড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরক্ষণেই শিক্ষার চেতনা বিদ্যুতের মত মনকে আঘাতে জাগ্রত করিয়া তুলিল। নিজেকে স্বামীর বাহু-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া ফুল্লরা কহিল—বেশ, তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে, চলো···

—তোমার কোন অসুবিধা হবে না?

ফুল্লরা কহিল—আমার আবার কিসের অসুবিধা! চুপ করে এখানে বসে থাকি—না হয় তার বদলে একটু ঘুরে আসবো—একটু চেঞ্জ!

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—দু'জনে এক-বাড়ীতে বাস করচি যেন সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত! কাজের পাহাড় দুজনের মাঝে মস্ত পাঁচিল তুলে রেখেছে! এক-একবার মনে হয়, কাজের এ দাপে মন বুঝি চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে! তোমার ইচ্ছা করে না, আমার সঙ্গে বসে দুদণ্ড কথা কও?

ফুল্লরা কোন কথা বলিল না। তার মনে পড়িল, সেদিন একখানা নভেল পড়িতেছিল, সেই নভেলের কটা পরিচ্ছেদ···

ইংরেজী নভেল। তিন পরিচ্ছেদ ধরিয়া নায়ক-নায়িকার প্রণয়-লীলার কি রঙীন ছবিই না লেখক আঁকিয়াছে! আঁকিয়া দেখাইয়াছে, দুনিয়ার চারিদিকে কর্ম্ম-কোলাহল—সে কোলাহল তাদের দুজনের মনে এতটুকু চাপিয়া বসে নাই। তারা খেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে যেন প্রকাণ্ড পাহাড়ের শিলা-বন্ধন লঙ্ঘন করিয়া মুক্ত প্রবাহিনীর মত কলহাস্য-গুঞ্জন তুলিয়া অনায়াস স্বচ্ছন্দ গতিতে!

পড়িতে পড়িতে নিজের জীবনের সঙ্গে পরিচ্ছেদগুলা মিলাইয়া দেখিতেছিল। এমনি সুর তুলিয়া তার মন···

কিন্তু কি করিয়া তা হয়? নায়ক-নায়িকা কল্পনার জীব! দুনিয়

লেখায় ঐটুকু শুধু লেখক আঁকিয়া দেখাইয়াছে; বাকী সব-দিকে পর্দ্দা আঁটা। হয়তো এই নায়ক-নায়িকাই ঘরে ফিরিয়া নিজেদের কাজ লইয়া এমন মত্ত থাকিবে যে এ-খেলার রেশও মনের কোণে পিতাইতে পারে না!

তবু ও-খেলা…তার জীবনের একটা পরিচ্ছেদও যদি অমনি খেলার লীলায় ভরিয়া থাকিত!

নভেলখানার এই পর্য্যন্ত সে পড়িয়া রাখিয়াছে! কি জানি, পরের পরিচ্ছেদে ঔদাস্যের আঘাতে, কর্ম্মের চক্র-পীড়নে যদি ও-খেলার স্মৃতি চূর্ণ হইয়া থাকে! কল্পনার ছবি! এমন লীলাখেলার কল্পনাতেও প্রাণে যেন ফাগুন-বাতাসের স্পর্শ আসিয়া লাগে!

স্বামীর কথায় ফুল্লরার মনে চকিতে সেই পরিচ্ছেদগুলার কথা জাগিয়া উঠিল। সে জবাব দিল না। কি জবাব দিবে? কবে একখানা বাঙলা উপন্যাস পড়িয়াছিল, স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া কঠিন ধরণীর বুকে ছোট একটি আরাম-নীড় বাঁধিয়া বাস করিত। তাদের অভাব ছিল, অনুযোগ ছিল—তবু দুটিতে বুকে বুক দিয়া অভাবের মধ্য হইতে কত আরাম সংগ্রহ করিত!

পড়িয়া ফুল্লরা ভাবিয়াছিল, জীবনে অতি ছোট গণ্ডী রচিয়া বাস করে বলিয়া বুঝি অভাবে উহারা টলে না! ছোট আশা, ছোট বাসনা লইয়া কারবার—তাই অবসর প্রচুর। নিজের জীবনের সঙ্গে তাদের জীবনের তুলনা করিয়া দেখিতেছিল…

উপন্যাসের যে-নায়িকা—তার মনের প্রসার কতটুকু! দুনিয়ার কতটুকু সে দেখিয়াছে! চাহিবার মত দুনিয়ার কোথায় কত কি আছে, তার কিছু জানে না! কাজেই একান্তে বসিয়া কল-হাসি আর ভাবার মাহে অতখানি তৃপ্তি পায়! সে ভাবে, দুনিয়ায় তার সকল-চাওয়ার

শেষ হইয়া গিয়াছে। পাইবার বস্তু—শুধু ঐ স্বামীর আদর সোহাগ চুম্বন আর মুখের মিষ্ট-মধুর ভাষা!

সে কথাও মনে পড়িল। ফুল্লরা ভাবিল, ছোট গণ্ডীর মধ্যে এমন অনায়াসে যদি এত আরাম পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাজ কি এ গণ্ডী বড় করিয়া? মনকে নিরন্তর পিপাসু রাখিয়া অতৃপ্তির বাষ্পে ভারী করিয়া লাভ?

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, থাক্ তবে, যেমন আছি, এমনি থাকি।

ফুল্লরা নিশ্বাস ফেলিল। না, না…যদি সেই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মত একটা দিনের জন্যও…

সে কহিল—আমারো ইচ্ছা আছে, তুমি চলো…

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—দু'খানা গাড়ী যাবে। একটায় মাল আর একটায় বিছানাপত্র। বরাকরের ডাক-বাঙলায় রাত্রি-বাস, তার পর কাল সকালে চা খেয়ে পুনর্যাত্রা!

ফুল্লরা কহিল—বেশ। তাই হবে।

—তুমি তাহলে ব্যবস্থা করো।

বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছে। যাত্রার উদ্যোগ সারা হইয়াছে। বাহির হইবে, এমন সময় পর্চ্চে মিসেস দত্তর প্রকাণ্ড উল্‌স্‌লি-কার আসিয়া দাঁড়াইল।

মিসেস দত্ত আসিয়াছেন, তাঁর সঙ্গে আর দু'জন মহিলা। মিসেস দত্ত কহিলেন,—গাড়ীতে জিনিষ-পত্তর তোলা দেখচি…কোথাও বেরুচ্ছো?

ফুল্লরা কহিল,—হ্যাঁ। বরাকর।

—দু'জনে যাচ্ছো? কোনো কাজে?

—না। এমনি বেড়াতে।

হাসিয়া মিসেস দত্ত কহিলেন,—হনিমুন-ট্রিপ?...তাহলে আর বসবো না...আর একদিন আসবো'খন।...মানে, শুনেছো বোধ হয়, মিষ্টার চাটার্জীকে উনি কোর্টে বলেছিলেন, একটা গার্ল স্কুল করতে চাই। এদিককার আয়োজন পাকা—শুধু একটা সীলেক্ট কমিটি তৈরী করা বাকী। মানে, যাঁদের সত্যিকার দরদ হবে। তা, তোমায় একজন sincere worker (নিষ্ঠাবতী কর্ম্মী) বলে এতে নেবার বাসনা বোধ হয় দুরাশা হবে না!

ঈষৎ লজ্জানম্র মৃদু হাস্তে ফুল্লরা কহিল—আমায় কি করতে হবে, বলুন।

অপর দুই জন মহিলাকে নির্দ্দেশ করিয়া মিসেস দত্ত কহিলেন,—ইনি হলেন মিস্ আচার্য্য এম এ, হেড মিষ্ট্রেশের কাজ করতে রাজী হয়েছেন। আর ইনি মিসেস্ ব্যানার্জী বি-এ; ইনি হবেন ওঁর আসিষ্টান্ট। স্কুলটা হবে আমার মায়ের নামে,—ব্রজমোহিনী শিক্ষা-সদন। আজ-কাল দেশী নাম দেওয়া ফ্যাশন হয়েছে। আমার মা এই স্কুলের জন্য দিচ্ছেন বিশ হাজার টাকা; আমি দিচ্ছি পাঁচ হাজার। এদিক ওদিক থেকে আরো পাঁচ হাজার পাওয়া গেছে অর্থাৎ আপাততঃ ত্রিশ হাজার টাকা মজুত। তাতে আমরা ষ্টার্ট করতে পারি। Affiliation সম্বন্ধে কোনো গোলযোগ হবে না। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গার্জ্জেনদের বলেছি, আমাদের স্কুলে যেন সকলে মেয়ে দেন। মাহিনা করেছি অন্য স্কুলের মাহিনার অর্দ্ধেক। দুখানা বাস আর স্কুলের জন্য বাড়ী—আপাততঃ ভাড়া করে চালাবো, সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সব ঠিক। শুধু তোমায় এই স্কুলের সেক্রেটারি হতে হবে। ছেলেমেয়ে নেই—তোমার অবসর আছে, সেই সঙ্গে মস্ত বড় জিনিষ তোমার য়ুনিভার্সিটির সনদ! কি বলো? সময় হবে এ ভার নেবার?

মিস্ আচার্য্য বলিলেন—সময় করতেই হবে। এ সব কাজের ভার যদি না নেবেন, তাহলে এত লেখাপড়া শিখে কি ফল হলো? বলুন।

লজ্জা-জড়িত নম্র ভাষে ফুল্লরা কহিল—ওঁকে বলি···

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মিসেস দত্ত বলিলেন,—অনুমতি চাই? বেশ, formally সে অনুমতি নাও। আমরা আজই প্রস্‌পেক্টাস ছাপতে দিচ্ছি। বসবো না, তোমার বেরুচ্ছ! কথাটুকু পেলেই হবে। তারপর কাল-পরশু এসে তোমায় নিয়ে যাবো স্কুল দেখাতে। মানে, পরের মাস থেকেই সেশন্স আরম্ভ করছি। পঁচিশটি মেয়ে পেয়েছি। তারা ভর্ত্তি হয়েছে।

সুশীল চাটার্জী আসিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনাদি সারা হইলে মিসেস্ দত্ত কহিলেন,—আপনি অনুমতি দিলেই হয়, মিষ্টার চাটার্জী। মিসেস্ চাটার্জীর নিজের অমত নেই সেক্রেটারী হয়ে স্কুলের ভার নিতে···

হাসিয়া সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—আপনাদের সঙ্গে মিলে এত বড় কাজ করবেন, এতে আমার খুব অনুমতি আছে।···সত্যি ফুল, এত বড় সম্মানের পদ তুমি গ্রহণ করো—আমার অনুরোধ।

ফুল্লরা মাথা নত করিল।

উচ্ছ্বসিত স্বরে মিসেস দত্ত কহিলেন,—তাহলে আজ আসি। আপনারা চলেছেন pleasure-tripএ···সময় নষ্ট করবো না। কাল-পরশু আবার আসবো'খন।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—শুধু একটি কথা—সেদিন মিষ্টার দত্তকে বলেছিলুম···মানে, আমাদের গৃহস্থ-ঘরে যে শিক্ষায় কাজ দেবে, এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। প্রাচ্য আদর্শে এ স্কুল পরিচালিত হোক!

মিস্ আচার্য্য কহিলেন,—কিন্তু য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে তো!

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—ঐখানেই আপনাদের সঙ্গে আমার মত মিলবে না। বি-এ, এম-এ পাশ করে' আমাদের গৃহস্থ-ঘরের বৌ-ঝিয়েরা সংসারে কি মহাব্রত সাধন করবে, বলতে পারেন? পুরুষদের মধ্যে পাশের ফলে দেখা দেছে অসন্তোষ আর বেকার-সমস্যা! পাশ করে' জীবনকে প্রতিনিয়ত অভিশাপের বিষে জর-জর করছি! গৃহস্থের অন্দরে বেকন্, ডেকার্টে, স্পিনোজা, রাস্কিন এসে মেয়েদের মনেও যদি তেমনি অসন্তোষ জাগায়?···না, না মিসেস দত্ত, পুরাতনের পুনঃ-প্রবর্ত্তন চাই। দেখছি তো, বিলাতীয়ানায় আমরা নিঃস্ব হয়ে মরতে বসেছি। এ চাল খাপ খায় মোটা তহবিলের সঙ্গে।

হাসিয়া মিসেস্ বানার্জী কহিলেন—জগৎ-সভায় দাঁড়াতে গেলে কালের তালে পা ফেলে চলতে হবে।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—আচ্ছা, আজ সময় নেই—একদিন আপনাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কয়ে আমি একটা সিষ্টেম আপনাদের সামনে ধরে দেবো—ব্যাপারটা বোঝাবো: সে পদ্ধতিতে মেয়েদের শিক্ষা দিলে তবেই সে শিক্ষা সার্থক হবে, মনে করি। না হলে আর পাঁচটা স্কুলের প্যাটার্ণে আর-একটা নতুন স্কুল করার মানে দাঁড়াবে শুধু স্কুলের ব্যবসা। সে স্কুল হবে শুধু দোকানদারী!

হাসিয়া মিসেস্ দত্ত কহিলেন—আসবো একদিন, শুনবো আপনার কি সে সিষ্টেম। এ স্কুলের ব্যাপারে শুভার্থী বন্ধুদের সব রকম স্বাস্থ্যকর পরামর্শ উপদেশ নেবার জন্য আমরা আমাদের মনকে সর্ব্বক্ষণ মুক্ত রাখবো।

যথারীতি সম্ভাষণ সারিয়া মিসেস দত্ত তাঁর সঙ্গিনীসহ বিদায় লইলেন।

সুনীল চাটার্জী তখন ফুল্লরার পানে চাহিলেন। ফুল্লরা নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে। সুনীল চাটার্জী কহিলেন—এসো ফুল···তুমি যাত্রার জন্য রেডি?

ঘাড় নাড়িয়া ফুল্লরা জানাইল, হাঁ।

উভয়ে গিয়া মোটরে বসিল। মোটর চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঘ ও হরিণ

ভোরে উঠিয়া দুজনে ঘরে বসিয়া চা-পান করিতেছে, খট্‌খট্‌ জুতার শব্দে চারিদিক কাঁপাইয়া দ্রুত পায়ে কে আসিয়া একেবারে বাঙলোর সিমেণ্ট-করা বারান্দায় দাঁড়াইল; সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠে আহ্বান জাগিল,—বোয়!

পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া সুশীল চাটার্জী দ্বারের পর্দার পানে চাহিলেন, কহিলেন,—সকালেই আবার অতিথ্ এলো কে!

আবার জুতার শব্দ এবং পর্দার আড়াল হইতে মুখ বাড়াইল···

সে মুখ দেখিয়া ফুল্লরা চমকিয়া উঠিল। ছবি! এখানে হঠাৎ? এমন সময়ে···একা?

আর এ কি তার মুখের শ্রী! মাথার কেশ বিস্রস্ত—দুই চোখের কোলে কালি ঢালা! উত্তেজনায় ছবির দেহ কাঁপিতেছে!

ফুল্লরা ডাকিল—ছবি···

সে ডাক শুনিয়া ছবি কাঠ হইয়া দাঁড়াইল। নিমেষের জন্য। তার-পরেই যেন তার সকল শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল। একান্ত শ্রান্ত অবসন্ন দেহ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া চেয়ার টানিয়া একেবারে ফুল্লরার গায়ের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া পড়িল। হাতে ছিল ভ্যানিটি ব্যাগ; হাত হইতে সেটা খশিয়া পড়িয়া গেল।

ফুল্লরা কহিল,—ব্যাপার কি ছবি? এখানে এমন সময়ে এ মূর্ত্তিতে···?

কোনো মতে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ছবি কহিল,—বলবো।…একটু দম নিতে দাও…

তারপর সুশীলের পানে সে চাহিল, চাহিয়া কহিল—মিষ্টার চাটার্জী?

ফুল্লরা কহিল—হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যার সময় আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। একটু পরেই ফিরবো।

ছবি হাঁফাইতেছিল। টেবলের উপর শ্রান্ত শির রাখিয়া চক্ষু মুদিল।

ফুল্লরা তাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। জুতা-জোড়া ধূলায় ধূসর হইয়া আছে…শাড়ী কালি-ঝুলি মাখা। বেশ-ভূষা বিমলিন বিশৃঙ্খল। তার উপর এমন বিপর্য্যয় ভঙ্গী…

যেন মস্ত কি একটা ঘটিয়া গিয়াছে! ঘটিবার নয়, এমন কোনো ঘটনা!…কি ঘটিয়াছে?

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া সুশীল চাটার্জী কহিলেন—তোমরা কথাবার্ত্তা কও…আমি একটু ঘুরে আসি।

ফুল্লরা স্বামীর পানে চাহিল—কোনো কথা কহিল না। সুশীল চাটার্জী বাঙলো ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া গেলেন।

বহুক্ষণ নীরবে কাটিল। ফুল্লরা ডাকিল—ছবি…

ছবি মুখ তুলিল। মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতে ছিল—চোখের জলে মুখের কালি আরো ঘন হইয়া মুখে লেপিয়া আছে।

ছবি শুধু নিশ্বাস ফেলিল; কোনো কথা বলিতে পারিল না।

ফুল্লরা কহিল—বল্…এখানে এ-বেশে এলি…এর মানে?

ছবি কহিল—আগে একটু চা দিতে বল্…গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

ফুল্লরা কহিল—সত্যি, ভুলে গিয়েছিলুম!…যে-বেশে হঠাৎ এসে দাঁড়ালি…

ফুল্লরা উঠিয়া বয়কে আদেশ দিল চা ও টোষ্ট আনিবার জন্য...

চা পান করিয়া ছবি কহিল—তোর শাড়ী একখানা পাবো? স্নান করে নি... বড্ড বিশ্রী লাগচে।

ফুল্লরা কহিল—যা, তবে স্নান করে আয়। কাপড়-চোপড় আমি ঠিক করে দিচ্ছি।...ঠাণ্ডা হ'...তারপর বলিস তোর কথা...

ছবি কহিল—আমাকে নিয়ে যাবি তোদের সঙ্গে?

ফুল্লরা কহিল—কেন নিয়ে যাবো না!...মোদ্দা তুই ওঠ, আর দেরী করিস্‌নে। তোর এ-মূর্ত্তি দেখে সত্যি মনের আতঙ্ক ঘুচচে না...যা ছবি...

ছবি স্নান করিতে গেলে ফুল্লরা নিজের স্যুটকেশ খুলিয়া ছবির জন্য একপ্রস্থ শাড়ী-সেমিজ-পেটিকোট প্রভৃতি বাহির করিয়া দিল।

স্নানের পর শুভ্র বেশে ছবির বিমলিন শ্রী অনেকখানি ঘুচিল। ফুল্লরা তাকে লইয়া বাংলোর বাহিরে আসিয়া বসিল; নির্জ্জন প্রান্তরে একটা টিলার উপর। বসিয়া বলিল,—কি হয়েছিল, বল্‌ তো...

ছবি উদাস নয়নে আকাশের পানে চাহিয়া ছিল, ফুল্লরার কথায় তার পানে ফিরিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বললে বিশ্বাস করবি সব কথা?

ফুল্লরা কহিল,—তোর ভূমিকা রেখে বল্‌, যা বলবি।

ছবি কহিল—বলবো। বলতে বসে শুধু একটা কথা মনে পড়চে...

—কি কথা?

—যে, মানুষকে বিপদ-আপদে রক্ষা করবার জন্য কেউ এক জন আছে, নাহলে এমন অসময়ে এ বাঙলোয় তুই এসে উঠবি কেন? সত্যি, যখনি এ কথা মনে পড়ছে, মন তখনি কেমন এক রকম হয়ে যাচ্ছে...

আর একটা নিশ্বাস...সে নিশ্বাসে ছবির কথা শেষ হইল না।

সুন্দরা ছবির পানে চাহিয়া রহিল—মুখের সেই দৃষ্টিতে রাজ্যের মমতা যেন মাখানো রহিয়াছে! ছবি সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। সে-দৃষ্টির গভীরতা সে অনুভব করিল, করিয়া বলিল—শোন্‌, বলি।

ছবি যে কথা বলিল, তার মর্ম্ম,—হাজারিবাগে বড় একটা কাজের ব্যবস্থা করিবার জন্য সে আসিতেছিলে ট্রেনে। সে সংবাদ শুনিয়া শোভন বিশ্বাস বলে—ট্রেনে কেন কষ্ট করিয়া যাইবেন? তার চেয়ে আমি চলিয়াছি রাঁচিতে—মোটরে। সেই মোটরে চলুন। আপনাকে হাজারিবাগে নানাইয়া দিয়া যাইব। দু'দিন পরে রাঁচি হইতে ফিরিবার সময় আবার আমার মোটরে চড়িয়া আপনি কলিকাতা ফিরিবেন। এ পথে মোটর-ট্রিপ ভারী আরামের···

মোটর-ট্রিপের এ লোভ ছবি সংবরণ করিতে পারে নাই। বেলা চারিটার সময় ছোট স্যুটকেশে কাপড়-চোপড় ভরিয়া সে বাহির হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসে দুর্গাপুরের জঙ্গলে; সেখানে গাড়ী হইতে নামে। জঙ্গল দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। তারপর আশানসোল। সেখানে আহারাদি সারা হইলে শোভন বলে,—রাত্রিটা এখানে ডাকবাঙ্‌লোয় থাকিবেন? না, মোটর চালাইয়া অগ্রসর হইব? আকাশ-ভরা চমৎকার জ্যোৎস্না···পথ নিরাপদ···

এ কথায় ছবির লোভ হয়, মন্দ কি! জীবনে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা! ডাক-বাংলোর ঘরে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে মোটর-ট্রিপ···সে বলিল,—চলুন, পথে মিথ্যা দেরী করিয়া কোনো লাভ নাই!

রাত্রি দশটার পর মোটর আশানসোল ছাড়ে। মোটর বেশ চলিয়াছিল। সহসা ধূ-ধূ প্রান্তর-পথে কি যে হইল, মোটর গেল থামিয়া। নামিয়া শোভন কি ধস্তাধস্তি না করিল! বনেট খুলিয়া—তলায় উঁকি দিয়া এধার-ওধারে বহু তদ্বির। কিন্তু মোটর নড়িতে চাহিল না। শোভন

গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া গেল। অবশেষে হতাশ্বাসে সে বলে—বিপন্ন হলো দেখছি! কি যে কোথায় বেগড়ালো—হদিশ পাচ্ছি না। অথচ বিজন মাঠ—লোক-জনের চিহ্ন নাই। সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত নিরুপায়!

সত্যই নিরুপায় বুঝিয়া ছবি বলে—গাড়ী যখন চলবে না···

শোভন বলিল—এক কাজ করলে কি হয়? পথে আশ্রয় মেলবার কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না···সুতরাং আমি বলি, আপনি গাড়ীর সীটে ঘুমোন—আমি ঐ ছোট সতরঞ্চখানা গাড়ীর ধারে পেতে বসে থাকবো···

ছবি বলে,—আপনি শোবেন না? বাঃ!

হাসিয়া শোভন বলে,—হাজার হোক আপনি অবলা নারী—আমি সবল পুরুষ! নারীকে রক্ষা করবার ভার পুরুষ চিরদিন পেয়ে আসছে।

ছবি জবাব দেয়—তা'বলে আপনি ঘুমোবেন না?···এখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই! ধূ-ধূ মাঠে আপনি বলতে চান, চোর আসবে চুরি করতে?

এ কথার উত্তরে শোভন যে কথা বলে, সে কথা তার কাণে ভালো লাগে নাই।

শোভন বলে—চোরের লোভ কি শুধু গহনার উপর?...এমন কিশোরী রূপসী···তার লোভে স্বর্গের দেবতারা প্রমত্ত হন···

এ কথা শুনিয়া ছবি গুম্ হইয়া থাকে। গুম্ হইয়া থাকিলেও মনের কোণে গর্ব্ব একটু জাগিয়াছিল বৈ কি, ছবি তাহা লুকাইতে পারে নাই। এবং সে গর্ব্ব মিষ্ট-মধুর হাসির তরঙ্গে অধরে উথলিয়া উঠিয়াছিল! তাকে নীরব দেখিয়া শোভন বলিল, যদি ঘুম পায়, গাড়ীতে ঠেশ দিয়ে চোখ বুজবো'খন!

সেই ব্যবস্থা হইল। এবং সারাদিনের ক্লান্তি—মুক্ত প্রান্তরে প্রচুর বাতাস···ছবি ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন আফ্রিকার কোন্ জঙ্গলে গিয়াছে —শোভন আছে সঙ্গে। বনে পাখীর গানে প্রাণে কখনো আরামের বন্যা বহিয়া যায়—আবার পরক্ষণে জাগে পশুর হুঙ্কার—প্রাণ চমকিয়া ওঠে! শোভনের হাতে বন্দুক···শোভন আগে আগে চলিয়াছে, সে পিছনে। বায়োস্কোপে-দেখা আফ্রিকার বন-গিরি-পর্ব্বত···চকিত-চমকে বুক দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে! এমন সময় শুনা গেল দূরে দামামা-নাদ! শোভন কহিল,—সর্ব্বনাশ! বুনোর দল সন্ধান পেয়েছে! উপায়?

ভয়ে ছবি শোভনের হাত চাপিয়া ধরিল। শোভন কহিল,—আমি বন্দুক উঁচিয়ে আছি! ভয় নেই!

দামামা-নাদ আর অট্ট-ধ্বনিতে বন কাঁপিয়া উঠিল। কাতারে কাতারে কালো কাফ্রীর দল দৈত্যের মত যেন পৃথিবীর বুক চিরিয়া প্রান্তরে আসিয়া দেখা দিয়াছে। তাদের হাতে মশালের আলো, শড়কী, বর্শা— আর মুখে উল্লাসের বিকট বজ্র-নির্ঘোষ

শোভনের বন্দুকে গুলি ছুটিল মুহুর্মুহু···কাফ্রীর দলে লোক মরিতেছে —তবু তাদের গতির বিরাম নাই। যেন কালো জল-তরঙ্গ ফুলিয়া ফুঁশিয়া ছুটিয়া আসিতেছে

সে ঢেউ কাছে আসিল···আরো আছে···এবং তাহার তীব্র আঘাতে শোভন ছিট্‌কাইয়া কোথায় সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো জুয়ান কাফ্রী হ-হা রব তুলিয়া ছবিকে একেবারে বজ্র-বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। সে-চাপে ছবির নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো!

কোনোমতে চোখ মেলিয়া চাহিতে সে দেখে, আকাশের চাঁদ মেঘের পিছনে কোথায় গিয়া লুকাইয়াছে! জ্যোৎস্নার গায়ে কালি ঢালা —আর তার বুকের উপর সত্যই কার বাহুর কঠিন বাঁধন! কিন্তু কালো কাফ্রীর বাহু নয়! এ বাহু···

শোভন বিশ্বাসের!

প্রাণপণ বলে ছবি নিজেকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইল। দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম! শোভনের মুখে ভাষার যেন তরঙ্গ বহিতেছিল! কখনো মিনতির স্বর—ছবি, ছবি···!

কখনো রুদ্র তর্জ্জন! শোভনের মুখে ইতর ভাষা,—কত দিন, কত··· কত দিন আমায় নিয়ে এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলবে. ছবি? এ খেলা আর নয়! আজ তোমায় নিজের কবলে পেয়েছি···ছাড়বো না...আমি ছাড়বো না! তুমি নারী ··আমি পুরুষ···

বিপুল বিক্রমে শোভনকে গাড়ী হইতে ঠেলিয়া সে ফেলিয়া দেয়। তার দেহে এত শক্তি ছিল, ছবি তা জানিত না।

শোভন পড়িয়া যাইবামাত্র ছবি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পথে নামিয়া পড়ে; এবং নামিয়া যে-দিকে দু' চোখ যায়···

শোভন আসে পিছনে তাড়া করিয়া···

ছুটিয়া কতক্ষণ ছবি আত্মরক্ষা করিবে? অসম্ভব!···

পায়ের কাছে পড়িয়াছিল এক-টুকরা লোহার রেল···রেলের সীমানা রচিতে কে কবে আনিয়াছিল—অপ্রয়োজনে ফেলিয়া গিয়াছে। সেই টুকরা রেল-লাইনটা হাতে তুলিয়া ছবি একেবারে নৃমুণ্ড-মালিনীর শক্তিতে রুখিয়া দাঁড়াইল। প্রমত্ত পুরুষ! তার কি তখন কোনো দিকে আর দৃষ্টি আছে? চোখের সামনে হইতে দুনিয়া মুছিয়া গিয়াছে, জাগিয়া আছে শুধু এক কিশোরী নারীর যৌবন-পরিপুষ্ট অঙ্গ! সে দেহের লোভে পুরুষ চেতনা-হারা···

শোভন আরো কাছে আসিল। ছবি দাঁড়াইয়া আছে...তার চোখের সামনে বিশ্ব-নিখিল বিলুপ্ত-প্রায়।

তার পর কি যে হইল—ভালো মনে পড়ে না...শুধু নিমেষের জন্ত

জ্যোৎস্নার গায়ে যেন রাঙা আবীরের ছিটা...সঙ্গে সঙ্গে ছুনিয়ার আলো গেল দপ্ করিয়া নিবিয়া এবং রক্তের প্রবাহ ছুটিল দিক্-দিগন্ত ঢাকিয়া।

কি করিয়া কোন্ দিকে চাহিয়া ছবি চলিয়াছে...খেয়াল নাই!

ছুনিয়ায় আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়িল এই গৃহ...

কার গৃহ—এখানে মানুষ আছে, কি দৈত্য আছে—সে কথা মনে জাগে নাই...গৃহ দেখিয়া একেবারে আসিয়া সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে! তার পর...

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দৈত্য-তত্ত্ব

যেন সে-কালের রূপ-কথার গল্প !

এ-কালে এই শিক্ষা-সভ্যতার যুগেও এমন ব্যাপার সম্ভব—ফুল্লরা স্বপ্নে কোনোদিন ভাবিতে পারে নাই ! সে ভাবিত, স্ত্রী-পুরুষে সাম্য, সখ্য, অথচ সত্যই এ কি ব্যাপার ঘটিল ?

স্তম্ভিতের ভাব কাটিলে ফুল্লরা কহিল—এখন কি করবি ?

ছবি কহিল,—তাই ভাবচি ।

ফুল্লরা কহিল,—ভাববার সময় বেশী নেই । উনি এসে কখন্ বলবেন, চলো...তবে, এর পরে হাজারিবাগ যাবার ইচ্ছা আছে ?

ছবি কহিল,—কাজ রয়েছে । উপায় কি ? পেশা !

ফুল্লরা কোনো জবাব দিল না । ছবি কহিল,—কি ভাবচিস ?

ফুল্লরা কহিল—মেয়ে-জাত পেশা অবলম্বন করবে, ভাবি ; কিন্তু পথে-ঘাটে এ-রকম অপমান যদি ঘটে—বন্ধুত্বের সুযোগে এত বড় অত্যাচার...! তাই ভাবচি, কার উপর মেয়েমানুষ বিশ্বাস রাখবে ?

ছবি কহিল—ভদ্র সমাজেই এ অত্যাচারের ভয় বেশী, দেখচি। কিন্তু এতে আমি দম্‌বো না !

—না দমিস্, মনের সরল সহজ বিশ্বাস তো হারালি ! এখন এ তর্ক থাক্ ! সত্যি, এখন হাজারিবাগ যাবি ? না, আমাদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরবি ?

ছবি কহিল—কলকাতায় ফেরবার আগে একটু কথা আছে ।

—কথা ?

—মিষ্টার চাটার্জ্জী যে-মূর্ত্তিতে যে-বেশে আমাকে এখানে আসতে দেখেছেন, তাতে তাঁর মনে কৌতূহলের অন্ত নেই নিশ্চয়। যদি জিজ্ঞাসা করেন ?

ফুল্লরা কহিল—সে ভয় নেই। অহেতুক উনি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না...আচ্ছা, সে ভদ্রলোকটির কি হলো তারপর ? তুই তো রেল তুলে ঘা বসিয়েছিলি ! যদি মাথা ফেটে মারা গিয়ে থাকে ?

ছবি শিহরিয়া উঠিল।

ফুল্লরা কহিল,—তুই তাঁর সঙ্গে ছিলি, এ-কথা অপ্রকাশ থাকবে না। তোর স্যুটকেশ হয়তো তাঁর মোটরে পড়ে আছে। যদি মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে একটা হৈ-চৈ গোলযোগ পড়ে যাবে ! থানা, পুলিশ, খবরের কাগজ...

কথাটা বলিতে বলিতে ফুল্লরার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। ছবিরও ভয় হইল—সত্যই যদি শোভন মারা গিয়া থাকে !

থানা...পুলিশ...

ছবির চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন অস্পষ্ট আব্‌ছায়ায় মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুশীল চাটার্জী ফিরিলেন, কহিলেন—এবারে যাবার আয়োজন করা যাক।

ফুল্লরা কহিল,—একটা কথা ছিল...

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—কি কথা ?

ফুল্লরা বলিল—তুমি একটু অপেক্ষা করো—ছবির সঙ্গে পরামর্শ করে আমি এখনি বলচি।

সুশীল চাটার্জী বাহিরে গেলেন। ফুল্লরা ডাকিল—ছবি...

ছবি কাঠ হইয়া বসিয়া আছে...ফুল্লরার আহ্বানে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে তার পানে চাহিল।

ফুল্লরা কহিল—আমি তোর বন্ধু। আমার স্বামী...ওঁকেও তুই বন্ধু বলে জানিস। সত্যি, আমার ভয় হচ্ছে...যা হয়ে গেছে, চারা নেই। কিন্তু যে-ভয় করচি, যদি সত্যই তা ঘটে থাকে, তাহলে এ সব ব্যাপার নিয়ে যাঁরা নিত্য চর্চ্চা আলোচনা করচেন, বিশেষ এতে আইন-পুলিশের কথা যখন আছে, তখন আমার মনে হয়, ওঁর কাছে কথাটা প্রকাশ করে বলে' এর মীমাংসা শেষ করে ফেলা ভালো। নাহলে মনে যে অস্বস্তি জেগে থাকবে, আরাম পাবো না! কি বলিস?

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে ছবি ফুল্লরার পানে চাহিয়া রহিল।

ফুল্লরা কহিল,—এতে তোর আপত্তি কিসের! সরল বিশ্বাসে যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলি, সে যদি সুযোগ পেয়ে গলায় ছুরি দেয়, তাতে তোর কোন অপরাধ নেই। এ অপমানের পায়ে তুই যে বলি হোস্‌নে—নিজের তেজে দর্পে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসেছিস, তাতে শুধু তোরই গৌরব নয় ছবি,—আমাদের মেয়ে-জাতের তাতে গৌরব! এ ঘটনার পর অনেক পুরুষ-মানুষ মেয়েদের দুর্ব্বল অসহায় ভেবে এমন ইতর নির্য্যাতনে সাহস পাবে না। কি বলিস? ওঁকে বলি ...?

ছবি কহিল—কি জানি ভাই, বুঝতে পারচি না।

ফুল্লরা কহিল—তোর বোঝবার দরকার নেই। তোর বোঝবার কথাও নয়। যা হয়েছে, তার ভালো-মন্দ বিচার করবো আমরা—যারা বাইরে থেকে এ ব্যাপার দেখেচি বা জেনেচি।

নিশ্বাস ফেলিয়া ছবি কহিল,—বেশ, বল্।

স্বামীকে ডাকিয়া ফুল্লরা সংক্ষেপে তাঁকে এ কাহিনী খুলিয়া বলিল। ছবি যে পুরুষ-মানুষের সঙ্গে সমানে পা ফেলিয়া চলে,—পুরুষের দুর্ব্বল

মনের উপর দিয়া সে তার বিজয়-রথ নির্ব্বিবাদে চালাইয়া যায়—সে কথাটা অবশ্য প্রকাশ করিয়া বলিল না; সেটুকু বলিবার প্রয়োজন ছিল না।

কাহিনী শুনিয়া সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—মেয়ে-জাতের সঙ্গে পুরুষের যে এই খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক—এত যুগের শিক্ষা-দীক্ষাতেও তা ঘুচলো না, দেখচি।

ফুল্লরা কহিল—এখন তোমার মন্তব্য রেখে যা উচিত, তাই করো···

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—তাহলে সেধে-যেচে পুলিশের দোরে গিয়ে দাঁড়াবার আগে খপর নেওয়া দরকার, সে ভদ্রলোকটির কি অবস্থা ঘটেচে। মাঠের মধ্যে ফাটা মাথা নিয়ে পড়ে আছেন—না দশান্তর ঘটেচে। হয়তো খুব বেশী জখম হয় নি, পালিয়েছে। তবে মারা না গিয়ে থাকলে প্রহারের এ ইতিবৃত্ত তার মুখ থেকে লোক-সমাজে কস্মিন্ কালে প্রকাশ পাবে না—জেনো। কেন না, এ বীরত্ব তিনি হাজারিবাগে বাঘ মারতে গিয়ে প্রকাশ করেন নি তো!

ফুল্লরা কহিল—কিন্তু তিনি পালালেন, কি, পথে পড়ে রইলেন—সে খপর এখন কি করে পাওয়া যাবে?

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—উপায় আছে। তোমার বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করো দিকিন্—রাত্রে মোটরখানা যে থেমেছিল, তা কি এই সিধে রাস্তার উপরে? না, মাঠের বুকে?

ফুল্লরা কহিল—আমাকে ইণ্টারপ্রিটার রেখে এ-সব খপর নেবার দরকার নেই। ছবিকে ডাকি। যা জিজ্ঞাসা করবার, তাকেই তুমি জিজ্ঞাসা করো।

—বেশ। তাহলে কাজের সুবিধা হবে।

ছবি আসিল। সুশীল চাটার্জী তাকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ছবির

যতদূর মনে পড়ে, গাড়ী ঠিক সিধা পথ ধরিয়া চলিয়াছিল; যেখানে গাড়ী থামে, সেখানে একটা মাইল-পোষ্টের নম্বরও সে বলিল।

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—গাড়ী থেকে লাফিয়ে আপনি যে ছুটলেন, সে কি পথের উপর দিয়ে? না, মাঠ ভেঙ্গে?

ছবি কহিল—মাঠ। মাঠ থেকেই এক টুকরো রেল কুড়িয়ে নিই। আর মাঠের উপরেই সেই রেল দিয়ে...

সুশীল চাটার্জ্জী কি ভাবিলেন, তারপর কহিলেন—আপনারা দুজনে এখানে অপেক্ষা করুন তাহলে। গাড়ী নিয়ে এদিক-ওদিক অর্থাৎ up and down দুদিকেই আমি এগিয়ে দেখি...কিছু চিহ্ন পাবোই। ভদ্রলোক যদি চোট খেয়ে সরে থাকেন...

ফুল্লরা কহিল—কিন্তু কি করে সরবে? গাড়ী বিগড়ে অচল হয়ে আছে যে!

মৃদু হাসিয়া সুশীল চাটার্জী কহিলেন—গাড়ী বেগড়ায় নি। ওটা ভাণ...

ফুল্লরার সারা অঙ্গে রোমাঞ্চ ফুটিল। দুই চোখ যেন ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিবে, এমন!

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—এ সঙ্কল্প তার হঠাৎ জাগেনি ফুল—গাড়ী-বেগড়ানোর ছল তুলেচে বিজন মাঠ দেখে...এমন বহু দুর্বৃত্ততা পূর্ব্বেও ঘটেছে এবং সে সব দুর্বৃত্ততার প্রণালী এই একই রকমের...

ফুল্লরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—একটা কথা...যদি কিছু মনে না করেন...

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুশীল চাটার্জী চাহিলেন ছবির পানে...

ছবি কহিল,—বলুন...

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—এঁর সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ? সে আলাপ বোধ হয় বন্ধুত্বে দাঁড়িয়েচে?

একটা ঢোঁক গিলিয়া ছবি কহিল—আলাপ প্রায় মাস আষ্টেক···মানে, ওঁর একটা কারবার আছে। আমি সে কারবারের ক্যানভাসার...

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—আমিও তাই ভেবেছিলুম···বেশ, অপেক্ষা করুন। আমি এখনি ফিরছি।···

সুশীল চাটার্জী চলিয়া গেলে ফুল্লরা কহিল—মনে পড়ে ছবি, সেদিন প্রিন্সেপ্স্ ঘাটের কাছে তুই কি বলেছিলি? আমি বলেছিলুম, আগুন নিয়ে খেলা কর্‌চিস্—তাতে তুই জবাব দিয়েছিলি, আগুন নিয়ে যে খেলতে জানে, তার পাথ্‌নায় এতটুকু আগুন লাগে না···

ম্লান মৃদু হাস্যে ছবি বলিল,—কিন্তু আজো আমার মনের গতি পাতালের দিকে ঝোঁকেনি, ফুলু···

—না ঝুঁকুক···এই সব ভদ্রবেশী ইতর লোকগুলোর সঙ্গে মেলামেশায় মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়—তা মানিস?

ছবি কহিল—মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি-টুতি বুঝি নে—তবে আমার নিজের বুদ্ধির আর শক্তির উপর বিশ্বাস আছে···এতদিন মিছিমিছি এতগুলো বুদ্ধিমান পুরুষকে ভুলিয়ে নিজের ব্যবসা-বুদ্ধিকে প্রখর করে তুলিনি! এঁর জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। মানুষ এ রকম বন্য পশুর মত ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করবে, কথায় বা আচরণে এতটুকু ইঙ্গিত আগে পাইনি···কোনো দিন নয়!···তা ছাড়া অন্দরের নিভৃত জেনানা-মহলেও এ আক্রমণ সম্ভব ছিল ফুলু!

ফুল্লরা কহিল—আমার মন সেকালের অন্ধকার জেনানার তারিফ

করে না—সত্যি। তা বলে যে-সে পুরুষের সঙ্গে এমন অবাধ মেলা-মেশাতে আমার বিরাগ আছে প্রচণ্ড রকম।

ছবি কহিল—যে-ভাবে তুমি মানুষ হয়েচো, তাতে বাহিরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রাখবার প্রয়োজন হয়নি এবং হবে না—তাই তুমি এ কথা বলচো। কিন্তু ঘটনাচক্রে বাহিরের পাঁচ জনের সঙ্গে পথে-ঘাটে মিলে-মিশে আমাকে বড় হতে হয়েচে; এবং মিশতে হবে। কেননা, বাহিরে এই মেলা-মেশার উপর দু'মুঠো অন্ন আর আচ্ছাদন-বস্ত্রের সংস্থান আমাকে করতে হয়…

ফুল্লরা কহিল—সে তোমার সখ…বিয়ে-বস্তুটা আজো দুর্লভ হয়নি। পয়সা রোজগার করো, তাতে আপত্তি করচি না—কিন্তু সেজন্য বিয়েতে বিরাগ থাকবে কেন? মাথার উপর স্বামী—মেয়ে-জাতের মস্ত সহায়! তা সে স্বামী মেয়েলি স্বভাবের হোক, বা নিষ্কর্ম্মাই হোক…

ছবি কহিল,—তুই তো জানিস ফুলু…আমার জীবনের লক্ষ্য…গতি …সবই। সব মানুষকে বিধাতা সমান রুচি দেন না। কথাটা বলিয়া ছবি মৃদু হাসিল।

সুশীল চাটার্জী ফিরিলেন—প্রায় আটটার পর। ফিরিয়া সংবাদ দিলেন, মোটর গাড়ী নাই, তবে রক্তমাখা রেল তিনি পথে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাছাড়া এই ফাউণ্টেন পেনটি পড়িয়াছিল…কুড়াইয়া আনিয়াছেন…

ফাউণ্টেন পেন দেখিয়া ছবি কহিল—ওঃ! এটা তার…আমি দেখেচি…পার্কারের পেন!

তাহা হইলে পলাইয়াছে! ফুল্লরা অস্বস্তি ঘুচিল।

ছবি কহিল—তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় তাহলে ফিরি। বিশ্বাস

কলকাতায় ফিরেছে কি না দেখতে হবে। যদি ফিরে থাকে, তাহলে···
দেখবো'খন কি করতে পারি।

কলিকাতায় ফেরা হইল। ছবি গেল নিজের গৃহে।

সন্ধ্যার সময় সুশীল চাটার্জী আসিয়া ফুল্লরাকে কহিলেন,—তোমার বান্ধবীটিকে সাবধান করে দিয়ো। তোমাকে আমি বহু বার বলেছি, এ যুগে পুরুষ-মানুষের মন থেকে সেই আদিম যুগের বর্ব্বর দৈত্যটা এখনো বার হয়ে যায়নি···সে আছে তার মনের মধ্যে। তবে ঘুমোচ্ছে! খুব সাবধানে না চললে, সে দৈত্যের ঘুম ভাঙ্গা বিচিত্র নয়। বেচারা মেয়ে-জাত বোঝে না, নিজের মতই পুরুষ-জাতকে সরল মনে করে। এত দুঃখ-দুর্দ্দাশার খানিকটা যে এই অতি-বিশ্বাসের ফলে ঘটচে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই!

ফুল্লরা কহিল—মেয়ে-জাতের মনে দৈত্য নেই? জাগন্ত বা ঘুমন্ত—কোনো বেশে?

হাসিয়া সুশীল চাটার্জী কহিলেন—হয়তো আছে। কিন্তু মেয়েদের মনের সে-দৈত্য ঘুমোয় কুম্ভকর্ণের মত। ন' মাসে ছ'মাসে হয়তো নিমেষের জন্য জাগে। জাগলেই সে দৈত্যের মরণ-আশঙ্কা খুব বেশী।···হয়তো আমার এ ধারণা ভুল! তবু অকপটে বলচি, মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই আমার মত।

———

নবম পরিচ্ছেদ

মেয়ে-পক্ষের কথা

বেলা দশটার সময় মিসেস দত্ত আসিয়া ফুল্লরাকে স্কুলে লইয়া গেলেন। স্কুল-বাড়ীটি বেশ খোলা জায়গায়। ফটকে কাঠের ফলক আঁটা; তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—ব্রজমোহিনী শিক্ষা-সদন।

মিস্ আচার্য্য অভ্যর্থনা করিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জী বলিলেন,—পাঁচটি নতুন মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হতে আসচে আজ। তাদের গার্জেনরা থাকেন এই মহল্লায়। পাশাপাশি বাড়ী। তাঁরা বলচেন, লেখাপড়া একটু অল্প শেখান তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু ঐ যে বেলা নটায় গাড়ী পাঠিয়ে মেয়েদের হুড়িয়ে বাড়ীর বার করে নিয়ে আসবেন, লাভের মধ্যে মেয়েগুলোর খাওয়া হবে না, সে-ব্যাপার যাতে না ঘটে, দয়া করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আগে স্বাস্থ্য, তারপর লেখাপড়া। তাঁরা বলেন, মেয়েদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা যত বাড়চে, তাদের মূর্ত্তি দেখে ততই শিউরে উঠচি! স্বাস্থ্যের রস নিঙড়ে বার করে তাদের আপনারা অস্থিচর্ম্মসার করে' তুলচেন! মাথার ব্যামো, আর সেই সঙ্গে পাঁচটা উপসর্গে গৃহস্থ-সংসার উদ্বাস্ত হতে বসেছে! বাঙালী মেয়েদের রূপ-লাবণ্য উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাচ্ছে।

কথাটা এইখানে শেষ করিয়া মিসেস ব্যানার্জ্জী মৃদু হাসিলেন।

মিসেস দত্ত চাহিলেন ফুল্লরার পানে; চাহিয়া বলিলেন,—ফুল্লরার একখানি ফটো তাঁদের সামনে ধরে দিয়ে বলো—এই দেখুন, আমাদের সেক্রেটারি শ্রীমতী ফুল্লরা চাটার্জ্জী—ইউনিভার্সিটির একটি রত্ন! এঁর রূপ-লাবণ্যের কম্‌তি কোন্‌খানটায়, বলুন তো?

লজ্জায় ফুল্লরার কপোল আরক্তিম হইল। মিস্ আচার্য্য কহিলেন—বোধ হয় আমায় দেখে তাঁরা এ কথা বলেচেন। কিন্তু আমার এমন মূর্ত্তি হবার কারণ, মা-বাপের অবস্থা ভালো ছিল না, একটি ভাই—রোগে লেখাপড়া হলো না! সংসারের সমস্ত ভার আমাকে নিতে হবে বুঝে প্রাণপাত-সাধনায় শুধু পরীক্ষা-চর্চ্চা করেছি। ভালো খাবো, তার সংস্থান ছিল না। তার ফলে যে-বয়সে শরীর গড়ে ওঠে, সে বয়সটায় শরীরের পানে মোটে লক্ষ্য রাখতে পারিনি। তা বলে' মাথার ব্যামো আমার হয় নি অবশ্য!

ফুল্লরা কহিল—তাঁরা যা বলেচেন, ভেবে দেখবার মতন কথা! কেন না, চোখ মেলে চাইলেই তো দেখি, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েচে! একে তো সংসারের দিক থেকে মেয়েদের বড় সহজ ভার বইতে হয় না; স্বাস্থ্য ভাঙ্গবার কারণও ঘটে অনেক! আমার মনে হয়, লেখাপড়ার দিকে যতখানি লক্ষ্য আমরা রাখবো, তাদের দেহ-মন যাতে বেশ শক্ত আর মজবুৎ হয়, সেদিক পানেও লক্ষ্য রাখতে ক্রুটি করবো না। দেহ-মন শক্ত করার প্রয়োজন খুব আছে। সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছে—আমি সে ঘটনার কথা জানি—যার জন্য এদিকটায় মনোযোগী হওয়া খুব বেশী প্রয়োজন বলে' আমি মনে করি।

ছবির কথা ফুল্লরার মনে সারাক্ষণ জাগিয়া আছে।

মিসেস দত্ত কহিলেন,—তাহলে স্বাস্থ্যের দিকে আমাদের নজর থাকবে সব চেয়ে বেশী!—তাছাড়া সে দিন মিষ্টার চাটার্জী যে কথা বললেন, সে কথাও ভেবে দেখেছি। এটা ঠিক, শত চেষ্টাতেও আমাদের দেশের মেয়েরা সেই পাঁচিলের গণ্ডীর মধ্যে ফিরে যেতে চাইবেন না। ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সেকালে-একালে নানা দিক দিয়ে এত পার্থক্য

ঘটে গেছে যে, সে পুরোনো গণ্ডীতে ফেরা অসম্ভব। সেকালে বেশীর ভাগ সংসার একান্নবর্ত্তী—ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা দেখা, কাজ-কর্ম্ম—সকল ব্যাপারে পাঁচ জনের সাহায্য মিলতো। এখন হয়েছে একের সংসার। দায় বেড়েছে—আয় অল্প। সে-কালে যে-খরচে সংসার বলো, লোক-লৌকিকতা বলো, এ সবের সংস্থান হতো, এখন সে খরচে তা হবার নয়। সেকালে বন্ধ-গাড়ীতে না চড়ে মেয়েদের এ পাড়ায় ও পাড়ায় বেরুনো সম্ভব ছিল না। এ কালে সে গাড়ী-ভাড়া দেবার সামর্থ্য নেই—মেয়েদের বাধ্য হয়ে পথে-ঘাটে বেরুতে হচ্ছে। কাজে কাজেই সে কালের সেই প্রকাণ্ড ঘোমটা আর লজ্জায় জড়োসড়ো ভাব—কেউ মাড়িয়ে গেলেও মুখে কথা নেই—তা চলতে পারে না। এ সব দিকে নজর রেখে মেয়েদের মানুষ করতে হবে। কাজেই এ যুগের কথা স্মরণ করেই আমাদের চলা উচিত। তুমি কি বলো ফুল্লরা?

ফুল্লরা কহিল—তাই উচিত বলে মনে হয়। তবে সেই সঙ্গে আর একটা নতুন কথা সমস্যার মত আমার মনে জাগচে।

—কি কথা?

ফুল্লরা কহিল—সে কথাটা সম্প্র মনে জেগেছে। খুলে বলি। মানে, অনেকে বলেন, ইংরেজের ঘরে মেয়েদের মত আমরাও পয়সা রোজগার করতে যত্র-তত্র চাকরি নেবো, এবং তার ফলে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে এক-পা হঠবো না! মুখের কথায় এ ব্যাপার যত সহজ মনে হয়, আসলে এ কাজ সত্যই তেমন সহজ ভাবেন?

মিস্ আচার্য্য কহিলেন—এ আপনার মনের সংস্কার! মিথ্যা আতঙ্ক, মিসেস্ চাটার্জী! বুঝেচি, আপনি কিসের আশঙ্কা করচেন! পুরুষ-মানুষের সামনেও নানা ফন্দী, নানা প্রলোভন সংসারে রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ সে-সবের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে বুদ্ধি হারিয়ে নিজের অনিষ্ট

করচেন। কিন্তু বেশীর ভাগ পুরুষ সে সব ফন্দী ফাঁশিয়ে প্রলোভন জয় করে জীবনের পথে এগিয়ে চলেছেন তো! পুরোনো কথাই ধরুন—এ দেশে প্রথম যখন ইংরেজি শিক্ষা সুরু হলো, সে শিক্ষার ফলে কত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজেদের ধর্ম্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন—মদ খেতে লাগিলেন নিতান্ত নির্লজ্জের মত। সে ভাব তো ক্রমে কাটলো। সকলে বুঝলেন, মদ খাওয়ার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার বা কালচারের কোনো সংশ্রব নেই! তেমনি এদেশের মেয়েরাও আজ রোজগারের ক্ষেত্রে প্রথম নামলে যে সব বিপত্তি বা বিঘ্ন দেখবেন—শিক্ষার জোরে সে সব বিঘ্ন-বিপত্তি অনেকে কাটিয়ে যেতে পারবেন, নিশ্চয়। দু'চার জন অবশ্য বুদ্ধির দোষে নষ্ট হতে পারেন—কিন্তু সে দু'চার জনের কথা ভেবে সাধারণের পক্ষে এ-পথ বন্ধ রাখা চলে না।

ফুল্লরা কহিল,—কি জানি, বিশেষভাবে কখনো এ সব কথা ভাবিনি! যে কথা সাধারণভাবে সদ্য মনে জাগচে, সেটুকু প্রকাশ করে বললুম!

মিসেস দত্ত বলিলেন—এখন ভবিষ্যতের কথা অতখানি না ভাবলেও বোধ হয় চলবে, ফুল্লরা। তবে এটুকু আমরা স্থির করেচি—লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের দেহ-মনের স্বাস্থ্য যাতে জোরালো হয়, মজবুৎ হয়, সেদিকে আমাদের এতটুকু ঔদাস্য থাকে না।

তার পর তিনি ক্ষণেক স্তব্ধ রহিলেন; স্তব্ধ থাকিবার পর বলিলেন,—আমাদের এ-স্কুলে একজন মেয়ে-টীচার আসচেন। তাঁকে আমি খুব ভালো রকম জানি। তাঁর কাহিনী আপনাদের বলবো। শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে ভাববেন, বুঝি-বা এ গল্প-কথা! এমনো না কি হয়!

সকলে কুতুহলী দৃষ্টিতে মিসেস দত্তর পানে চাহিলেন। মিসেস দত্ত বলিলেন,—আমাদের সঙ্গে তাঁর একটু সম্পর্ক আছে—দূর-সম্পর্ক হলেও অস্বীকার করবার মত নয়। এই মেয়েটির বয়স এখন হবে প্রায় সাতাশ

বছর। বাড়ী পাড়া-গাঁয়ে। বাপ সামান্য কাজ-কর্ম্ম করতেন। পাড়া-গাঁ অঞ্চলে জায়গা-জমি ছিল—সেকাল হলে তাতেই চলে যেতে পারতো! কিন্তু একালে সে আয়ে অতি-কষ্টে দিন কাটে। এ-মেয়েটি বড়। মেয়েটির বিবাহ হয় তেরো বৎসর বয়সে। স্বামীর বাড়ী পাড়া-গাঁয়ে। জমি-জমা ছিল; তাতেই সংসার চলতো। লেখাপড়া ভালো শেখেনি; পাড়া-গাঁয়ে মাছ ধরে তাস-পাশা খেলে দিন কাটাতো। এবং লেখাপড়া না শিখে কুড়ে হয়ে থাকলে যা হয়, শেষে তার সে দোষ ঘটে। মদ খাওয়া ধরে। মদের নেশায় সর্ব্বস্ব যেতে বসে—স্ত্রীর দু'চারখানা গহনা যা ছিল, তা' গেল। শেষে পয়সা না পেয়ে স্ত্রীকে প্রহার স্থরু করলো। এ প্রহার ক্রমে এমন অভদ্র ইতর অত্যাচারে দাঁড়ালো যে স্ত্রী-বেচারী প্রাণের আর মানের দায়ে বাপের বাড়ী চলে আসে। কিন্তু বাপের সংসারে বাপ তখন অথর্ব্ব—ভাই আর ভাইয়ের স্ত্রী মালিক। কাজেই সে-বাড়ী তার পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় হলো না। মেয়েটি সামান্য লেখাপড়া শিখেছিল—মরিয়া হয়ে নিজের দু-চারখানা গহনা যা বাকী ছিল, তা সম্বল করে চলে এলো কল্‌কাতায়। গহনা বেচে সেই টাকায় একটি মেয়ে-স্কুলের বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া স্থরু করলে—এবং লেখাপড়া বেশ ভালো রকম শিখেছিল। এ স্কুলে দু'বছর পড়বার পর অর্থাভাব জানায় আমার স্বামীর কাছে এসে। তিনি তার উৎসাহ দেখে, শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মেয়েটির লেখা-পড়ার ভার নিলেন। মেয়েটি ম্যাট্রিক পাশ করেছে—অসাধারণ বুদ্ধি, আশ্চর্য্য নম্রতা—আর সব-চেয়ে আশ্চর্য্য তার মনের জোর! লেখাপড়ার খরচ ছাড়া কোনো জিনিষ কিনে দিতে চাইলে, মেয়েটি মিনতি-ভরে নিষেধ জানায়—বলে, না, যতটুকু আমার প্রয়োজন, ততটুকু সাহায্য করুন; স্থখভোগ বা বিলাস আমি চাই না। আমি শুধু বাঁচতে চাই—মানুষের মত বাঁচতে চাই···এই মেয়েটিকে আমাদের স্কুলে নিতে চাই।

ফুল্লরা তাকে দেখবে অবশ্য। এবং আমার বিশ্বাস, তার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে সে এখানে আসচে—সুপারিশের ভরসায় নয়!

মুগ্ধ বিস্ময়ে ফুল্লরা কহিল—চমৎকার তো! এ-কালে মেয়েদের মনে এই যে আত্ম-সম্মান-বোধ জাগচে, এটা প্রাণের লক্ষণ!

মিস্ আচার্য্য কহিলেন—এ মেয়েটিকে নেহাৎ সৃষ্টিছাড়া বলতে হবে। না হলে এ-অবস্থায় বড় লোক আত্মীয়ের বাড়ী বিনা-পয়সায় দাসীপনা বা রাঁধুনী-বৃত্তি করা ছাড়া এ সব ভাগ্যহীনার পক্ষে অন্নবস্ত্র সংস্থানের অন্য আর কি উপায় আছে বলুন তো? এ ভাবে অন্ন-বস্ত্রের কাঙাল হয়ে পড়ে থাকতে গিয়ে কত মেয়েকে কতখানি অপমান আর লাঞ্ছনা নীরবে সইতে হয়েচে—নিজের লজ্জা, নারীত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে···এমন কাহিনী দু'চারটে আমি জানি।

ফুল্লরা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মিসেস দত্তর পানে চাহিল; চাহিয়া বলিল—এ মেয়েটিকে কবে দেখবো, বলুন তো?

মৃদু হাস্যে মিসেস দত্ত বলিলেন—দেখতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে?

ফুল্লরা কহিল—হচ্ছে বৈ কি! আমি তাকে শ্রদ্ধা করবো। মেয়েটির নাম?

মিসেস দত্ত বলিলেন,—সত্যবতী।

দশম পরিচ্ছেদ

নূতন হাওয়া

সে দিন সন্ধ্যায় কোর্ট হইতে ফিরিয়া সুশীল চাটার্জী সোজা একেবারে ফুল্লরার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ফুল্লরা তখন স্কুলের কতকগুলা কি কাগজপত্র লইয়া তন্ময়।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—একটা নতুন খপর আছে।

ফুল্লরা সবিস্ময়ে স্বামীর পানে চাহিল। সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—কি খপর হতে পারে, বলো দিকিন্?

স্বামীর মুখে হাসির রেখা! ফুল্লরা ঠিক বুঝিতে পারিল না।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—তুমি তার আইডিয়া করতে পারবে না! এ খপর একেবারে স্বপ্নাতীত! মানে, মিষ্টার নিশানাথ চৌধুরী তোমার বড়দা তো?

মাথা নাড়িয়া ফুল্লরা জানাইল, হাঁ।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—তিনি আজ কোর্টে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেচেন—লাঞ্চ-টাইমে। সময় ঠিক করে যান, কোর্টের পর আমার চেম্বারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এবং কথামত এসেছিলেন।

ফুল্লরা কহিল,—ভালো আছে সকলে?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুশীল চাটার্জী কহিলেন—না, ভালো ঠিক নয়। একটু বিপদ ঘটেচে। শীলোনে চাকরি করছিলেন...স্ত্রীর সঙ্গে ইদানিং অবনিবনা চলেছিল—বেশী রকম। মানে, কতকগুলো কুৎসিত

ইঙ্গিত করলেন। তা যাই হোক, স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্শ হয়ে গেছে। একটি মেয়ে আছে। মেয়েটি ডাগর—ষোল সতেরো বৎসর বয়স। সেই মেয়েটিকে এখানে এক স্কুলের বোর্ডিংয়ে উনি রাখতে এসেচেন। স্কুল থেকে চেয়েছে কোনো আত্মীয়ের নাম—যে-আত্মীয়কে প্রয়োজন হলে মেয়েটির ক্যালকাটা-গার্জ্জেন হিসাবে তারা মানতে পারবে। তাই তিনি আমার অনুমতি চান্...আমি নাম দিতে রাজী আছি কি না?

রুদ্ধশ্বাসে ফুল্লরা এ কথা শুনিল; পরে বলিল,—তুমি অনুমতি দেছ?

ফুল্লরার স্বরে অনেকখানি দ্বিধা ও সংশয়।

সুশীল চাটার্জী তাহা লক্ষ্য করিলেন; করিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন—দিতেই হবে। সম্পর্ক যে অতি সুমধুর! তবে আমি তাঁকে বলেছি এখানে আসতে। আগে তাঁর ভগ্নী তাঁকে আমার সম্বন্ধী বলে চিনিয়ে দিন—আমি তো তাঁকে চিনি না...শেষে অসতর্ক হয়ে আর কারো সম্বন্ধীর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে যদি ফল্‌স্ ডিক্লারেশন করে বসি...

ফুল্লরা কোনো কথা বলিল না; স্থির অবিচল দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। চকিতে মনের সামনে জাগিয়া উঠিল...বহু বৎসর পূর্ব্বে গৃহে সেই নাটকের দৃশ্য! ছেলের হাত ধরিয়া মা সাধিতেছেন,—হ্যাঁরে নিশা, মেয়ে কি আর এ বাঙলা দেশে পেলিনে বাবা? বড়দা সে-কথায় জবাব দিয়াছিল,—এর পাশে তারা?...চেয়ে দেখবার মত নয়। জানো...

সদর্পে নিশানাথ তখন নির্লজ্জের ভঙ্গীতে এই স্ত্রীর নানা গুণের পল্লবিত বিবরণ দিতে বসে। রাগে ফুল্লরা সে ঘর ছাড়িয়া একেবারে ছাদে চলিয়া যায়...এ সব কথা যাহাতে কাণে না ঢোকে!

বাঙলা দেশের সমস্ত কুমারী-মেয়ে ছাড়িয়া যে-মেয়েটিকে বড়দা দেখিয়াছিল সবার সেরা...

মতান্তর ?...মতান্তর ঘটে, মানি। তা বলিয়া সে মতান্তর আর মনান্তর এত বড় হইবে, যার জন্ম স্বামী বলিলেন, কুৎসিত ইঙ্গিত...

ফুল্লরার দেহ-মন ঘৃণায় একেবারে রী-রী করিয়া উঠিল।

ফুল্লরাকে নিরুত্তর দেখিয়া সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—চুপ করে রইলে যে! সম্বন্ধীর সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করতে বলো?

ফুল্লরা কহিল—আমি···

তার কথা বাধিয়া গেল। সে কি বলিবে? কোন্ কথা?

সুশীল চাটার্জ্জী হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন,—তোমার সম্বন্ধ নিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। তাই এ সম্বন্ধে তোমার মতে আমার মত!

ফুল্লরা কহিল,—এতে তোমার কোনো অসম্ভ্রম হবে না?

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্শ হয়েছে বলে···? না, না···আমি সে ডিভোর্শের ব্যাপারে কো-রেশপণ্ডেণ্ট নই—কেউ নই···কেন হবে অসম্ভ্রম? তা নয়! তবে এ জন্ম মেয়েটির বোডিংয়ে থাকায় পাছে বিঘ্ন ঘটে? বেচারী মেয়েটা! বোধ হয়, মায়ের সঙ্গে বাপের এই ডিভোর্শ হয়েছে বলে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ এখানকার কোনো আত্মীয়ের নাম চায়। মানে, ডিভোর্শের প্রথা ও-সমাজে চলিত থাকিলেও ব্যাপারটাকে ভদ্র শিক্ষিত সমাজ ঘৃণার চোখে ত্থাখে কি না!···তা বেশ, এ সম্বন্ধে তুমি চিন্তা করো। তোমার বড়দা এখানে আসচেন। রাত্রে তাঁকে এইখানেই আজ ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছি। গৃহিণীর সম্মতি না নিয়ে গৃহে নিমন্ত্রণ করার যে অপরাধ, আশা করি, অতিথির সঙ্গে আমার সুমধুর সম্পর্ক স্মরণ করে' তুমি তা মার্জ্জনা করবে। ···হ্যাঁ, দু'চারটে বিশেষ খানার ফরমাশ করো বরং।

ফুল্লরা কহিল—করবো।

একটা মৃদু নিশ্বাস··· ফুল্লরা সে নিশ্বাস রোধ করিতে পারিল না।

সুশীল চাটার্জী তাহা লক্ষ্য করিলেন। লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বড়দার সঙ্গে কতকাল তোমার দেখা নেই ?

ফুল্লরা কহিল—অনেক বছর আগে দেখা। বিয়ে করে' বড়দা আর আমাদের বাড়ী মাড়ায় নি।…চেহারা কেমন দেখলে ? আর কোনো কথাহলো ?

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—চেহারা শুক্‌নো রকম ! ওই একটি মেয়ে। বললেন,—চা-বাগানের কাজে ঘুরে বেড়াতে হয়। মেয়েটা একা কার কাছে থাকবে ? বিয়ে-থা দিতে হবে। উপযুক্ত পাত্র সেখানে মিলবে কি ? ভালো বর মিললে যদি এ ডিভোর্সের কথা শুনে ভড়কে যায় ! বাঙালী-খৃষ্টান-সমাজ এই ডিভোর্স ব্যাপারকে ভয়ঙ্কর ভয় করে, ঘৃণা করে—আমদের দেশের একঘরে হওয়ার মত প্রায় !

সুশীল চাটার্জী চলিয়া গেলেন। ফুল্লরা স্কুলের কাগজপত্র রাখিয়া দিল। মনের সহজ সুরে সহসা বিপর্যয় আঘাত লাগিয়াছে !

বড়দা ! দুজনের বয়সে অনেক তফাৎ ! ছেলে-বেলার কথা যতদূর মনে পড়ে, ছোট বোন বলিয়া বড়দা যে বিশেষ স্নেহ-প্রীতি…

মনে পড়ে না। ছোটদা পীড়ন করিত, ছোটদার সঙ্গে সে পীড়নের মধ্য দিয়া পরিচয় ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ রকম ! বয়সের অনেকখানি অন্তরালে বড়দাকে শুধু দেখিত, সাজ-পোষাক করিতেছে—গম্ভীর মুখে বাহিরে চলিয়াছে—মার সঙ্গে দুটা বকাবকি ! মা কিছু বলিতেছেন, বড়দা সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না ! বড়দার হাঁকডাক তেমন শুনা যাইত না। পীড়ন যেমন করে নাই, স্নেহ-ভরে কাছেও তেমনি কখনো ডাকে নাই ! এক গৃহে বাস—এইটুকু যা মেলামেশা আর জানাশুনা !

এতদিন দেখাশুনা করে নাই—একটা খবর লয় নাই। তাহাকে

কোনো পক্ষে কোথাও বাধে নাই! আজ সেই বড়দা কাছে আসিতেছে! এ-আসায় আনন্দ···

আনন্দ হইত, যদি আসার মূলে এই অপ্রিয় কারণটুকু না থাকিত!

ডিভোর্শ! সেই ডিভোর্শ নিজের গৃহে! মায়ের পেটের ভাই ···স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক কাটিয়া বাতিল করিয়া প্রাণের সব পরিচয় মুছিয়া দিয়াছে!

রাত্রি আটটা বাজিয়াছে। ফুল্লরা মনে চাঞ্চল্য প্রতি নিমেষে প্রবাহিত হইয়া উঠিতেছে। বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল,—চৌধুরী-সাব...

নিশ্চয় বড়দা!

বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। এতক্ষণ ধরিয়া যে-মুহূর্ত্তের কথা ভাবিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিল, সেই মুহূর্ত্ত আসিয়া উদয় হইয়াছে!

কোনোমতে ফুল্লরা কহিল—কোথায় বসেচেন?

বেয়ারা জানাইল, বসিবার কামরায়। সাহেব সেইখানে বসাইতে বলিয়াছেন।

ফুল্লরা বলিল—আমি আসচি। তুই যা।

ফুল্লরা আসিল বড়দার কাছে...যে-বড়দার সম্বন্ধে একটি কথা ছাড়া আর কোনো পরিচয় তার জানা নাই! যেন নামটুকু-মাত্র-জানা অতিথি! সে অতিথিকে গ্রহণ করিয়া লইতে মন আপনা হইতে সমুৎসুক!

ফুল্লরা প্রণাম করিল; করিয়া বলিল—ভালো আছো বড়দা?

নিশানাথ শুষ্ক হাসি হাসিল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ভালো থাকবার কথা নয়, ফুলু-ভাই! তুমি জানো না, তখন তুমি ছোট, তোমাদের ছেঁটে ফেলে আমি চলে আসি। সে অনেক কথা, ভাই! সে কথা তুলে লাভ নেই। তোমার নয়, আমারো নয়! দায়ে পড়ে

এখানে আসতে হয়েচে এত কাল পরে। অফিসের কাজে আসতে হলো, সেই সঙ্গে রোজাকে নিয়ে এলুম। শুনেচো তো চাটার্জ্জী সাহেবের মুখে রোজার কথা?

ম্লান দৃষ্টিতে নিশানাথের পানে চাহিয়া ফুল্লরা কহিল—রোজাকে এনেচো এ-বাড়ীতে?

নিশানাথ কহিল—না। সে এখন কক্স হোটেলে আছে। সেইখানেই এসে উঠেছি কি না। রোজাকে এখানে এক স্কুলের বোর্ডিংয়ে রেখে যাচ্ছি। শিলোনের বাতাসের ছোঁয়াচ্ না লাগে! তিনি সেইখানেই আছেন—আবার বিবাহ করচেন...এক জন গোয়ানীজ মার্চ্চেণ্টকে।

ফুল্লরা কোনো কথা বলিল না। এ যেন তার সামনে বিলাতী ফিল্মের কদর্য্য ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছে! বুড়া বয়সে বিবাহ-বাঁধন কাটিয়া সংসারকে বিভীষিকা দেখানো! বাড়ীতে এত-বড় ডাগর মেয়ে...

সে শিহরিয়া উঠিল। ছি!

নিশানাথ বলিল,—চাকরি নিয়ে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। বছরে অমন সাত-আট মাস···কারো কাছে মেয়েকে বিশ্বাস করে রাখতে পারি না। সেখানেও বোর্ডিং ছিল...কিন্তু কি মনে হয়, জানো? যদি মরে যাই···মেয়েটার কোনো আপন-জন কাছে থাকবে না।—ভবিষ্যতে কি দুর্দ্দশা না ঘটতে পারে! এখানে একটা সান্ত্বনা থাকবে এই যে, ধর্ম্ম আমার যাই হোক,—আমার মেয়ে, এ কথা মনে করেও তোমরা এটুকু দেখবে ও বয়ে না যায়···ওর বাপের নামটুকু যেন ধূলোয় না লুটিয়ে যায়!

কথাগুলা ফুল্লরার কাণে ভারী অদ্ভুত শুনাইতেছিল! এমন কথা ভাই আসিয়া সরল বাঙলায় ছোট বোনের কাছে কোনো সংসারে বলিতে পারে! এ যেন কোনো বিলাতী বাজে নভেলের তর্জ্জমা শুনিতেছে!

ফুল্লরা বলিল—ছোটদার সঙ্গে দেখা হয়?

নিশানাথ বলিল—না। সেই যে শীলোন যাত্রা করি, তারপর থেকে কারো সঙ্গে দেখা নেই! কে আছে, কে নেই, তাও জানি না। বেঁচে আছেন তো সকলে?

ফুল্লরা কহিল,—মা নেই। বাবা আছেন মাণ্ডালেতে—দিদির ওখানে।

—ঊষা?

ফুল্লরা কহিল—শুনেছিলুম, জাপান গেছে। সে আজ তিন-চার বৎসরের কথা। ফিরেছে কি না, জানি না। বোন বলে কখনো উদ্দেশ নেয় না!

নিশানাথ মৃদু হাসিল, হাসিয়া বলিল—এ কথা বলতে পারো। ভাইয়েরা চিরদিন বর্ব্বর হয়। তা হলেও বইটই পড়ে যা বুঝি, বোন্ কখনো ভাইকে ত্যাগ করতে পারে না—করে না! সেই ভরসায় এসেছি ফুলু ভাই.... চাটার্জী সাহেবকে একটু উপকার করতে হবে...মানে, রোজার সঙ্গে সম্পর্কটুকু মাত্র স্বীকার করা—না হলে ও-বেচারী বোর্ডিংয়ে থাকতে পাবে না।

ফুল্লরা কহিল—কেন ব্যস্ত হচ্ছ বড়দা? কাল সকালে রোজাকে তুমি এখানে নিয়ে এসো। ছোট বোন বলে' যখন মনে পড়েচে, তখন ছোট বোনের মাথা গোঁজবার ঠাঁই থাকতে হোটেলে রাখবে মেয়েকে! আমাদের সম্পর্ক বুঝি স্বীকার করতে চাও না তোমাদের এই নূতন খৃষ্টান সমাজে?

নিশানাথ হাসিল; হাসিয়া বলিল,—ঠিক বলেচো ফুলু। কোনোদিন তোমাদের খপর নিইনি সত্যি—নেবার মুখ ছিল না, তাই। তা বেশ, আর অনুরোধ করতে হবে না। রোজাকে তোমার কাছেই রাখবো। কালই রোজাকে আমি এখানে নিয়ে আসবো।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বন্দ্ব

রোজা আসিল এবং ফুল্লরার কাছে সে রহিয়া গেল। নিজেদের স্কুলে তাকে ভর্ত্তি করা গেল না,—সে ভর্ত্তি হইল সিসিল হোমে। নিশানাথেরও এমনি ইচ্ছা ছিল।

ডাগর মেয়ে! এ গৃহের সঙ্গে পুরাপুরি মিশ খাইল, এমন কথা বলা চলে না। বাঙলা জানে না,—চাল-চলন ঠিক বাঙালীর মতো নয়। ফুল্লরা এ-দিকটায় তাকে ব্রেক্ করিতে লাগিল।

দিন পনেরো পরে নিশানাথ শীলোনে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় রোজা বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল। ফুল্লরা আসিয়া কহিল,—কি পড়চো?

—একটা গল্পের বই।

—রামগোপাল বাবু আসেননি, বুঝি?

রামগোপাল বাবু টিউটর। এ পাড়ায় টুইশনি করিয়া তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইংরেজিটা জানেন ভালো। উচ্চারণ বেশ দুরস্ত। প্রবীণ বয়স। কাজেই এ পাড়ায় টিউটর খুঁজিতে গেলে লোকে তাঁহার সন্ধান করে। রোজার জন্ম তাঁহাকে বাহাল করা হইয়াছে।

ফুল্লরার প্রশ্নে রোজা কহিল,—তিনি আসেননি।

ফুল্লরা কহিল,—তিনি আসেন নি বলে তুমি বাজে বই পড়তে বসলে! কাল ক্লাশ আছে?

কথাটা বলিতে বলিতে ফুল্লরা অগ্রসর হইয়া দেখিল, কি বই।

বইখানার নাম দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। পারি-সহরের নৈশ-লীলার বিচিত্র-কাহিনী।

ফুল্লরা কহিল,—এ বই তোমাদের পড়া উচিত নয়, রোজা। শুধু তোমাদের কেন—কোন মহিলারই এ-বই পড়া উচিত নয়।

রোজা বিস্মিত হইল, কহিল,—আমাদের বাড়ীতে মায়ের যে লাইব্রেরী ছিল, সেখানে এ বই ছিল—ক'পাতা আমি পড়েছিলুম, শেষটুকু পড়া হয়নি। গল্পে বেশ একটা লাইফ্ আছে, থ্রিল্ আছে।

ফুল্লরা কহিল—এ বই কোথান থেকে এনেছ?

—না। ক্লাশে একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে—লিলিয়ান কক্স...সে এ-বইখানার কথা বলছিল,—তাই বলেছিলুম, ও-বইটা আমার একটু দেখা আছে,—পড়তে চাই। সে এনেছিল।

ফুল্লরা ক্ষণেক স্তব্ধভাবে কি চিন্তা করিল, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—ও বই তুমি পড়বে না, রোজা। ভদ্র সমাজের যোগ্য বই নয়। দাও আমার হাতে। কাল ক্লাশে গিয়ে যার কাছ থেকে এ বই এনেছ, তাকে ফেরৎ দিয়ো।

কথাটা বলিয়া বই লইবার জন্ত ফুল্লরা হাত বাড়াইল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রোজা বলিল—কিন্তু ভয়ঙ্কর চমৎকার বই, পিশিমা।

—তা হোক্! বই দাও।

এ কথায় যে-দৃষ্টিতে সে ফুল্লরার পানে চাহিল, তাহাতে বিরক্তির স্ফুলিঙ্গ!

বই দিতে হইল। বই দিয়া রোজা নিঃশব্দে সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

বই লইয়া ফুল্লরা সেটা টেব্‌লের ড্রয়ারে রাখিয়া দিল, দিয়া রোজার সন্ধানে বাহির হইল।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ফুল্লরা আবার বলিল,—এসো…বাজনা তোমাকে শিখতেই হবে।

রোজার কি মনে হইল, সে একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া বলিল,—চলো…

আর এক দিনের কথা।

স্কুল হইতে ফিরিয়া রোজা ডাকিল,—পিশিমা…

ফুল্লরা সবেমাত্র স্কুল হইতে ফিরিয়াছে…মুখ-হাত ধুইতে যাইবে…রোজার আহ্বানে কহিল,—কি বলচো রোজা ?

রোজা কহিল,—আমার বন্ধু সেই লিলিয়ানের আজ বার্থ-ডে…সন্ধ্যার সময় তার বাড়ীতে সেজন্য একটু পার্টির আয়োজন করেছে। আমায় যেতে বলেছে অনেক করে'। যাবো ?

ফুল্লরা কহিল,—ক্লাশের আর-কোনো মেয়ে যাবে ?

—যাবে। প্রীতি মজুমদার, সাহানা গুপ্ত, লোটি, কমলা, জেন্, মিলি, লিডিয়া, মিলড্রেড…

ফুল্লরা কহিল,—বেশ, যেতে পারো…কিন্তু ফিরতে যেন রাত না হয়।

উদাস-ভরে রোজা কহিল,—না।

ফুল্লরা কহিল,—ড্রাইভারকে বলে রাখো। আর যাবার সময় কিছু ফুল কিনে নিয়ে যেয়ো। লিলিয়ানরা কোথায় থাকে ?

—প্যাট্রিক লেনে। নাম্বার নিল্ল। ফ্ল্যাট-বাড়ী, দোতলায়। সে বাড়ী আমি দেখেছি। আজই লিলিয়ানকে পৌঁছে দিয়ে আমি আসছি। সে বললে কি না—বাসে বাড়ী ফিরতে দেরী হবে…

—বেশ !

রোজা গেল লিলিয়ানের পার্টিতে। ফুল্লরা খুশী-মনে অনুমতি দিল, তা

নয় ; নিষেধ করিলে যদি ভাবে, তোমাদের গৃহে আশ্রয় দিয়াছ বলিয়া একেবারে বাঁদী বানাইয়া তুলিবে...

রাত্রি ন'টা বাজে। রোজার এখনো দেখা নাই। ফুল্লরার কেমন অস্বস্তি ধরিল। ক্লাশের মেয়েদের লইয়া পার্টি—এত রাত্রি পর্য্যন্ত তাদের আটকাইয়া রাখা—অন্যায়! পরক্ষণে নিজের মনকে শাসাইল। চিরদিন যে-মতকে মানিয়া আসিয়াছে, সে-মত আজ কোথায় রহিল? পরের বেলায় বিচার-বুদ্ধি জাগ্রত থাকে। আর এখন নিজের স্বার্থে—স্বার্থ নয়, অহঙ্কার—আঘাত বাজিতেছে বলিয়া মনকে নূতন কথা মানিয়া নূতন মত শিরোধার্য্য করিতে হইবে!

কে জানে!...হয়তো এত বড় দায়িত্ব হাতে লইয়াছে বলিয়া মনে দ্বন্দ্ব বাধে।

এমনি চিন্তার মাঝখানে ইভা আসিয়া উপস্থিত। ফুল্লরা কহিল,—কি! জীবন-বীমা করতে হবে না কি?

ইভা কহিল—তা নয়। এ পথে যাচ্ছিলুম ঐ মান্দ্রাজী আয়েঙ্গারের ওখানে। তাকে অনেক করে বাগিয়েছি। তার স্ত্রী একটা ইন্‌শিওর করবে। আয়েঙ্গারের স্ত্রীকে নেমন্তন্ন করেছি বায়োস্কোপে নিয়ে যাবো বলে'—গাড়ীটি বেগড়ালো ঠিক তোমার ফটকের সামনে। টিউব পাংচার। তাই গাড়ীতে না বসে থেকে...

হাসিয়া ফুল্লরা কহিল—পদধূলি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করতে আসা।

ইভা কহিল,—তা ঠিক নয়। কাজ আছে। মনে হলো, মিষ্টার চাটার্জীর সঙ্গে দেখা করে তোর লাইফের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করে যাই।

ফুল্লরা কহিল—আমার লাইফ নিয়ে কারবার চলে না, ইভা।

ইভা কহিল—তোর সঙ্গে সে-আলোচনার দরকার নেই। যিনি তোর লাইফের মালিক, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি এবং

তাঁকে আমি বুঝিয়ে দিতে পারবো। সে আশা আমার মনে বিলক্ষণ আছে।

ফুল্লরা কহিল—কিন্তু জানিস তো কৌশুলীর সঙ্গে কনশাল্ট করতে হলে তার ফী লাগে।

—দেবো সে ফী।···ভয় নেই ফুল্লরা, এ মুখে হাসি আর মধু বাণী যা আছে, তাতে কৌশুলী সাহেব খুশী হয়ে যাবেন'খন।

ফুল্লরা কহিল—ব্যবসা করচিস বটে, ভালো!

ইভা কহিল—না, সত্যি, ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না? জানি, ওঁর প্রতি মিনিট প্রচুর মোহর বর্ষণ করে। তবু···একটা চান্স···

ফুল্লরা কহিল—এখনি খেতে আসবেন। সময় হয়েছে।

একটু পরে সুশীল চাটার্জী আসিলেন। আলাপ-পরিচয় করিতে বিলম্ব ঘটিল না। বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, মেম সাহেবের গাড়ী তৈয়ার হইয়া গিয়াছে।

ইভা কহিল—যাচ্ছি। একটা কথা ছিল মিষ্টার চাটার্জী। ফুল্লরাকে বলছি, একটা ইন্‌শিওর করতে।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—Against? Loss of husband?

ইভা কহিল—সে বস্তু এখনো চলেনি। ডিভোর্স ট্রা আপনারা দিন্ না চালিয়ে আইন করে'—আমাদের ইনশিওরেন্স-ওয়ার্ক নিমেষে ফেঁপে উঠবে'খন!

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—বেকার-সমস্যা যে রকম জেগেছে—হয়তো আপনাদের এ আশা এবার পূর্ণ হবে। যার যা মতি—কত রকম আইন-কানুনের প্রস্তাবই না শোনা যাচ্ছে। কবে শুনবো, বিপত্নীকদের বিবাহ-সম্বন্ধে আইন হবে,—বিধবা ছাড়া কুমারীদের বিবাহ করতে তাঁরা পারবেন না; করলে সে বিবাহ হবে আইনের জোরে

অসিদ্ধ। সত্যি, সমাজের যে কি গতি হবে, বুঝি না। বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম হলে লোকজন খাওয়ানোয় নিমন্ত্রণ করা—এগুলোর জন্যও হয়তো কৌন্সিলে কোনো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মহাত্মা খশড়া পেশ করবেন'খন। মোদ্দা রোজাকে দেখচি না যে! সে খেয়েচে?

ফুল্লরা কহিল,—না। সে গেছে পার্টিতে। নেমন্তন্ন। তার ক্লাশের একটি মেয়ের আজ বার্থডে। সে জন্য পার্টি আছে।

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—মেয়েদের বার্থডে-পার্টি! এত রাত্রে!

ফুল্লরা কহিল—গেছে সে স্কুল থেকে এসে। ঐ নটা বাজছে। এখনো ফিরলো না। অন্যায়! দাদা কোনোদিন মেয়েটার মানুষ হবার দিকে চোখ দেয়নি।

ইভা সহসা কহিল—ঘড়িতে নটা বাজচে। তাইতো! আমার আর বসা চলে না। আজকের মত আসি মিষ্টার চাটার্জ্জী। আলাপ হলো, আর একদিন আসবো ফুল্লরার লাইফের প্রোপোজাল নিয়ে।

বলিতে বলিতে এক রকম ঝড়ের বেগে ইভা চলিয়া গেল।

ফুল্লরা কহিল—কাকেও পাঠাবো রোজার জন্যে? এত রাত হলো! কি এ!

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—কতকগুলো মেয়ে মিলে এক সঙ্গে জড়ো হয়েছে! আমোদ-আহ্লাদ হৈ-হৈ করছে!

ফুল্লরা কহিল—তা নয়। ডাগর হয়েছে, তার উপর মায়ের পিছনে যদি অত বড় ব্যাপার না থাকতো···সেই জন্যই ভয় হয়। একদিন দেখি, ক্লাশের কোন্ মেয়ের কাছ থেকে একখানা বিলিতি নভেল নিয়ে এসেছে পড়তে···বিশ্রী বই। দেখে কেড়ে নিলুম।

—বকেছিলে?

—না।...শুধু বলেছিলুম, কথা মেনে চলতে হবে। সেখানকার আচারে এখানকার আচারে তফাৎ আছে।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—একা...আমাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল না—আত্মীয়তা-সত্বেও এখনো তাই বাধঁচে। কিন্তু এ কথায় দুঃখ করো না। রোজার ভবিষ্যতের ভার তোমার দাদা দিয়ে গেছেন আমাদের হাতে।

সুশীল চাটার্জী কোনো জবাব দিলেন না; নিঃশব্দে ভোজন করিতে লাগিলেন।

আহার তখনো শেষ হয় নাই, বাহিরে পর্চ্চে গাড়ী থামিল; এবং রোজা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। হাসি-হাসি মুখ।

ফুল্লরা নিজেকে যতখানি সম্ভব সতর্ক রাখিল। রোজাকে যাহাতে আর কোন আদেশ না করিতে হয়, সে দিকে মনোযোগী রহিল।

কিন্তু না দেখার দরুণ রোজার মনে যে অবাধ-গতির বেগ জমিতেছিল, সে বেগ রোধ করিয়া চলিতে রোজা জানে না। জানিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। নিজের গৃহে যখন যা খুশী, তাই করিয়াছে, এতখানি বয়স পর্য্যন্ত...মা সর্ব্বক্ষণ আপনাকে লইয়া বিভোর থাকিত; বাপ কখনো গৃহের পানে ফি[illegible] তাকায় নাই! রোজা জানে, দুনিয়ায় নিজেকে লক্ষ্য করিয়া সকলে চলে। এমনি সে দেখিয়াছে। কাজেই এ গৃহের বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে মনটাকে সে নিজের খেয়ালে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ফুল্লরার নিষেধ-বাণী সে খেয়ালে পাথরের মত কঠিন মনে হইত—মনে তাহা বাজিত আঘাতের মতো!

সে দিন মিসেস দত্তর সঙ্গে এই ব্যাপার লইয়া কথা হইতেছিল।

মিসেস দত্ত কহিলেন,—নিজেদের জীবনে মস্ত একটা অভিজ্ঞতা লাভ হলো এই যে, আমরা যেন কেবলই ছুটচি—সংসারে এতটুকু

বিশ্রামের অবসর মিলচে না। এ কথা অনেক সময় আমার মনে হয়েছে,—স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বাস করছি, স্নেহ-ভালোবাসার অভাব নেই; তবে সংসারে মেলামেশা যা চলেছে, সে-যেন নিমন্ত্রণ-বাড়ীর অতিথি-অভ্যাগতের মতো। পরস্পরে মনে-মনে মিশে এক হয়ে যাওয়া—সেকালে আমাদের মা-দিদিমার মন যেমন হতো—এমন মেলামেশার যেন অভাব ঘটছে বলে মনে হয়!...তোমার কি মনে হয়, ফুল্লরা?

ফুল্লরা কোন জবাব দিল না। মিসেস্ দত্ত বলিলেন,—এই যে স্কুল খুলেছি...আমার মনে হয়, মেয়েরা যাতে সুশিক্ষা পায়, বিলাস আর ঐশ্বর্য্যকে জীবনে পরম কাম্য বলে মনে না করে,—সে দিকে আমরা লক্ষ্য রাখবো। মিষ্টার চাটার্জ্জীর কথা আমার বুকে অহরহ বাজচে—Eastern ideals (প্রাচ্য আদর্শ)—সে আদর্শ এযুগে পুরোপুরি ফিরে পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। তবু যতখানি পারি...উচিত নয়, ফুল্লরা?

ফুল্লরা কহিল,—সে কথা সত্য। শুধু সংসারের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকা এখন সম্ভব বলে মনে হয় না। পুরুষদের জীবনে বাহিরের যে-পৃথিবী এসে মিশেছে, তাদের জীবন-যাত্রা আর তেমন সহজ সরল নেই... আমরা তা থেকে একেবারে সরে থাকলে চলবে না! সরে থাকবার উপায় নেই! পাশ্চাত্য শিক্ষা বলে অনেকে চীৎকার তোলেন—কিন্তু এত-বড় প্রত্যক্ষ-সত্যকে পারেন আপনি অস্বীকার করতে? পাশ্চাত্য শিক্ষা তার দোষ-গুণ নিয়ে আজ আমাদের ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচে!...এই আমার ভাইঝী রোজা...আমরাও একালের ভাবে মানুষ হয়েছি...আপনার কাছে অস্বীকার করবো না—পুরুষ আর মেয়ে—দু'জাতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না, এমনি ধারণা নিয়ে আমি বেড়ে উঠেছি! মেয়ে-জাত যেন হীন, হেয়, সংসারে গলগ্রহ—এ

জিনিষটা আমি ছেলেবেলা থেকে সহ্য করতে পারিনি—তবু সহজ ভদ্র-রীতিগুলোকে চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছি। যে-সংসারে থেকে রোজা বড় হয়েছে, সে সংসারে এ সবের কোনো বালাই ছিল বলে মনে হয় না। আমি একদিন ভেবেছিলুম, মেয়েরা বিবাহ করে, তার হেতু, ভালোবাসা নয়; আসল কারণ, তার জীবিকা-উপার্জ্জনের উপায় নেই—জীবিকার জন্য তাকে নির্ভর করতে হবে পুরুষের উপর—তাই। এ জন্য আমার মনকে আমি একদিন খুব কঠিন পণে বদ্ধ করে ছিলুম যে, বিবাহ করবো না,—নিজেই নিজের জীবিকার সংস্থান করবো। কিন্তু সে পণ রইলো না। তবু পারত-পক্ষে হুঁশিয়ার হয়ে চলি, নিজের অপ্রয়োজনীয় বিলাস খেয়াল মেটাতে স্বামীর পয়সা যাতে কথনো খরচ করতে না হয়!

হাসিয়া মিসেস্ দত্ত বলিলেন,—এইখানে স্বামীর মনের সঙ্গে স্ত্রীর মন মিশতে পারচে না; ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। পার্টনারশিপের দিক দিয়ে ধরো,—দুজনে যদি মনে-প্রাণে মিশে এক হয়ে না যাও, মনের কোণে যদি বিন্দুমাত্র আড়াআড়ি ছাড়াছাড়ি ভাব থাকে, তাহলে সে ব্যবধান প্রকাণ্ড হয়ে একদিন কারবারকে নষ্ট করে দেয়! সংসারের পার্টনারশিপ কি কারবারের পার্টনারশিপের চেয়ে ছোট? না, অবহেলার জিনিষ বলে ভাবো?

কথাটা ফুল্লরার মর্মে গিয়া বিঁধিল—এক্স-রের তীব্র রশ্মির মতো! সে রশ্মিতে মনের অতল-তল অবধি চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল।

আছে! ব্যবধান আছে!···তাই সকল কাজের সাফল্যের মধ্যেও যেন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হয়!

সত্য, স্বামীর সহিত তার অন্তরঙ্গতা কতটুকু! তিনি করিয়া চলিয়াছেন তাঁর নিত্যকার কাজ···সেও এটা-ওটা লইয়া দিন কাটাই-

তেছে। দিন চলিয়া যাইতেছে...সেগুলায় ছয় ঋতুর বর্ণ-গন্ধ আসিয়া মেশে না···গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত এক বেশে, একই রূপে আসে, আসিয়া চলিয়া যায়! কোনো দিন মনে হয় নাই, এই যে ছটা ঋতুর রূপে-বেশে এতখানি বৈচিত্র্য...সে বৈচিত্র্য মনে কোনো দিন ধরা পড়িল না!

এখন ভাবে, দিন তো ইতর পশু-পক্ষীরও কাটে। মানুষও তেমনি করিয়া··· ?

বেয়ারা আসিয়া একখানা চিঠি দিল।

ছোট স্লিপ। ফুল্লরা চিঠি পড়িল। ইংরেজিতে লেখা। রোজা লিখিয়াছে,—

পিশিমা,

ক্লাশ হইতে সিনেমায় যাইতেছি। স্কুলের টীচার মিস্ পাইক সঙ্গে যাইতেছেন। সিনেমা দেখিয়া বাড়ী ফিরিব। গাড়ী ফেরত পাঠাইলাম। নিজেরা গাড়ী করিয়া ফিরিব। গাড়ী পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

রোজা

বেয়ারার পানে চাহিয়া ফুল্লরা প্রশ্ন করিল,—গাড়ী ফিরে এসেছে?

—জী! ড্রাইভার চিঠি দিয়াছে।

—আচ্ছা!···

বাহিরে বিচলিত ভাব প্রকাশ পাইল না। মনের মধ্যে ছোট-একটু ঝড় বহিয়া গেল। রোজা ফিরিলে এ ব্যাপার লইয়া কোনো কথা...

না। বলা ভালো দেখাইবে না।

মিসেস্ দত্ত কহিলেন,—কি ভাবচো? কার চিঠি?

—দাদার মেয়ে রোজা লিখেচে। স্কুল থেকে কোন্ টীচারের সঙ্গে সিনেমায় গেছে, এখন ফিতে পারবে না—তাই লিখে জানিয়েছে।

—ও!······

রোজা ফিরিল রাত্রে। ফুল্লরা কোনো কথা কহিল না, কোনো কৈফিয়ৎ চাহিল না!...

আহারাদির পর শয়ন করিতে যাইবে, ফুল্লরার কাছে আসিয়া রোজা ডাকিল,—পিশিমা...

ফুল্লরা দাঁড়াইল।

রোজা কহিল,—তুমি রাগ করেছ?

ফুল্লরা কহিল,—তা জানবার প্রয়োজন তোমার আছে?

রোজা কহিল,—তুমি রাগ করেছ!...কিন্তু 'না' বলা সহজ ছিল না। আর পাঁচ জনে যাচ্ছে...

ফুল্লরা কহিল,—বায়োস্কোপ দেখবার ইচ্ছা হলে বাড়ী থেকেও তুমি যেতে পারো।

রোজা কহিল,—সকলে যাচ্ছে। আমায় বললে...

ফুল্লরা কহিল,—তোমার ভালো-মন্দ দেখবার জন্য যখন তোমার আপনার লোক রয়েছে, এ-সব ব্যাপারে তাদের মতামত মেনে চলা উচিত নয় কি?

রোজা জবাব দিল না।

ফুল্লরা বলিল,—তোমার বাবা তোমায় এখানে রেখে গেছেন—তার কারণ, তোমায় দেখবে-শুনবে, এমন লোক এখানে আছে, তাই। যদি হষ্টেলে থাকতে, তা'হলে যা-খুশী করতে পারতে—তা হয়তো সাজতো। এখনো তুমি ছেলেমানুষ, রোজা...তাই আমাদের মত মেনে তোমার চলা উচিত। চল্‌লে তোমার মঙ্গল হবে।

রোজা কহিল,—সেখানে তো এ-সবে বারণ ছিল না। আমি যেতুম...যখন খুশী হতো।

ফুল্লরা কহিল,—সেখানে হয়তো সাজতো। এখানে...

রোজা চলিয়া গেল। কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্ত দাঁড়াইল না। ফুল্লরা ক্ষণকাল তার পানে চাহিয়া স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।...

•

দু'দিন পরের কথা। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

রামগোপাল বাবুর কাছে বসিয়া রোজা পড়াশুনা করিতেছে, ফুল্লরা নিজের ঘরে বসিয়া স্কুলের হিসাব-পত্র দেখিতেছে, বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, একটি সাহাব আসিয়াছে,—রোজা-দিদিমণির সঙ্গে দেখা করিতে চায়!

সাহাব! রোজা দিদিমণির সঙ্গে দেখা করিতে চায়!

ফুল্লরা কহিল,—কে সাহাব? কার্ড এনেছিস্?

বেয়ারা কহিল,—না।

ফুল্লরা কহিল,—কার্ড চেয়ে আন্।

বেয়ারা চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিল, তার হাতে শ্লিপ। শ্লিপে নাম লেখা, এন্ কক্স।

কক্স! কে?

ফুল্লরা কহিল,—কত বয়স?

বেয়ারা কহিল,—ছোকরা।

কে এই ছোকরা কক্স? রোজার সহিত কোথায় কবে পরিচয় হইল? শীলোনে...? ফুল্লরার ভালো লাগিল না।

পরক্ষণে মনে হইল, সকল বিষয়ে মনে কেন এ-অনুযোগ ওঠে? হয়তো বন্ধু! একদিন ফুল্লরা ছোট ছিল...তখন তো মনে এত বিরুদ্ধ ভাবের উদয় ঘটিত না! এখন কেন এমন মনে হয়?

ফুল্লরা কহিল,—বলে আয়, দিদিমণি এখন লেখাপড়া করছে...কি করে' এখন দেখা হবে?

বেয়ারা চলিয়া গেল। ফুল্লরা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল···কি ভাবিয়া তখনি আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। কে এই কল্প...? একটু কৌতুহল···

উঠিয়া পর্দা সরাইয়া সে বাহিরের পানে তাকাইল···ফটকের কাছে একটি ছোকরা···এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ছুই ঠোঁট ধরিয়া সে শীষ দিল।

বেঁয়ারা গিয়া তাকে কি বলিল,—মাথা নাড়িয়া সে জবাব দিল; গেল না। বেয়ারা ফিরিয়া আসিল, কহিল,—সাহাব বলিতেছে, পাঁচ মিনিটের জন্ম সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন।

ফুল্লরা কহিল,—স্লিপটা দেখাওগে তোমার দিদিমণিকে। সাহাবকে বসবার কামরায় এনে বসাও···

রোজা লাফাইয়া বাহিরে আসিল···কল্প আসিতেছিল বসিবার কামরার দিকে। রোজা কহিল,—হ্যালো···

কল্প কহিল,—গুড্ ঈভনিং···

রোজা কহিল,—কি চাও?

কল্প কহিল,—তোমার রুমাল। সিনেমা হইতে ফিরিবার সময় তোমাকে দেওয়া হয় নাই।

রোজা কহিল,—ফেরত পাইবার আশা করি নাই!

কল্প কহিল,—সে-কথা তো বলো নাই। বলিলে ফেরত দিতে আসিতাম না।···

রোজা কহিল,—আর কোনো কথা আছে?

কল্প কহিল,—দেখা করিবার বাসনা হইল···একটা ছল চাই তো! মনে পড়িল, রুমাল আছে। চমৎকার সুযোগ!

হাসিয়া রোজা কহিল,—দুষ্ট বালক!

কল্প কহিল,—তোমার বাড়ীর ফটকে মাথা গলাইতে ভয় হয়।

রোজা চারিদিকে চাহিল,—ফুল্লরা দাঁড়াইয়া ছিল পর্দার অন্তরালে—যেন কাঠ! দু'জনে কথা হইতেছে ল্যাণ্ডিংয়ে, ইংরেজিতে।

ফুল্লরার মনে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল—এভাবে গোপন-অন্তরালে দাঁড়াইয়া এ-সব কথা তার শোনা উচিত?…

একটু দ্বিধা…তবু নড়িতে পারিল না। পা যেন কে আঁটিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে!

দু'জনে হাত বাড়াইল…বদ্ধ-পাণি। রোজা কহিল,—লেখাপড়া করিতেছি টিউটরের কাছে। গুড্ নাইট…

হাত তখনো কল্মের হাতে…দু'জনের চোখে সুনিবিড় আবেগ! ফুল্লরার বুকে কে যেন ছুরির ফলা বিঁধিয়া দিল!…

ফুল্লরা সরিয়া আসিল। চোখের সামনে বিজলী-বাতির আলো ম্লান-নিষ্প্রভ হইল।…

ফুল্লরা বহুক্ষণ বসিয়া রহিল…তার পর উঠিয়া যখন দ্বারের কাছে আসিল, কল্ম তখন চলিয়া গিয়াছে। রোজা ও-ঘরে-ইংরেজী কবিতা পড়িতেছে। ক্লাশের পড়া…রামগোপাল বাবু অর্থ বলিয়া দিতেছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্রোতের মুখে

রোজা এখানে আছে ছ'মাস। আপনার খেয়াল-ভরে সে চলে। ফুল্লরা শাসন-নিষেধ তুলিত, এখন আর তোলে না। একবার রোজা বলিয়াছিল,—তোমার যদি সহ্য না হয়, আমাকে দাও পাঠিয়ে *বোর্ডিংয়ে।…অন্য মেয়েরা যে-ভাবে মানুষ হচ্ছে, আমি কেন সে-ভাবে হবো না, এইটে আমি বুঝতে পারি না!*

ফুল্লরার আজ-কাল অবসর কম। স্কুল লইয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে আরো পাঁচটা পাব্লিক কাজ আছে—মহিলা সমিতি, সংস্কৃতি পরিষদ, পল্লী-আশ্রম। বড় হইলে চারিদিক হইতে ডাক আসে। ফুল্লরার সে ডাক আসিয়াছে। সে ডাকে সাড়া না দিয়া থাকিবার উপায় নাই। এবং যে ভাবে ফুল্লরা নিজের মনকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সংসারের দাস্যে সে-মনকে ডুবাইয়া দেওয়া চলে না—দিবার প্রয়োজন নাই।

সুশীল চাটার্জী ও ফুল্লরা—কেহ যদি দুজনকে নিরীক্ষণ করিয়া কখনো দেখে একালের আইনের লাইন ধরিয়া, তাহা হইলে তার বুঝিতে বিলম্ব ঘটিবে না, পার্টনারশিপ বলিয়া যে-কারবার আছে, স্বামি-স্ত্রীর কাজ-কারবারে সেই পার্টনারশিপ পূরামাত্রায় বিদ্যমান। পার্টনাররা যেমন ব্যবসার স্থলে মিলিয়া মিশিয়া হাসি-মুখে কাজ করিয়া সন্ধ্যার পর নিজ নিজ নীড়ে ফিরিয়া যায়, এখানেও ঠিক তেমনি ব্যবস্থা! স্বামি-স্ত্রী সন্ধ্যায় পাশাপাশি বসে। হাসি হয়, কথা হয়, বেশ সদ্ভাব

আছে, কিন্তু এ মেলামেশার অন্তরালে পার্টনারদের যেমন স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান, তেমনি স্বামি-স্ত্রীর এ মেলামেশার অন্তরালে আপন-আপন বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তার মাঝখানে স্বামী বা স্ত্রীর প্রবেশ লাভ ঘটে না।

অর্থাৎ স্বামী সুশীল চাটার্জী সারা দিন তাঁর মক্কেল, ব্রীফ, আইনের কেতাব, কোর্ট লইয়া মাতিয়া মশগুল্ হইয়া থাকেন—সন্ধ্যায় আসিয়া স্ত্রীর কাছে একবার বসেন, দুটো হাসি-গল্প চলে, তার পর আবার নিজের কাজের আহ্বানে সরিয়া দূরে যান; স্ত্রী ফুল্লরাও তেমনি স্কুল, পল্লী-আশ্রম, মহিলা সমিতির পাঁচটা কাজ লইয়া তাহার মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখিয়াছে! যেন রুটীনে বাঁধা লাইনে জীবনকে ছাড়িয়া দিয়াছে! নিত্য-চলার ফলে সে পথ আজ মসৃণ, সমতল; চলিতে কোথাও বাধা-বন্ধ বা হুঁচোট খাইবার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা নাই! রোজাও এ সংসারে নিজের একটা বাঁধা পথ তৈয়ার করিয়া লইয়াছে এবং সে পথে সে-ও চলিয়াছে নিঃশঙ্ক সঙ্কোচহীন স্বাধীন ভঙ্গিমায়!

গ্রীষ্মের ছুটীতে রোজা আসিয়া ফুল্লরাকে ধরিল, সে একবার শীলোন ঘুরিয়া আসিতে চায়। বহু দিন যায় নাই। ফুল্লরা কহিল,—কিন্তু বড়দা কোথায়, কোনো খপর নেই, সেখানে কার কাছে যাবে?

রোজা কহিল,—আমার জানা লোকের অভাব নেই। বাবার বন্ধু-বান্ধব আছে, আমারো বন্ধু আছে।

ফুল্লরা কহিল,—বড়দা না বললে কোথায় পাঠাবো?

রোজা গভীর দৃষ্টিতে ফুল্লরার পানে চাহিল। ফুল্লরা কহিল,—যাওয়া হতে পারে না। হাজার হোক্, তুমি মেয়ে মানুষ...

এইটুকু শুনিবামাত্র রোজা একেবারে ফোঁশ করিয়া উঠিল,—মেয়ে মানুষ!...মেয়ে মানুষ বুঝি মানুষ নয়?...ছেলেরা যেতে পারে, আর আমি পারি না?

এ কথায় ফুল্লরার মনে জাগিল নিজের ছেলেবেলাকার স্মৃতি! সেও ঠিক এই কথা বলিত।

মনে কেমন দ্বিধা জাগিল। কথাটা কি সত্য নয়? মেয়ে মানুষ বলিয়া ঘরের মধ্যে বন্দী থাকিবে? পথে বাহির হইবে না? ভয়! কিসের ভয়? পুরুষ যদি নিজের ভার বহন করিতে পারে, মেয়েরাই বা কেন পারিবে না?

চট্ করিয়া রোজার কথায় সে কোনো জবাব দিতে পারিল না।

রোজা কহিল,—আমি যাবো পিশিমা। আমার বড্ড ইচ্ছা করচে। এখানে আমার ভারী একঘেয়ে বোধ হচ্ছে।

—একঘেয়ে!

রোজা কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—একঘেয়ে ঠিক নয়। মানে, কলকাতার কথা সেখানে গিয়ে সকলকে বলবার জন্ম মন খুব চঞ্চল অধীর হয়েছে! কি জানি, কেবল মনে হচ্ছে, একটু চেঞ্জ!...তোমার কিসের আপত্তি, শুনি?

কথার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দরদ-ভরে যেন স্নেহ কামনা করিয়াই রোজা চাহিয়া রহিল ফুল্লরার পানে।

ফুল্লরার মন হইতে সকল বিমুখতা নিমেষে কোথায় সরিয়া গেল। রোজা কথা শোনে না—ফুল্লরা যেমন চায়, তেমন ভাবে সে থাকে না—এজন্য ফুল্লরার মনে সত্যই একটু বিরূপতা জাগিয়াছিল। এখন রোজার চোখের দৃষ্টিতে স্নেহের প্রার্থনা উপলব্ধি করিয়া তার প্রাণ দুলিয়া উঠিল। রোজা—রোজা তার ভাইয়ের মেয়ে! পর নয়—খুবই আপন-জন! দুজনের শিরায় এক রক্ত বহিতেছে—যাকে বলে, রক্তের সম্পর্ক!

রোজার মা খৃষ্টান। তাহাতে কি আসিয়া যায়? আমরা কত

নীচ্-জাতের দাস-দাসীকে স্নেহ করি যে! জাতি বা ধর্ম্ম মানিয়া স্নেহ-ধারা কাহাকেও তৃপ্ত বা বঞ্চিত করে না!

এমনি চিন্তার তরঙ্গে বহিয়া ফুল্লরার মন…

সহসা রোজার স্বরে এ তরঙ্গ মিলাইয়া গেল। রোজা কহিল,—কিছু বলচো না কেন? রাগ করেচো আমার উপর? না, অভিমান? তোমার কথা শুনি না বলে? সত্যি পিশিমা, এবার থেকে তোমার কথা শুনবো, খুব লক্ষ্মী হবো—তুমি দেখো। বলো, আমাকে শীলোনে যেতে দেবে?

ফুল্লরা কহিল,—একলা তোমায় ছেড়ে দিতে পারবো না রোজা…

রোজা কহিল,—কিন্তু জানো, শীলোনে একা আমি কত ট্রিপ করে বেড়িয়েছি!…এতখানি পথ…তুমি ভাবচো, আমার ভয় করবে! কিন্তু কিসের ভয়, শুনি? চোর? ডাকাত? রোজা উচ্চ-কণ্ঠে হাসিল।

চোর নয়, ডাকাত নয়—তাদের আক্রমণ অট্টরবে জাগিয়া ওঠে! তা নয়। পথে তাদের ভয় তত নাই, যত ভয় মিষ্টভাষী বিনয়াবনত কুশলী-দরদী বন্ধু-সাজে সজ্জিত পুরুষকে। হাসিতে বাঁশীতে মশগুল করিয়া এমন অব্যর্থ লক্ষ্যে ইহারা মর্ম্মভেদ করে যে গোড়ায় সে আক্রমণ বুঝিবার সামর্থ্য কাহারো থাকে না! শেষে ইহাদের মিষ্ট হাসিমাখা আঘাত সাংঘাতিক হইয়া ওঠে।

অথচ এ সব কথা লইয়া রোজার সঙ্গে তর্ক বা আলোচনা করা চলে না। ফুল্লরা কহিল,—তোমার পিশেমশায় আসুন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি যা বলবেন, তাই হবে।

—আবার পিশেমশায়! বেশ, তাই হোক!

কথাটা সেদিনকার মত এইখানেই বন্ধ রহিল।

পরের দিন। ফুল্লরা স্কুলে বাহির হইতেছে, সহসা ছবি আসিয়া হাজির।

ফুল্লরা কহিল,—আশ্চর্য্য! তুই যাবার পর যেন যুগ বয়ে গেছে!

হাসিয়া ছবি কহিল,—এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ছিলুম, সত্যি, তোকে একটা খপর দেওয়া উচিত ছিল! পারিনি ভাই...

ফুল্লরা কহিল,—আজ হঠাৎ মনে পড়লো যে! আবার কোনো কাহিনী না কি? না, কাজ আছে?

ছবি কহিল,—তোর গাড়ী তৈরী দেখচি। বেরুচ্ছিস?

—স্কুলে যাচ্ছি।

—বটে! শুনেছি, স্কুল খুলে তার পরিচর্য্যায় একেবারে মেতে উঠেছিস।

—একটা কাজ তো করা চাই। না হলে মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে?

ছবি কহিল,—একটু বসবি নে? মানে, অবসর হবে না? সেখানে ক্লাশ পড়াবি?

ফুল্লরা কহিল,—তা নয়। তবে ছুপুরবেলাটা একা বসে থাকতে ভালো লাগে না, এ কাজ নিয়ে দিন বেশ কেটে যায়।

ছবি কহিল,—সত্যি ভাই, এ যেন লেখাপড়া শিখে সংসারে শিকড় গাড়তে না পারার শাস্তি। কারো মুক্তি নেই এ থেকে!...বোস্ একটু... আবার কাল হয়তো আমি চলে যাবো। কবে আবার দেখা হবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই!

ফুল্লরা বসিল, কহিল,—কোথায় আছিস এখন—শুনি!

ছবি কহিল,—তা ঘুরে এসেছি খুব। মাদ্রাজ, বোম্বাই।

—সেই ক্যানভাশিংয়ের কাজে?

—তাই।...কিন্তু তার আগে আর একটু খপর দেওয়া দরকার...

ছবির কণ্ঠ বাধিয়া গেল। দুই কপোলে লজ্জার রক্ত আভা

ছবি কহিল,—সেই শোভন বিশ্বাসের ব্যাপার থেকেই আমি গা-ঢাকা দিছি। বোধ হয় তোর মনে কৌতূহল জমে আছে! মানে, সকালে তোর কাছে আসবো, ঠিক করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটলো। সকালে ঘুম ভাঙতে শুনি, একজন ভদ্রলোক এসে বসে আছেন ভোর থেকে। মুখ-হাত ধুয়ে বসবার ঘরে এলুম। দেখি, শোভন বিশ্বাস। আমি চমকে উঠলুম।

ফুল্লরা কোনো কথা কহিল না—ছবির পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

ছবি বলিল,—ক্ষমা প্রার্থনার কি সমারোহ! মোহ! ভ্রান্তি! এমনি কতকগুলো বড় বড় কথা বলে শেষে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও! কি প্রায়শ্চিত্ত? বললে, বিবাহ হোক!

বিস্ময়ে ফুল্লরার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ফুল্লরা কহিল,—বিয়ে করেছিস?

ছবি কহিল,—করিনি। করবো। বললুম, বিয়ের আগে তোমায় পরীক্ষা করবো।

—পরীক্ষা?

—তাই। বললুম, এসো আমার সঙ্গে বোম্বাই। একটা কাজ পেয়েছি।...আসলে কাজ পাইনি—শুধু বোম্বাই ঘুরে আসা ছিল উদ্দেশ্য। সে রাজী হলো। তাকে বললুম, দুজনে অপরিচিতের মত থাকবো—এ পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হও, বিবাহ করবো।

সবিস্ময়ে ফুল্লরা কহিল,—তার পর?

হাসিয়া ছবি কহিল,—সে রাজী হলো। আমার মনে ছিল মস্ত অভিসন্ধি—শোধ দেবো খুব বেশী রকমের। পুরুষ মানুষ—পয়সা আর

গায়ের জোর আছে বলে ভেবেছিল, চাইবামাত্র নারী-জাতটাকে আয়ত্ত করবে!···গেলুম বোম্বাই। দুজনে সেখানে আলাদা হোটেলে রইলুম। দেখাশুনা হতো, বেড়ানো, গল্প করা। শেষে একদিন বললুম,—আমি ফিল্মে নামবো ঠিক করেছি! 'কলকাতায় থাকতে একজন ভাটিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। একদিন তিনি বলেন, ভদ্রমহিলাদের নিয়ে যদি ফিল্ম কোম্পানি ষ্টার্ট করা যায়, তা হলে আর্ট আর অর্থ—দুটো বস্তু এক সঙ্গে লাভ হবে।

ফুল্লরা কহিল,—ফিল্মে তুই নামচিস?

—নেমেছি একটা বোম্বাইয়া ফিল্মে। "সতী অনসূয়া"—শ্রীমহালক্ষ্মী ফিল্ম কোম্পানির ছবি। দু'হাজার টাকা নেট লাভ হয়েছে।

ফুল্লরা স্তম্ভিত হইল।

ছবি কহিল,—যা বলছিলুম···শোভন বিশ্বাস একদিন বললে, আর কত দিন প্রতীক্ষা করবো? আমি বললুম—ফিল্ম-ষ্টারকে বিবাহ করবে? সে চমকে উঠলো। বললে, ফিল্ম-ষ্টার? আমি বললুম—হ্যাঁ। সতী অনসূয়া ছবিতে আমি সতী অনসূয়া সেজেচি!··· নিশ্বাস ফেলে শোভন বিশ্বাস দাঁড়িয়ে রইলো। আমি বললুম,—একটা কথা মনে রেখো মিষ্টার বিশ্বাস! পুরুষ মানুষ খেয়াল-ভরে চাইবামাত্র মেয়ে-জাতকে পায় না; মেয়ে-জাতেরও খেয়াল আছে, মর্জ্জি আছে! আমি বেছে নিয়েচি এই ফিল্ম কেরিয়ার। মেয়েদের খ্যাতি আর সম্পদ লাভের পক্ষে এই পথ পরম পথ!

ফুল্লরা কহিল,—চলে এলো বিশ্বাস?

—নিরাশ চিত্তে।

—বেচারী! তোকে ভালোবেসেছিল, সত্যি!

ছবি হাসিল, কহিল,—ভালোবাসা!...তাতে সংসারে নন্দনের সৃষ্টি হয় না, ফুলু! আগে চাই স্বাধীনতা তারপর পয়সা।...

বাধা দিয়া ফুল্লরা কহিল,—বিয়ের কথা যে বলছিলি...

ছবি কহিল,—বোম্বাইয়ে আলাপ হয় আন্‌ওয়ার সাহেবের সঙ্গে। ডিরেক্টর। তিনি যাচ্ছিলেন মাদ্রাজ। আমাকে এনগেজ করেন, "হংসবতী" ফিল্মে নামবার জন্য। তেলেগু ফিল্ম। নগদ তিন হাজার টাকা। ট্রেনে দুজনে আলাপ হলো...দুজনেই বুঝলুম, যদি একসঙ্গে এই ফিল্মে যোগ দিই...খ্যাতি আর অর্থ লাভ হবে প্রচুর। স্থির হয়ে গেল, বিবাহ। তাই সাত দিনের ছুটী নিয়ে এসেছি। বিয়ে হবে লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে। আনওয়ারের বাড়ী লক্ষ্ণৌয়ে। তারপর দুজনের নাম, বুঝলি—ফেয়ারব্যাঙ্কস আর মেরি পিকফোর্ড!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিঃসঙ্গতা

রোজা শীলোনে গিয়াছে। সুশীল চাটার্জী কোন আপত্তি তোলেন নাই; তবে মাষ্টার মশায় রামগোপালবাবুকে সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। লক্ষ্ণৌয়ে বিবাহ সারিয়া ছবি কলিকাতা হইয়া মাদ্রাজে গিয়াছে।

ফুল্লরা বসিয়া অনেক কথা ভাবে। এই যে ঘটনাগুলা ঘটিতেছে—কাল-চক্রের আবর্ত্তন, সন্দেহ নাই! কিন্তু কোথায় কিসের পানে লক্ষ্য?

বিবাহ করিতে বাঙলা দেশে ছবি পাত্র পাইল না—বিবাহ করিল লক্ষ্ণৌয়ের কোন্ আনওয়ার সাহেবকে! সুবিধা! জীবনটাকে সে আরামে কাটাইয়া দিতে চায়।

প্রশ্ন করিতে ছবি স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল, বিবাহের ফলে এক গাদা ছেলেমেয়ে লইয়া তাদের পরিচর্য্যা—ইহাই যদি সংসারে আদর্শ হয় তো সে সংসারের কামনা মানুষ করিবে কিসের লোভে? প্রাতে উঠিয়া সেই রন্ধনের তদ্বির—সারাক্ষণ পুরুষগুলার পরিচর্য্যা করিয়া তবে মিলিবে দু'মুঠা অন্ন গিলিবার অবসর! তাও হয়তো তাহাতে পূর্ণ পরিতৃপ্তি মিলিবে না। সংসারে স্বামী দেবতা—স্ত্রীলোকর পরম গুরু; আর স্ত্রী তাঁর পদসেবা করিয়া পদে পদে শুধু আঘাত সহিবে। জীবন হইতে রূপ রস গন্ধের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া যন্ত্রের মত পড়িয়া থাকিবে। সে বিবাহ, সে সংসার, সে সুখে ছবির বিরাগ চিরদিন। এ-জীবন উপভোগের জন্য। আরাম, বিলাস,—জীবনের সার্থকতা শুধু তাহাতে!

অকুন্ঠিত স্বরে এ কথা সে বলিয়া গেল।

বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু ইহ-জীবনকে আরামে কাটাইবার জন্য সুযোগ-সংগ্রহে! সুখ শুধু এই আরামে!

তাই যদি তো পৃথিবীর সাহিত্যে সীতার মত স্ত্রীর সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব হইল? রাজার কন্যা সীতা! রাজার বধূ সীতা! আরাম-বিলাস ত্যাগ করিয়া বনচারী স্বামীর সঙ্গে বনে চলিলেন! কত যুগের কত কবি সীতার এই দুঃখ-দারিদ্র্য-বরণের স্তুতি গাহিলেন। সে স্তুতি-গান তো কাহারো কাছে পুরানো হইল না—কোনো দিন কটু লাগিল না! ডেশডেমনা! কালো মূর ওথেলোর অমন পীড়ন কি করিয়া সহিল? পোর্শিয়া...

বেচারী পোর্শিয়া! স্বামী ব্রুটাশ জানিয়া রাখিয়াছিল শুধু রোম! রোমের মুখ চাহিতে গিয়া পোর্শিয়ার মুখের পানে কতটুকু চাহিয়াছিল! তবু পোর্শিয়া কোনদিন অনুযোগ তোলে নাই—অভিমানের বেদনা-বিদ্ধ শরে স্বামীর চিত্ত কণ্টকিত করে নাই!

আরাম-উপভোগের সুযোগ সন্ধান করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া যদি স্বামী সংগ্রহ করিতে হইত, তাহা হইলে এতকাল ধরিয়া মানুষের গৃহ-সংসার টিঁকিয়া আসিল কিসের জোরে!

নিজের কথা মনে পড়িল। সুশীল চাটার্জীকে যে সে বিবাহ করিয়াছে···কেন? সুশীল চাটার্জী মস্ত ব্যারিষ্টার···তাই? সে যে চিরদিন পণ করিয়া বসিয়াছিল, বিবাহ করিবে না। নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে! সে পণ কোথায় রহিল? বিবাহের সময় বড় গলা করিয়া বলিয়াছিল,—বিবাহ করিলেও নিজের সত্তা সে বিসর্জ্জন দিবে না। স্বামী থাকিবেন তাঁর সত্তা লইয়া, সে থাকিবে নিজের সত্তা লইয়া।

আজ পর্য্যন্ত সে অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য সে কি করিয়াছে? স্বামীর বিরাট ঐশ্বর্য্যপুটের তলায় নিরাপদ নিশ্চিন্ত নীড় রচিয়া পরম আরামে দিন কাটাইতেছে!

ইহাই যদি সাধ ছিল তো কিসের জন্য ডিগ্রী লইল? স্বামী সুশীল চাটার্জী···তিনি তাঁর নিজের কাজ-কর্ম্ম লইয়া আছেন! বিবাহের পূর্ব্বে যে-কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা নিষ্ঠা-ভরে রক্ষা করিতেছেন! আর সে?

কৃপাকৃতার্থ অন্তরে স্বামীর অনুকম্পা বহিয়া পড়িয়া আছে—বেচারীর মত!

স্কুল! এ তো ছেলেখেলা! বড় লোক স্বামীর স্ত্রী সে—তাই তাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে! স্বামীর খ্যাতি-মান ধরিয়া স্কুল তাহাকে অবলম্বন করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা চায়! বড়লোকের বাড়ীর চাকর-বেয়ারাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া, তাদের খাতির দেখাইয়া এ যেন দরিদ্র প্রতিবেশীর বড় সাজিবার হাস্যকর প্রয়াস!

নিজেকে লইয়া সে কত কি করিবে, ভাবিয়াছিল; তার কোন্‌টা ঘটিল? শুধু বিপুল ঔদাস্যে-আলস্যে গা ঢালিয়া স্বামীর খ্যাতির প্রসাদভোগী হইয়া পড়িয়া আছে!

এর চেয়ে ছবির প্রাণ-মন লইয়া অজানার কোলে ঝাঁপ দিয়া এ্যাডভেঞ্চার-অভিযান যে ঢের ভালো ছিল! তাহাতে জীবন আছে... সদা-জাগ্রত জীবন্ত প্রাণ!

স্কুলের কাজে অবসাদ জাগিল। প্রাণহীন···প্রাণহীন পরিচর্য্যা! মন দিনে দিনে আকুল অধীর হইতেছে। এমন সময় রোজার কাছ হইতে একখানি পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে,—

পিশিমা, আমায় ক্ষমা করিয়ো। আরো দু'চারি মাস আমি এখন এইখানে থাকিব। মাষ্টার মশায় বলেন, তাঁর পক্ষে অত দিন থাকা সম্ভব নয়; কাজেই তিনি কলিকাতায় ফিরিতেছেন। আমি ফিরিব দুই চারি মাস পরে।

বাবা এখানে নাই; জিবরালটার গিয়াছেন জরুরী কাজে। আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। মাসখানেক পরে ফিরিবার কথা—পাঁচজনের মুখে শুনিতেছি। বাবার সঙ্গে দেখা না করিয়া ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

আশা করি, তুমি ও পিশেমশায় ভালো আছ। ভালবাসার সহিত

তোমার প্রিয় ভ্রাতৃ-কন্যা

রোজা

সুশীল চাটার্জী পত্র পাইয়া কহিলেন—জন্মভূমির মায়া। বেশ, যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, দু'চার মাস থেকে আসুক।

আরো পাঁচ-ছয় দিন পরের কথা।

মিসেস দত্ত আসিয়া বলিলেন,—ব্যাপার কি ফুল? কাল তুমি কমিটি মিটিঙে গেলে না? কতকগুলো দরকারী কাজ ছিল।

ম্লান হাস্যে ফুল্লরা কহিল,—আমার শরীর আর মন—দুটোই কেমন ভালো ছিল না, মিসেস দত্ত।

কুতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরার পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া মিসেস দত্ত কহিলেন,—কেন বলো তো?

ফুল্লরা কহিল,—তা ঠিক বলতে পারি না। কেমন যেন অবসাদ!

মিসেস দত্ত কহিলেন,—ভাইঝীর জন্যে মন কেমন করচে, নিশ্চয়। তা, এ মন-ভার তো ঘরে বসে থাকলে সারবে না। এ রোগ সারে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশায়।

ফুল্লরা কহিল,—কি জানি, আমার যেন বাড়ী থেকে নড়তে ইচ্ছা

করে না!...দু'দিন বিশ্রাম নিই—তার পর একটু সুস্থ বোধ করলে যাবো'খন! এ রকম অসুস্থ পঙ্গু মন নিয়ে কোন কাজ করা চলবে না।

মিসেস দত্ত কহিলেন,—'সে কথা সত্য! তা বেশ, দু'দিন বিশ্রাম নাও তুমি।

কোর্ট হইতে ফিরিয়া সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—পরশু রেঙ্গুন যেতে হবে ফুলু।

রেঙ্গুন!

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—একটা বড় মকর্দ্দমা পেয়েছি আজ। সেখান থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল এটর্ণি ম্যাকনিলের কাছে—তারা দুজন বড় কৌঁশুলীর নাম করে জানিয়েছে—চায় উডষ্টক সাহেব আর সুশীল চাটার্জ্জীকে। দেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। প্রায় দেড়মাস থাকতে হবে। এত বড় লোভ সামলাতে পারিনি। তোমাকে না জানিয়ে জবাব দিয়েছি...—অল্ রাইট।—কালই টেলিগ্রাফিক মনি-অর্ডারে তারা পাঠাবে দশ হাজার টাকা। তাদের এজেন্ট এখানে আছে কলকাতায় ···সিনাগগ ষ্ট্রীটে কে মা-পো—তার কাছে।

চমৎকার! জগতে সকলের সামনে পড়িয়া আছে বিশাল মুক্ত পথ! সে শুধু জন্ম লইয়াছে বন্দী ভাবে এমনি অলস পড়িয়া থাকিবার জন্য!

হায় রে নারীর পণ! হায়, তার দুরাশা স্বপ্ন! মনের মধ্যে একরাশ নিশ্বাস যেন ঘূর্ণীর বেগে ফুঁপিয়া ফুঁশিয়া ফুলিয়া উঠিল।

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—তোমার আপত্তি আছে—আমার রেঙ্গুন যাওয়ায়?

—না, না। সে কি! এমন কথা তো কোনোদিন ছিল না যে তোমার জীবনের পথে আমি তুলবো পাহাড়ের বাধা! তা নয়। তোমার

মান, খ্যাতি, অর্থ,—তা থেকে আমি তোমায় বঞ্চিত করবো বিবাহ-সূত্রে ভাগ্যক্রমে তোমার স্ত্রী হয়ে এ ঘরে এসেছি বলে'…?…না।

শেষের দিকে ফুল্লরার স্বর কাঁপিল।

সুশীল চাটার্জী অবিচল দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিলেন। অভিমান? রাগ?

সেণ্টিমেণ্ট! সেণ্টিমেণ্ট ছাড়া এ আর কিছুই নয়! মেয়েরা কতখানি সেণ্টিমেণ্টাল, তা তাঁর জানিতে বাকী নাই!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রান্তর-প্রান্ত

সুশীল চাটার্জী রেঙ্গুনে ; ফুল্লরা নিঃসঙ্গতা বোধ করিতেছিল। স্বামীর সঙ্গে বসিয়া নিত্য হাসি-গল্প বা সেই প্রাচীন ও সাধারণ সংসারের মতো সোহাগ-আদর, মান-অভিমান,—এ-গুলার সহিত তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। পাঁচ জনের মুখে গল্প শুনিয়াছে,—স্বামী-স্ত্রী—দুটিতে যেন কপোত-কপোতী! সিনেমায় যাইতে, নিমন্ত্রণে যাইতে কোন্ শাড়ীখানি পরিয়া যাইবে, কোন্ গহনা গায়ে দিবে, বহু স্ত্রী এ সম্বন্ধে স্বামীর সঙ্গে বসিয়া খানিকটা পরামর্শ করে ; পরামর্শে যেমন স্থির হয়···

এ-কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া থাকে! এমন ছেলেমানুষী মানুষ কি বলিয়া করে? তাছাড়া এতখানি বাঁধাবাঁধি! স্বামীর সঙ্গে কোনো দিন এ-সবের আলোচনা সে করে নাই। সে-আলোচনার সময় কোথায়? যতক্ষণ গৃহে থাকেন, স্বামী তাঁর গ্রীফ্ আর নজীরের কেতাব লইয়া আছেন! ফুল্লরা থাকে নিজের কাজ লইয়া! তার মধ্যে···

কলেজে পড়া কাব্য-নাটকগুলার কথা মনে জাগে। মিরান্দা, রোশালিন্দ, ডেশডেমোনা, শকুন্তলা···

নিছক কাব্য! জীবনে মিরান্দা কোনো দিন মানুষ দেখে নাই—নিজের বাপকে ছাড়া ; তাই ফার্দ্দিনান্দকে দেখিবা-মাত্র অধীর, আকুল! রোশালিন্দ রাজার মেয়ে···মল্ল-যুদ্ধে অর্লান্দোকে দেখিয়া তাকে ভালোবাসিয়াছিল! এ ভালোবাসা···সংসারে সম্ভব নয়! পুরুষ সাজিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ানো—হা-হুতাশ আর দীর্ঘ-নিশ্বাস! পাগল! ফুল্লরা এর অর্থ বোঝে না!

ডেশডেমোনা? শকুন্তলা···?

নায়কদের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বে কোনো কাজ লইয়া কাহাকেও বিব্রত থাকিতে হয় নাই! হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, সখ করিয়া তাই এ ভালোবাসার খেয়াল জাগিল তাদের মনে! ব্যাধি! ফুল্লরার জীবন কি তপস্যার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে...

হয়তো যে দিন যৌবন আসিয়া জীবনের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, মন যদি সে দিন অবসর পাইত, তাহা হইলে··! কিন্তু কাব্য-নাটকের এ ভালোবাসা···? সংসারে এই যে লক্ষ লক্ষ স্বামি-স্ত্রী দিনাতিপাত করিতেছে, তাদের জীবনে মিরান্দা, রোশালিন্দ, শকুন্তলার প্রেম কখনো উদয় হইয়াছে?

শাড়ী-গহনা পছন্দ করা...না হয় মোটর-গাড়ী কিনিবার সময় দু'জনে মিলিয়া একখানা বাছিয়া লওয়া...স্বামি-স্ত্রীর দল অনন্ত যুগ ধরিয়া এমনি করিয়া নিজেদের ভালোবাসার পরিচয় দিয়া আসিতেছে!

পাঁচ জনের কথায় তার মনে এমনি কথা জাগে। তাও ক্ষণেকের জন্য···তার পর আবার কাজের মধ্যে পড়িয়া এ-কথা ভুলিয়া যায়।

সেদিন শেষ রাত্রি হইতে বর্ষা নামিয়াছে। সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া একা চা-পান করিতে করিতে বুকখানা কেমন ভারী বোধ হইল। চায়ের টেবিলে সুশীল চাটার্জী বসিতেন। দুজনে একসঙ্গে বসিয়া চা পান করিত। সে সময়ে কথাবার্ত্তা হইত—স্কুল কেমন চলিতেছে? প্রশ্ন করিতেন,—সেই সঙ্গে আর পাঁচটা কথা উঠিত···বাহিরের জগতের খানিকটা স্পর্শ তখন আসিয়া প্রাণে লাগিত।

আজ সুশীল চাটার্জী কাছে নাই। ফুল্লরা একা বসিয়া চা-পান করিতেছে। মনে হইতেছিল, স্বামী থাকিলে ভালো হইত, পাঁচটা কথা চলিত। বাহিরে অন্ধকার! বর্ষার অজস্র বারি-পাতে মনে কেমন

নিরানন্দ ভাব! প্রভাতের রৌদ্রে যেন জীবনকে অনেকখানি পাওয়া যায়—মন যেন অনেকখানি প্রসারিত হইয়া ওঠে,—ফুল্লরা তাই ভাবিতেছিল।

সংসার সত্যই শুধু কর্ত্তব্যের স্থান? মন বলিয়া যে-সামগ্রীর রহস্য-নির্ণয়ে মানুষ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সাধনা করিতেছে, সে মনটা তবে কি? কি লইয়া মানুষ তৃপ্তি পায়?

চা-পানের পর ফুল্লরা খবরের কাগজ খুলিল। হয়তো বাহিরে যাইত! কিন্তু এ বৃষ্টিতে কোথায় যাইবে? এই জল, কাদা...খবরের কাগজে টেলি-গ্রাম-কলমে দেখে, বড় বড় হরফে ছাপা—ব্রহ্মপুত্রে প্রবল বন্যা নামি-য়াছে—সে জলে আসাম বুঝি যায়!

বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সহস্র আর্ত্ত কণ্ঠের চীৎকার তার কাণে বাজিল। নিশ্বাস ফেলিয়া কাগজ রাখিয়া ফুল্লরা আসিল বাহিরের ঢাকা-বারান্দায়।

পাশে স্বামীর অফিস-কামরা। পা দু'খানা আপনা হইতে ফুল্লরাকে টানিয়া সেই ঘরে লইয়া গেল। চেয়ার খালি। শূন্য ঘর। টেবিলের এক ধারে ডাঁই-করা ব্রীফ···

অন্য দিন এ সময়ে এ ঘর গম্-গম্ করিত···একটি লোককে ধরিয়া কি বিপুল কর্ম্ম-স্রোত বহিত! কি ভিড়! কি কলরব! শুধু এক জনের জন্য!

কেন?

প্রতিভা...শক্তি! এ শক্তি, এ প্রতিভা সকলের নাই।···তার?

এমন কোনো শক্তি নাই যার কুহকে দলে দলে লোক আসিয়া তার সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইবে?

পুরুষ আর নারীর সাম্য! তাও কি হয়? কত কত বৎসর, কত

কত যুগ ধরিয়া পুরুষ শক্তির চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে—নারী শুধু বসিয়া থাকিত গৃহের কোণে—সর্ব্ব কর্ম্মের অন্তরালে সকল শক্তির সান্নিধ্য ছাড়িয়া দূরে···বহু দূরে!

আজ দু'খানা ইংরেজি বইয়ের কল্যাণে বাঁধা কতকগুলা গৎ পড়িয়া সে চায় পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে। মিথ্যা! মরীচিকা!

বেলা ন'টা। স্কুলের টীচার বনলতা ব্যানার্জ্জী আসিয়া হাজির।

ফুল্লরা বলিল—কি খপর, মিস্ ব্যানার্জ্জী?

সরমের রক্ত-রাগে বনলতার কপোল রাঙা হইয়া উঠিল। মৃদু হাস্যে সলজ্জ ভাষে বনলতা বলিল—আমার বিয়ে।

—বিয়ে!···

এত বড় আশ্চর্য্য সংবাদ ফুল্লরা যেন কখনো শোনে নাই! শুনিবে, কল্পনা করে নাই!

বনলতার পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া ফুল্লরা কহিল—হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়, মিসেস্ চাটার্জ্জী। অনেক দিন থেকেই কথা ছিল। শুধু ওঁর চাকরি পাকা না হবার জন্যই···

—ও···তিনি কি করেন?

—প্রফেশরি চাকরি পেয়েচেন। পাকা চাকরি। গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস। কাল এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়েছেন। জয়েন করতে হবে রাজশাহী কলেজে পয়লা তারিখে।

ফুল্লরা কোনো জবাব দিল না, স্থির দৃষ্টিতে বনলতার পানে চাহিয়া রহিল।

বনলতা কহিল—গিয়েছিলুম আজই মিসেস্ দত্তর কাছে। তিনি পাঠালেন আপনার এখানে।···মানে, এ মাসের শেষ তারিখে

আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে আমাকেও রাজ-শাহী যেতে হবে।

—চাকরি ছেড়ে দেবে?

অপ্রতিভ হাসি-মুখে বনলতা বলিল—সংসার আর চাকরি—দুই রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। আমাদের বিয়ের কথা স্থির হয় প্রায় বছরখানেক আগে। তখন আমার মা বেঁচে। আমার যিনি শাশুড়ী, তিনি আর আমার মা দুজনে ছেলেবেলা থেকে ছিল খুব ভাব। বাবা মারা গেছেন প্রায় এক বছর। সংসারে সঞ্চয় কিছু ছিল না। আমার আর আমার একটি ভাইয়ের লেখাপড়ার জন্য সঞ্চয় থাকবার উপায় ছিল না। আমার ভাই পড়ছে শিবপুরে। তার খরচ, সংসারের খরচ···কাজেই বি-এ পড়তে পড়তে এই স্কুলে মাষ্টারী নিতে হয়েছে। মিসেস্ দত্ত সব জানেন। স্বামী এ-কলেজে ও-কলেজে এ্যাক্‌টিং চাকরি করছিলেন। তাতে বিয়ে করে সংসারের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিল না...

বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া ফুল্লরা এ কাহিনী শুনিতেছিল। এক বৎসর ধরিয়া বিবাহের কথা পাকা হইয়া আছে···বনলতা মেয়েটি ভালো—লেখাপড়াতেও বেশ! সংসারের মায়ায় সব ছাড়িয়া নিজের ভবিষ্যৎ ভাঙ্গিয়া চিরকালের দাস্য মানিয়া সংসার-কোটরে আশ্রয় লইবে! কি আছে ও সংসারে? কিসের স্বাদ সে পাইয়াছে? স্বামী? স্বামী তারো আছে। ফুল্লরার বিবাহ হইয়াছে, সংসার আছে...চমৎকার সংসার। কোথাও এতটুকু অভাব-অনুযোগ নাই!···তবু···

বুকে একটা নিশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল। সে নিশ্বাস রোধ করিয়া ফুল্লরা বলিল—সংসারের লোভে লেখাপড়া, নিজের ভবিষ্যৎ—সব ছেড়ে দেবে?

সলজ্জ মৃদু ভাবে বনলতা বলিল—সংসারে আমার বড় মায়া! স্বামী, ছেলেমেয়ে···

তার কথা শেষ হইল না।

ছেলে-মেয়ের কথাটা ফুল্লরার বুকে বিঁধিল ছুঁচের মতো।

ফুল্লরা কহিল—এই এক বৎসর স্বামীর সঙ্গে দেখাশুনা হয়?

সলজ্জ দৃষ্টি ভূমে নিবদ্ধ করিয়া বনলতা বলিল—হয়।

ঠিক! এ ভলোবাসা! কাব্যের সেই প্রেম!

ফুল্লরা বলিল—আমাকে সত্যি কথা বলবে, মিস ব্যানার্জী, এই ভালোবাসাটা কি? যার জন্য এক বৎসর ধরে শত নিরাশা-বেদনার মধ্যেও তোমরা দু জনে দু জনকে আশ্রয় করে আছো?

নিশ্বাস ফেলিয়া বনলতা বলিল—তা জানি না। শুধু জানি, দু জনে দু জনকে দিনের শেষে কিছুক্ষণের জন্য দেখতে না পেলে অস্বস্তির সীমা থাকে না। সকাল হলে কাজের সাড়া জাগে; কাজ করি। মনে হয়, এ কাজটুকু সার্থক হবে সন্ধ্যার সময় দু জনে দু জনের কাছে যখন দিনের কাজের হিসাব দেবো। কত নিরাশা, কত ব্যথা যে গেছে···

ফুল্লরা বলিল,—বুঝেচি।···বিয়ে কবে?

বনলতা বলিল—আঠারো তারিখে।

ফুল্লরা বলিল—নিমন্ত্রণ-পত্র পাবো তো?

—নিশ্চয়। তা হলে আমায় ছুটী দেবেন তো? মিসেস্ দত্ত বল্লেন, তুমি চিঠি লিখে মিসেস্ চাটার্জীর হাতে দিয়ো। তিনি আমাদের কমিটীতে সে-চিঠি ফরোয়ার্ড করলে ছুটী পাবে।···মানে, চাকরি নেবার সময় মিসেস দত্তকে আমি এ-কথা জানিয়ে রেখেছিলুম।

ফুল্লরা কোন জবাব দিল না—চাহিয়া রহিল বনলতার পানে। কত কথা মনে ভাসিয়া আসিতেছিল...মানস-নয়নের সামনে দেখিতেছিল যেন দীর্ঘ প্রান্তর! সে প্রান্তরের প্রান্তে ছোট একখানি ঘর...পান্থ চলিয়াছে প্রান্তর-প্রান্তের সেই গৃহ লক্ষ্য করিয়া...চারি দিক দিয়া সন্ধ্যার

অন্ধকার নামিতেছে! সে অন্ধকারের বুকে কোন্ গৃহ-বাতায়নে ছোট একটি দীপ-শিখা...যেন ধ্রুব-তারা···জল্‌জল্ করিতেছে!

বনলতা বলিল—তা হলে দরখাস্ত লিখে আপনাকে দেবো।···

ফুল্লরা যেন কোন্ নিঃশব্দ-লোকে বসিয়া আছে! তার চেতনা নাই!

কৃতাঞ্জলি-পুটে নমস্কার জানাইয়া বনলতা কহিল—এখন তা হলে আসি...

বনলতা উঠিল। ফুল্লরার স্বপ্ন ভাঙ্গিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

বনলতা কোন জবাব দিল না; মৃদু হাস্যে মাথা নত করিল।

ফুল্লরা কহিল,—এসো।

বনলতা চলিয়া গেল।

ফুল্লরা দাঁড়াইয়া রহিল তার পানে চাহিয়া···যেন কাঠের পুতুল!...

বেলাতেও বৃষ্টি ধরিল না।

বারোটা বাজিল। ইভা আসিল; কহিল,—একটা টিকিট নিতে হবে।

ফুল্লরা বলিল,—কিসের টিকিট?

ইভা কহিল,—চ্যারিটি প্লে করচে বসন্তবাণী-বিদ্যালয়ের মেয়েরা··· স্কুলটা বে-মেরামতে পড়ে যেতে বসেছে। চ্যারিটি প্লে করে যে-টাকা পাওয়া যাবে, তাতে বাড়ীর সংস্কার হবে।

ফুল্লরাকে কিনিতে হইল একটি বক্স। পঞ্চাশ টাকা দাম।

ইভা কহিল—মিসেস্ দত্ত নিয়েচেন পাশের বক্স। তিনি বললেন, এটা দিয়ো ফুল্লরাকে।·· তোমার একটা বক্সের দরকার নেই, জানি। কিন্তু এ তো প্লে দেখা নয়—দান করা।

ইভা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—মিষ্টার চাটার্জ্জী বাইরে গেছেন। তুমি যে সঙ্গে গেলে না! একা এই বর্ষায় বিরহিণী যক্ষ-বধূ সেজে বসে

আছো !···তোমাদের ভাই, সব আলাদা রকম ! মিলনে কোনো দিন উচ্ছ্বাসের ঘনঘটা দেখলুম না—বিরহেও বেশ থাকো রাজ্যের বাইরের কাজ নিয়ে মত্ত !—এখন বসতে পারচি না···ঢের কাজ। এখনো প্রায় দুশো টাকার টিকিট বেচতে হবে। শনিবারে প্লে। আসা চাই, মোদ্দা। বুঝলে ?

মাথা নাড়িয়া ফুল্লরা জানাইল, সে যাইবে প্লে দেখিতে।

তারপর ইভা বিদায় লইল। আসিয়াছিল যেমন এক-ঝলক চপল বাতাসের মতো, গেলও ঠিক তেমনি ভাবে।

গেল ; কিন্তু ফুল্লরাকে পল্লবিনী লতার মতো দোল দিয়া গেল।···

ফুল্লরার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাদের সবই আলাদা রকমের··· মিলনে যেমন উচ্ছ্বাসের ঘনঘটা নাই—বিরহেও তেমনি নাই নিশ্বাসের সমারোহ !···নিশ্বাস আছে বলিয়া মনে হয় না !

সত্যই তাই ?···হয়তো-বা !

চিরদিনের সংসার···সে-সংসার স্বামী-স্ত্রীর হাসি-গান-গল্পে গাঁথা আছে চিরদিন। মানুষকে যদি শুষ্ক কর্ত্তব্যের বোঝা বহিতে হইত, তাহা হইলে···

কাব্যে-উপন্যাসে হৃদয়-বৃত্তি লইয়া এই যে রঙ ফলানো চলিয়াছে, সে তবে আগাগোড়া কাল্পনিক ? হাতে হাত রাখিয়া, নয়নে নয়ন মিলাইয়া প্রণয়ের সে আধ-আধ বাণী ! দুটি তৃষিত অধর পরস্পরকে পাইয়া পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন করে ! আগাগোড়া বসন্তের হিল্লোল···

তার জীবনে সে বসন্ত, কৈ, আসিল না তো !···

নিজের মনের মধ্যে সন্ধান লইল। সুগভীর সন্ধান ! অধরে পিপাসা কোনো দিন জাগিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না ! স্বামী-স্ত্রী বাস করিতেছে, যেন···

ফুল্লরার সারা প্রাণ আজ আর-একটি প্রাণের মিলন চাহিয়া অধীর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সংসারে সব আছে—নিজের তেজ, অহঙ্কার, অভিমান···সব, সব! কাজের উৎসাহ, খ্যাতির মোহ—তাও আছে! নাই শুধু প্রাণ চাহিয়া প্রাণের আত্ম-দানের বাসনা!

যে-সব নারী সংসারে বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইতে ভুলিয়া যায়, তারা তাই লইয়া থাকে! তারা কখনো নিজেদের প্রাণে এমন নিঃসঙ্গতা বোধ করিয়াছে? কে জানে!

ফুল্লরার মনে হইল, এত ভিড়ের মধ্যেও সে যেন পড়িয়া আছে দীর্ঘ প্রান্তরের প্রান্তে একা···নিঃসঙ্গ! পাশে তার কেহ নাই!

বারান্দায় ছিল প্রকাণ্ড দাঁড়া-খাঁচার মধ্যে এক ঝাঁক পাখী—মুনিয়া, জাভা-স্প্যারো···আরো কত জাতের ছোট পাখী। তাদের কলরবে বাতাস ভরিয়া গিয়াছে।

ফুল্লরা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সমবেতা যুযুৎসবঃ

পাঁচ-সাত দিন পরের কথা।

ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় আসামের অনেকখানি ডুবিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। খবরের কাগজওয়ালারা হুজুগে মাতিয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের পুরানো ছবি বাহির করিয়া তার ব্লক কাগজে ছাপিয়া সেই ছবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ-দর্শীর পত্র টাইটেল আঁটিয়া রোমাঞ্চকর এমন বিবরণ ক'দিন ধরিয়া ছাপিতে সুরু করিয়াছে যে পড়িয়া পাঠক-পাঠিকাদের উত্তেজনার আর সীমা নাই! বেকার ছোকরার দল পাড়ায় পাড়ায় আখড়া খুলিয়া কোরাশ্-গানের রিহার্শাল চালাইয়া গলায় বক্স-হারমোনিয়াম ঝুলাইয়া পথে পথে সে গান গাহিয়া ছেঁড়া কাপড়, জামা, চাদর, চাল-ডাল, পয়সা সংগ্রহ করিতেছে বিষম রোখে! যে-সব বুড়া কাজের অভাবে পরচর্চ্চা করিয়া ফিরিত, ছোকরাদের নিঃস্বার্থ অধ্যবসায় দেখিয়া তারা গুম্ হইয়া বসিয়া আছে…অর্থাৎ সহর কলিকাতার সঙ্গে আসামের নাড়ীর যোগ বাধাইয়া ব্রহ্মপুত্র আজ বন্যাস্রোতে মস্ত ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়াছে! সে যেন আজ বহিয়া চলিয়াছে এই কলিকাতা সহরের বুক ছুঁইয়া!

ইভা আসিয়া ফুল্লরার সঙ্গে আবার দেখা করিল, বলিল—লেডিস্ এ্যাসোশিয়েন বন্যার রিলিফ-কাজে নেমেচে। তারা চায় এক জন নামজাদা মহিলাকে সভানেত্রী করতে। তোমাকে সে ভার নিতে হবে, ভাই।

ফুল্লরার মনের নিঃসঙ্গতা তখনো ঘুচে নাই। সে বলিল— কিন্তু ··

ইভা বলিল—এতে কিন্তু বলা চলে না। এতগুলো লোক ধনে-প্রাণে নষ্ট হতে বসেছে···

ফুল্লরাকে রাজী হইতে হইল।

কাগজে কাগজে এ সংবাদ ছাপা হইয়া গেল। তলায় সম্পাদকের টিপ্পনী,—এই তো চাই! অন্নপূর্ণার জাত মায়েরা যদি অন্নপাত্র হাতে লন তো অন্নের দুঃখ থাকে কখনো? টিপ্পনী পড়িয়া ফুল্লরার মনে হইল, নিরন্ন আসাম তার হাতের অন্ন-থলিটির পানে চাহিয়া আছে তৃষিত নয়নে!

ইভা আসিয়া বলিল—রিলিফের কাজে এক দল ইয়ং ভলান্টিয়ার পাঠানো চাই গৌহাটীতে—দেখে-শুনে কাজের তদ্বির করতে হবে। আমি যাচ্ছি।

ফুল্লরার কি খেয়াল হইল! সে কহিল—আমিও যাবো।

—তুমি! কিন্তু মিষ্টার চাটার্জী এখানে নেই!

ফুল্লরা কহিল—তাতে কি! আমাদের মধ্যে সর্ত্ত আছে,—কর্ত্তব্যের আহ্বানে আমরা কারো পথে বাধা হবো না···

নিমেষে এ ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল। রেঙ্গুনে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া ফুল্লরা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মিসেস্ দত্ত আসিয়া ডাকিলেন—ফুল্লরা···

ফুল্লরা কহিল—এ পুণ্য কাজ।

মিসেস্ দত্ত কহিলেন—সেখনে ভয়ঙ্কর কষ্ট পাবে। মাথা গোঁজবার জন্য হয়তো ঘর পাবে না।

ফুল্লরা কহিল—তা হোক···

মিসেস দত্ত কহিলেন,—কিন্তু···

ফুল্লরা কহিল—মন বড় ফাঁকা···নিরাশ্রয় মনে হচ্ছে। কাজ করতে চাই আমি···

ফুল্লরা কাহারো নিষেধ শুনিল না; ক'জন তরুণী ভলাণ্টিয়ার ও একদল তরুণ সহকর্ম্মী গৌহাটী যাত্রা করিল ট্রেণে। ইভাকে লইয়া ফুল্লরা চলিল এরোপ্লেনে চড়িয়া। শীঘ্র গিয়া পৌছিবে! তা ছাড়া আকাশ- পথ হইতে এ বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পদ্মার পারে ঢাকায় গিয়া প্লেন পৌছিল দেড় ঘণ্টায়। রমনার ও-পাশে এরোড্রোমে প্লেন নামিল। ক্ষণেক বিশ্রাম।

পরে জলযোগ সারিয়া প্লেন আবার চলিল···

কুয়াশার অস্পষ্ট আব-ছায়ায় দেখিল, নীচে পৃথিবীর যতখানি দেখা যায়, কে যেন তার অঙ্গে ধূসর রঙের চাদর বিছাইয়া রাখিয়াছে! সে-চাদরের গা ফুঁড়িয়া কোথাও দু'চারিটি গৃহ-শিরের একটুখানি জাগিয়া আছে! কোথাও গাছপালার সবুজ রেখা—তুলির অতি-ক্ষীণ আঁচড়ের মতো!

চারিদিকে জল আর জল···

সন্ধ্যার পূর্ব্বে খানিকটা উঁচু জমির উপরে গিয়া প্লেন নামিল। লোকে লোকারণ্য···আর্ত্ত হতভাগাদের কাতর কলরব ছুটিয়াছে। সে কলরবের বুক চিরিয়া মাঝে মাঝে সান্ত্বনা, আশা জাগিতেছে···যেন নিকষ-কালো মেঘের বুকে বিজলীর চকিত-চমক!

কানাতের ক'টা ক্যাম্প। একটা ক্যাম্প ছাড়িয়া দেওয়া হইল ফুল্লরা ও ইভাকে। বহু লোক আসিয়া তাদের ঘিরিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল,—সকল কাজে ফরমাশ খাটিবার জন্য বিপুল আগ্রহ লইয়া···

আর্ত্ত-ভূমি চকিতে যেন মায়ার স্পর্শে উৎসব-মণ্ডপে পরিণত হইল। সেবার কাজে কর্ম্মীদের উৎসাহ বাড়িল চতুর্গুণ। পরস্পরে বিপুল

প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিল···সেবায় পরিচর্য্যায় এই উৎসব-লক্ষ্মীর প্রসন্ন-দৃষ্টি কে কতখানি লাভ করিতে পারে···!

খবরের কাগজে প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র ছাপিয়া বাহির হইল। লেখা আছে,—কল্যাণী নারীর সংযোগ নহিলে কোনো অনুষ্ঠান সাফল্য-মণ্ডিত হয় না! আর্ত্ত-ত্রাণের এ ব্রতে দেবী সুভদ্রার মতো শ্রীমতী ফুল্লরা চট্টোপাধ্যায়ের জ্বলন্ত অনুরাগ, জীবন্ত উদ্দীপনা ইত্যাদি ইত্যাদি। একখানা কাগজে ছাপা হইয়াছে—Ministering angel-এর মতো শ্রীমতী ফুল্লরা দিকে দিকে উৎসাহ-শিখা জ্বালিয়া দিয়াছেন! তাঁর রূপের বিভায়, মনের জ্যোতিতে বিপদের ঘনান্ধকার ঘুচিতে আর বিলম্ব নাই! জয় শ্রীশ্রীমতী ফুল্লরা দেবী! কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে তোমায় দেখিয়াছি সুভদ্রা-রূপে। য়ুরোপের সমরাঙ্গনে তুমি দেখা দিয়াছিলে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মহিমময়ী মূর্ত্তিতে! আর আসামের এই বিপ্লব-শ্মশানে আজ রূপোজ্জ্বলা, চূর্ণ-কুন্তলা, মণি-কুণ্ডলা অভয়া রূপে ইত্যাদি ইত্যাদি!

খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে এ লেখা পড়িয়া ফুল্লরা মুগ্ধ! মনে হইল, সত্যই যেন কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সুভদ্রার বেশে···

চারিদিকে ভক্ত পূজারীদের অজস্র স্তুতি! সে স্তুতি-বাণীতে কি প্রচণ্ড মোহ!

ফুল্লরার নিঃসঙ্গ জীবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।···এখানে দিন পনেরো কাটিবার পর কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম আসিল। সুশীল চাটার্জী টেলিগ্রাম করিয়াছেন,—

গৃহে ফিরিয়াছি। তুমি আর কতদিন ওখানে থাকিবে? কাজের ব্যবস্থা করাইয়া ফিরিয়া এসো। ফিরতি-টেলিগ্রামে তারিখ জানাইয়ো।

ট্রেন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। আমার সময় থাকিলে নিজে গিয়া তোমাকে লইয়া আসিতাম।

টেলিগ্রাম দেখিয়া ইভা কহিল,—বিরহী যক্ষ ডাক দিয়েছে! এবার ফেরো, সখি!

ফুল্লরা কহিল—না। কাজ ফেলে কি করে এখন যাবো?

ইভা কহিল—মিষ্টার চাটার্জ্জীর অসুবিধা হচ্ছে।

ফুল্লরা কহিল—কোনো অসুবিধা হবে না যক্ষের মতো। সেখানে সংসার যেমন চলে, আমরা দুজনেও তেমনি চলি···যন্ত্রের মতো ···বাঁধা রুটীন ধরে···তার এতটুকু নড়চড় হবার জো নেই!

হাসিয়া ইভা কহিল,—তার মানে?

ফুল্লরা কহিল,—জীবন-ধারণ করছি সকলেই। সংসার এবং সে সংসারে স্বামী, আমি···

দ্বারে আসিয়া কে ডাকিল,—মা···

ফুল্লরা বলিল,—নকুল···এসো।

নকুল ভলান্টিয়ার। বখামি করিয়া জীবনকে রসাতলের পথে লইয়া যাইতেছিল, কর্ত্তব্যের আহ্বানে আজ এ পথে পা দিয়াছে!

নকুল আসিল, বলিল,—একটি মেয়ে এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—নিয়ে এসো।

মেয়ে আসিল। এক জন আসামী তরুণী। সে বলিল, তার সব গিয়াছে; কাঁদিয়া-কাটিয়া সে-শোক ভুলিয়াছে। কিন্তু সে চায় বাঁচিতে—বাঁচিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিতে। এখানে দেখা পাইয়াছে এক জন পূর্ব্ব-প্রতিবেশীর। তারো সব গিয়াছে। সেও চায় নূতন করিয়া সংসার পাতিতে। সে রাজী আছে তাকে লইয়া·· তবে কিছু টাকা

চাই। মন্দিরের ও-দিকে গিয়া ছোট-খাট দোকান খুলিয়া দুজনে বাস করিবে।

ফুল্লরা বলিল,—কত টাকা চাই?

মেয়েটি বলিল,—শ'খানেক।

ফুল্লরা বলিল,—পাবে। আমার নিজের টাকা থেকে দেবো।

মেয়েটি বলিল—এখন যদি পাই, তাহলে এইখানেই সে আমাকে বিয়ে করে…

ফুল্লরা বলিল—তাই হবে। নকুলবাবুর হাতে আমি টাকা পাঠাবো। ও-বেলায় পাবে।

মেয়েটি চলিয়া গেল—খুশী-মনে। ইভা কহিল—কত ভাঙ্গা সংসারকে এ-ভাবে তুমি গড়ে তুলবে? এ লোভ দেখিয়ো না। জানো না তো, এর মধ্যে অনেকেই…

নকুল বলিল—বিয়ে-টিয়ে হয়তো বাজে কথা!…কোনোমতে কিছু আদায় করা…আপনি বুঝবেন না এ-সব লোকের রুচি-প্রবৃত্তির ব্যাপার!

ফুল্লরা বলিল—খুব বড় calamityর পর মানুষের প্রবৃত্তি একটু অসংযত হয়…এটা ঐতিহাসিক সত্য। পৃথিবীর সর্বত্র তাই ঘটেছে অত বড় জার্ম্মান্-ওয়ার…তার পরে সভ্য জগতেও…এখন যাও নকুল। এক সময়ে এসে ওদের টাকাটা নিয়ে যেয়ো…

নকুল চলিয়া গেল। পরক্ষণে আর একটা আর্জী আসিল। এক জন প্রৌঢ় পুরুষ আসিয়া জানাইল, তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—বয়স অল্প—জলের মুখে সব ফেলিয়া দিয়া এ বয়সে সেই স্ত্রীকে পিঠে বহিয়া নিরাপদ আশ্রয়ে কোনোমতে দুজনে প্রাণ বাঁচাইয়াছে। সে-স্ত্রী এখানে একজন ভলাণ্টিয়ার বাবুর সঙ্গে ভাব করিয়া তাকে ত্যাগ করিয়া সরিয়া যাইতে চায়।

ফুল্লরা বলিল—প্রসাদবাবুকে পাঠিয়ে দাও। তাঁর কাছে তোমাদের নাম-ধাম লিখে দিয়ো…ব্যবস্থা করবো'খন।

প্রসাদবাবু এখানকার দশটা ক্যাম্পের অধিনায়ক। লোকটা চলিয়া গেলে ইভা কহিল—কদর্য্য!

ফুল্লরা বলিল—ভালোর গায়ে মন্দ লেগে থাকে সর্ব্বত্র। যেমন আলোর সঙ্গে ছায়া! কিন্তু এ ব্যাপারের মীমাংসা করুন প্রসাদবাবু। আমাদের দ্বারা এর মীমাংসা সম্ভব নয়।

ইভা কহিল,—ও কথা যাক,—টেলিগ্রামের তুমি কি জবাব দিচ্ছ?

ফুল্লরা কহিল,—কি করে এখন যাবো?

ইভা কহিল—যাওয়া উচিত। তুমি একজনের বিবাহিতা পত্নী…

ফুল্লরা কহিল,—ক্রীতদাসী নই। এ কাজে যদি তিনি আসতেন… কর্ত্তব্য বুঝে? আমি তাঁকে ফিরতে বলতে পারতুম? না, বললে তিনি এ-কাজ ফেলে ফিরে যেতেন?

ইভা কহিল—তোমার এ তত্ত্ব আমার মাথায় আসে না! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়,—পরস্পরের কথা শোনার মধ্যে আজ্ঞা-পালনের কথাও আসতে পারে না।

ফুল্লরা কহিল—তা নয় ইভা। সারা জীবন ধরে আমি কেবল ভাবছি, সংসারে এক সঙ্গে বাস করাই কি স্বামি-স্ত্রীর একমাত্র কাজ? পৃথিবী তো তা হলে কতকগুলো ভিন্ন ভিন্ন সংসারের সমষ্টিমাত্র হবে—সবগুলোর মধ্যে যোগ থাকবে কি দিয়ে? চারি দিকে এই যে দাতব্য হাসপাতাল, স্কুল, কারখানা গড়ে উঠেছে, এগুলো কি কখনো গড়ে উঠতো?

অর্থ না বুঝিয়া ইভা কৌতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরার পানে চাহিয়া রহিল।

ফুল্লরা বলিল—স্বামি-স্ত্রী নিজের-নিজের সংসার নিয়েই যদি মত্ত থাকে, তা হলে…এখানকার এই বন্যার কথাই ধরো—এই সব বিপন্ন নর-নারী!

এ বিপদে কার হাত ধরে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতো? কি করে কোথায় বা আশ্রয় পেতো? আমি যদি আজ স্বামীর পাশটিতে চুপ করে বসে থাকতুম...? তুমি...আর-সকলে...? সকলের সংসার আছে—আলাদা সংসার—সেই সংসার নিয়েই আর-সব ত্যাগ করে কেউ বসে নেই। তা থাকে না! থাকে না বলেই পৃথিবী চলেছে অনন্ত কালের সঙ্গে যোগ রেখে এমন শৃঙ্খলিত ধারায়! সেখানে আমি ফিরে যাবো... ফিরে আমি করবো স্কুলের কাজ...স্বামী তাঁর মক্কেলদের মকর্দ্দমা করবেন। এখানে আমি চুপ করে বসে নেই—যে-কাজ পেয়েছি, সে কাজ করছি। সুতরাং ফেরবার প্রয়োজন বুঝচি না। আমার অভাবে সংসার সেখানে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েনি! সে চলছে। মিষ্টার চাটার্জ্জীরও স্ত্রীর অভাব ঘটেনি। তবে...?

আরো দু'চারিটা কথা বলিল...কিন্তু সে কথার অর্থ না বুঝিয়া ইভা হাল ছাড়িয়া দিল।...

ফুল্লরা টেলিগ্রামের জবাব পাঠাইল—এখানে অনেক কাজ। এখন ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষমা করিবে।...

তিন দিন পরে কিসের ছুটী ছিল। বৈকালের দিকে ঘর্ঘর রবে একখানা এরোপ্লেন আসিয়া নামিল। সে-এরোপ্লেনে আসিলেন সুশীল চাটার্জ্জী।

নগদ পাঁচশো টাকা ফুল্লরার হাতে দিয়া সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—টাকাটা দিয়ে আপাততঃ এসো আমার সঙ্গে। দু'তিন দিনের মধ্যে রোজা আসছে। রামগোপাল বাবুর টেলিগ্রাম পেয়েছি কাল। মান্দ্রাজ থেকে টেলিগ্রাম করেছেন তিনি আসছেন বলে।...

ফুল্লরা ফিরিল; যে-মন লইয়া ব্রহ্মপুত্রের বন্যা-রিলিফে গিয়াছিল, সে-মনে অনেকখানি পরিবর্ত্তন লইয়া ফিরিল।

ভক্ত পূজারীদের সেই বন্দনা-গান···কানে যেন লাগিয়া আছে! সারাক্ষণ গুঞ্জন তুলিতেছে—কল্যাণী সুভদ্রা! নাইটিঙ্গেল! Ministering angel···রূপোজ্জ্বলা মণি-কুণ্ডলা দেবী!···জীবনের দিনগুলা কি সার্থকতাতেই না ভরিয়া উঠিয়াছিল! নিমেষের জন্য শূন্যতা উপলব্ধি করে নাই।···

রোজা ফিরিল। আবার সেই স্কুল। ঘরে বসিয়া রামগোপাল বাবুর কাছে নিত্য সেই লেশন্‌সের ঘন-ঘটা! অবাধ মুক্ত জীবনকে আবার সেই বন্ধ-পিঞ্জরে ঠাশিয়া ধরা!...

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—আবার আমায় রেঙ্গুনে যেতে হবে। তুমি যাবে?

ফুল্লরা স্বামীর পানে চাহিল। কোনো জবাব দিবার পূর্ব্বে সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—গেলে হতো। কিন্তু রোজা...একা কার কাছে এখানে থাকবে?...দেখা যাক, আর একবার হয়তো যেতে হবে। তখন বরং দুজনেই তোমরা···

সুশীল চাটার্জ্জী রেঙ্গুনে গেলেন; সেখান হইতে সিঙ্গাপুর যাইতে পারেন। সিঙ্গাপুরে এক জন মক্কেল কাণের কাছে টাকা বাজাইতেছে···

ইভা ফিরিয়া আসিয়াছে। চ্যারিটি প্লের আয়োজনে সে দারুণ ব্যস্ত। এবারকার এ চ্যারিটি ব্রহ্মপুত্র-রোষ-গ্রস্ত বিপন্নদের সাহায্য-কল্পে। ফুল্লরাকে সে ধরিল—এ আয়োজনে নেতৃত্ব করিতে। নকুলও আসিয়াছিল, বলিল—হ্যাঁ মা। মেয়ে জোগাড় হয়েছে। আমার এক বন্ধু বই লিখেচে, মদন-ভস্ম।

সমারোহে রিহার্শাল চলিল। রিহার্শাল লইয়া ফুল্লরা মত্ত। এম্পায়ারের ষ্টেজ ভাড়া লওয়া হইয়াছে। টিকিটের চাহিদা অসম্ভব রকমের।

শোর দু দিন বাকী। ষ্টেজের উপর রাত্রি বারোটা হইতে একটা পর্য্যন্ত রিহার্শাল চালাইয়া ফুল্লরা শ্রান্ত দেহে গৃহে ফিরিলে বয় তার হাতে একখানি চিঠি দিল। সাদা খামে আঁটা। খামে কিছু লেখা নাই।

খাম ছিঁড়িয়া ফুল্লরা দেখে,—রোজা লিখিয়াছে। ইংরেজিতে কয় ছত্র...

মোটরে চড়িয়া রাঁচি চলিয়াছি—দু জন বন্ধুর সঙ্গে। মিস্ পাইক আর মিষ্টার পাওয়েল। চার দিন পরে ফিরিব। সন্ধ্যার সময় কথা স্থির হইয়াছে। পাওয়েল নূতন টু-সীটার কার কিনিয়াছে। ফোর্ড নূতন মডেল। চিন্তা করিবে না।

ফুল্লরার পায়ের তলায় মাটি দুলিয়া উঠিল। মনে পড়িল বহুদিন-পূর্ব্বকার কথা...পথে সেই এ্যাড্‌ভেঞ্চার!

শ্রান্ত অবসন্ন দেহ...মাথা কেমন ঘুরিয়া গেল। ফুল্লরা সোফায় বসিয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রেম ও Love

বহুক্ষণ ফুল্লরার যেন কোনো চেতনা রহিল না! পৃথিবী, সমাজ, ঘর-বাড়ী, লোক-জন...সব কেমন অনুভূতির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল!

ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিল। শুধু ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলিতেছে...আর কোনো শব্দ নাই। দ্বারের প্রান্তে বয় দাঁড়াইয়া আছে...নিঃশব্দে। যেন কাঠের পুতুল!

একটা নিশ্বাস। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দেহে-মনে প্রাণের সঞ্চার হইল। মাথা ভয়ঙ্কর ধরিয়াছে। বয়ের পানে চাহিয়া ফুল্লরা বলিল—তুমি শুতে যাও বয়, খানা আমি খাবো না।

বয় চলিয়া গেল।

বাড়ীতে দাস-দাসী আছে, অনুগত আশ্রিত দু'চারি জন আছে। সকলে ঘুমাইতেছে।

ফুল্লরার মনে হইল, সে বড় নিঃসঙ্গ···একা! রোজা চলিয়া গিয়াছে...

এই চলিয়া যাওয়াটা তার ভালো লাগিল না! এ-ভাবে মানুষ যায় না! বিশেষ, রোজার মতো ডাগর মেয়ে···! এ-ভাবে কখনো কেহ গিয়াছে? যারা যায় ...

ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল।

রোজা গিয়াছে বলিয়া করিবার কিছু নাই!...সন্ধান?

কি প্রয়োজন? স্পষ্ট সে লিখিয়া গিয়াছে—রাঁচি চলিয়াছে; বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াইতে।

মনে হইল, স্বামী থাকিলে ভালো হইত!

কিন্তু স্বামী কি করিতেন?

রোজাকে ফিরাইয়া আনিতেন? ফিরিয়া আসিলেও যাওয়ার যে অপরাধ রোজা করিয়াছে, তা ফিরিত না!

পরক্ষণে মনে হইল, কি অপরাধ? অপরাধই বা কেন? সখ হইয়াছে, বেড়াইতে গিয়াছে! পুরুষ-মানুষ এমন যায়। রোজা মেয়ে বলিয়া...

কোথা হইতে বিদ্রোহের ক্ষীণ শিখা মনের মধ্যে ঝলশিয়া উঠিল। এত লেখাপড়া শিখিয়া ফুল্লরা এ-কথা কেন ভাবে? হয়তো রোজা নিজের মনের পরিচয় জানে! হয়তো তার মনের উপর জোর আছে!

সঙ্গে সঙ্গে ছবির কথা মনে পড়িল। আবার সে শিহরিয়া উঠিল। ছবি সহজ মেয়ে নয়! কিন্তু সেই শয়তান বিশ্বাস...

পুরুষের উপর নারী কোনো দিন নির্ভর রাখিতে পারিবে না? একা অসহায় নারী...পুরুষের কাছে সে শুধু মৃগয়ার জীব?...

এ কথাগুলো রোজা জানে? জানিলে ভয় নাই! যদি না জানে...?

কথাগুলা সহজ নয়। সহজ ভাবে সকলের সঙ্গে এ কথার আলোচনা করা চলে না! কিন্তু আজ যখন পুরুষের সঙ্গে সাম্য চাহিয়া নারী দিক্‌দিগন্তে বাহির হইতেছে, তখন এ কথাগুলা জানিয়া রাখা প্রয়োজন! এমনি পাঁচ-সাত রকম ভাবিতে ভাবিতে ফুল্লরার দুই চোখ ঘুমে মুদিয়া আসিল। সারাদিন পরিশ্রম অল্প হয় নাই। সেজন্ত অবসাদ...

ফুল্লরা উঠিল। উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শয্যায়

—রইল। খোলা খড়খড়ি দিয়া আকাশের খানিকটা দেখা যাইতেছে ...ছোট ছোট হাল্‌কা মেঘ...যেন বরফের কুচি! কখনো সেগুলার উপর দিয়া, কখনো বা নীচে দিয়া পিছলাইয়া সরিয়া সরিয়া চাঁদ ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে···নিরাময় নিরুদ্বেগে!

ফুল্লরা চক্ষু মুদিল।······

পরের দিন সকালে ইভা আসিয়া দেখা দিল, সঙ্গে নকুল।

চায়ের টেবলে বসিয়া কাজ-কর্ম্মের কথা চলিতেছিল। ইভা বলিল,—টিকিট যা বেচেছি, তার টাকা তোমায় দিয়ে যাই···তোমার খাতা এনে সেগুলো জমা করে নাও, ভাই। তারপর নকুলের পানে চাহিয়া বলিল,—তুমি এখন যাও সান্ন্যাল সাহেবের কাছে। তিনি নিজে ক'খানা দশ টাকার টিকিট নেবেন—তাছাড়া ক'খানা টিকিট···তিনি চেয়েছেন, বেচে দেবেন। Higher seatsএর টিকিট···তুমি একটা ফর্দ্দ করে এনো···সেই ফর্দ্দ দেখে টিকিট নিয়ে যেয়ো মিসেস চাটার্জীর কাছ থেকে।···

নকুল চলিয়া গেল।

কথায় কথায় ইভা বলিল,—তোমার ভাইঝী কোথায়? তাকে সঙ্গে নিতে চাই। এ সব কাজে ওরা যদি না ভলাণ্টিয়ারী করে···

ফুল্লরা কহিল,—সে রাঁচি গেছে।

—রাঁচি! কবে গেল? কাল তাকে দেখে গেছি, সকালের দিকে যখন এসেছিলুম...

ফুল্লরা বলিল,—হ্যাঁ।...রাত্রে ফিরে এসে চিঠি পেলুম। লিখেছে,—রাঁচি চললুম···দিন চারেকের জন্য!

ইভা কহিল,—হঠাৎ?···কার সঙ্গে গেল?

ফুল্লরা কোন কথা গোপন করিল না, বলিল,—তার বন্ধুদের [illegible] কে এক মিস্ আর কে এক মিষ্টার। তারা বাঙালী নয়।

বাঙালী নয়!

ইভার বিস্ময় একেবারে সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। ফুল্লরা কোনো কথা কহিল না, খাতায় জমার ঘরে টাকার অঙ্ক লিখিতেছিল...

ইভা কহিল,—ডাগর মেয়ে...একা রাঁচি গেল এমনি করে'...তোকে কিছু না জানিয়ে!...এ তো ভালো কথা নয়, ফুলু!

ফুল্লরা বলিল,—কি করবো? স্কুলে যায়...স্বাধীন...এ নিয়ে আগে দু'চার কথা বলেছিলুম...তাতে রাগ করে। সেই অবধি বলা ছেড়ে দিয়েছি...

ইভা কহিল,—পর নয়! রাগ করে বলে' এমন উদাসীন থাকবি! ...এ-বয়সে বাইরের সম্বন্ধে...ওদের কি জ্ঞান আছে, বল্?...তার ভালোর জন্যেই বলা...

ফুল্লরা বলিল,—সে বলে, নিজের ভালো সে নিজে বোঝে।

ইভা কহিল,—মিষ্টার চাটার্জী এ-কথা শুনলে হয়তো রাগ করবেন!

ফুল্লরা কি ভাবিল, পরে খাতার লেখা শেষ করিয়া বলিল,—যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে ভেবে তো কোনো ফল নেই!...এই যে আমরা একদিন ও-বয়সে লেখাপড়া শিখেছি...রাঁচি যাবার অবসর হয়নি বা বাড়ীর লোক যা চায় না, এমন কাজ কোনোদিন করিনি!...আর ছবি? কি করলে, বল্? মানুষের প্রবৃত্তি কি রুচি কেউ কোনোদিন নিষেধ-শাসনে ফেরাতে পেরেচে?

ইভার মনের আতঙ্ক তবু ঘুচিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।...

সারাদিন ফুল্লরার অস্বস্তি আর কাটিতে চায় না। নিজেকে কখনো ইহার পূর্ব্বে এতখানি নিঃসঙ্গ বা নিঃসহায় সে বোধ করে নাই!

দুপুরবেলার কোথা হইতে আকাশে এক রাশ মেঘ জাগিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। সে বর্ষায় ধৈর্য্য হারাইয়া মন তার অসহ্য বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। বসিয়া বসিয়া কেবলি মনে হইতেছিল, মনকে শিখাইয়া পড়াইয়া কি পাইলাম? ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। নিজের মায়ের কথা…

তার মতো স্কুলে পড়িয়া মা কতকগুলা একজামিন পাশ করেন নাই! নিজেকে সংসারে সঁপিয়া দিয়াছিলেন কি ভাবে, নিজেকে কতখানি দাবিয়া রাখিয়া! ছেলেরা তর্জ্জন তুলিয়াছে…তারা কোনোদিন মা বলিয়া পাশে গিয়া বসে নাই, নিজেদের লইয়া মাতিয়া থাকিত। বাপ খেয়ালী…বই আর খাতাপত্র লইয়া দিনাতিপাত করিতেন। মা কোনো দিন এতটুকু অনুযোগ তোলেন নাই! কাহারো বিরুদ্ধে নয়! হাসি-মুখ…নিমেষের জন্ম মাকে ম্লান বা মলিন দেখে নাই। সেই সংসারে মানুষ হইয়া মেয়েদের উপর পুরুষের যেটুকু অবিচার দেখিয়াছে, পীড়ন দেখিয়াছে, সেই দেখার ফলেই না সে মনকে সুদৃঢ় পণে বদ্ধ করিয়াছিল, নিজের জীবনে সে দেখাইবে, পুরুষের উপর নির্ভর না রাখিয়াও নারীর দিন অনায়াসে কাটিয়া যায়।

বিবাহ!…

…ভুল নয়। মোহ নয়। বন্ধু বলিয়া সুশীল চাটার্জীকে গ্রহণ করিতে মন উদগ্র উন্মুখ হইয়াছিল। সুশীল চাটার্জী বলিয়াছিলেন, ফুলরার স্বাধীন চিন্তায়, স্বাধীন মতে কোনো দিন হস্তক্ষেপ করিবেন না!

এ কথা টলে নাই।…

কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া জীবন এমন নিঃশেষ শূন্য মনে হয় কেন? সকলের এমন হয়?

সংসার?…সংসার এমনি? তার কোথায় কি আকর্ষণ? কাহো

নাটকে পড়ে, ভালোবাসা। সে ভালোবাসায় দেহ লইয়া কত না [illegible] কত ভাবে! বাহুর বাঁধন...অধর-সুধা··

এ সবে ফুল্লরার মন বিরূপতায় ভরিয়া ওঠে। পশুরার মতো নিজেকে ধরিয়া দেওয়া···ছি!

ঘৃণায়-লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসে।···অথচ এই ভালোবাসার কথা লইয়া যুগে যুগে কত কবি, নাট্যকার ও শিল্পীর শিল্প রচনা চলিয়াছে...

লজ্জা আর ঘৃণার বস্তু হইলে এ ভালোবাসা...যৌবনের এই প্রমত্ত আবেগ...?

লেখাপড়া আর দুর্জ্জয় মনের পণ···তাহারি জন্য তার মনে হয়তো যৌবন কোনোদিন জাগিয়া আসন পাতিয়া বসিতে পারে নাই! হয়তো···

ককড় শব্দে আকাশ চিরিয়া তীব্র বজ্রনাদ। ঘর-দ্বার...সেই সঙ্গে ফুল্লরার মনের মধ্যটাও সে শব্দে ঝন্-ঝন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।···চিন্তার সূত্র গেল ছিঁড়িয়া।

ফুল্লরা স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল বাহিরের পানে···অজস্র বিপুল ধারায় আকাশ যেন তার বক্ষ-সঞ্চিত সমস্ত জল পৃথিবীর বুকে ঢালিয়া দিতেছে...

কেন? কেন?

ফুল্লরার নিঃসঙ্গ মনে এ প্রশ্ন বিপর্য্যয় আকারে চাপিয়া বসিল।

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি থামিল।

টেলিফোনে ডাক আসিল,—হ্যালো···হ্যালো···

রিহার্শালে যাইতে হইবে। এ বৃষ্টিতেও কেহ সেখানে গর-হাজির নাই। ফুল্লরার পথ চাহিয়া সকলে বসিয়া আছে···

শূন্যস্তব্ধ বাড়ী ছাড়িয়া সে কোলাহল-কলরবের মধ্যে যাইতে পারিলে প্রাণটা বুঝি বাঁচে ...

গড়িয়া-হাট রোডে বাণী-মঞ্জরীর গৃহে রিহার্শাল বসে। ফুল্লরা রিহা-র্শালে গেল।

মেয়েরা সাজিয়াছে। পুরুষের দল নেপথ্যে বসিয়া আয়োজন করি-তেছে। গান শেখানো, নাচ শেখানো, অভিনয়-পোজ, এক্সপ্রেশন... এগুলা শিখাইতেছে গুণী পুরুষ। ফুল্লরা এ-সবের তত্ত্বাবধান করি-তেছে।

শঙ্কর বসিয়াছেন যোগাসনে। ধ্যান-মগ্ন চিত্ত হইতে ত্রিভুবন সরিয়া গিয়াছে। উমা আসিয়াছেন পূজার অর্ঘ্য বহিয়া। এমনি সময়ে দেবতাদের ইঙ্গিতে মদনকে আসিয়া শঙ্করের ধ্যান ভাঙ্গিতে হইবে পুষ্পশরের আঘাতে! নয়ন মেলিয়া শঙ্কর দেখিবেন, পেলবযৌবনা উমাকে! সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে জাগিবে মধুমাস...কোকিল-ভ্রমরের গুঞ্জন...নব পত্র-পল্লবে আবেগ ও আবেশ-মত্ততা!

মদনের প্রবেশ লইয়া তর্ক উঠিল। উমার আসিবার পূর্ব্বে মদন আসিয়া বসিয়া থাকিবে গিরি-শিলার অন্তরালে,—পাশে রতি,—শঙ্কর ধ্যান-স্তব্ধ! কথা উঠিল, মদন-রতি এখানে একটা গান গাহিলে atmosphere খাশা জমিয়া উঠিবে নিমেষে!

নাট্যকার বলিল,—গান দিলে পেশাদারী থিয়েটারের মতো হবে। আমি চাই, আগে থেকে কোনো আভাস দেবো না। উমা এসে যখন ষ্টেজে দাঁড়াবে, তখন মদন তার ধনুতে জুড়বে পুষ্পশর! উমার সেদিকে লক্ষ্য নেই—তিনি আসচেন ধীর পায়ে, দ্বিধা-কুণ্ঠাভরে শঙ্করের কাছে এগিয়ে! দুটি চোখের দৃষ্টি শঙ্করের মুখে—শঙ্কর চেতনা-হারা, নিস্পন্দ! এই শর শঙ্করের বুকে লাগবে তখন, যখন উমা এসে দাঁড়াবেন ঠিক শঙ্করের

সামনে! তীরের বেদনায় শঙ্কর চোখ মেলে চাইবেন—সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত জাগ্রত হয়ে উঠবে—শঙ্করের চিত্তে চাঞ্চল্য জাগবে উমার যৌবনশ্রী দেখে! এর মধ্যে গান দিলে আর্ট মাটী হয়ে যাবে!

নানা জনে নানা মত দিল। অবশেষে ফুল্লরাকে করিতে হইবে এ সব মতের বিচার

ফুল্লরা বলিল—রিহার্শাল হোক। কি রকম হয় দেখি—দেখে আমার মতামত বলবো।

রিহার্শাল চলিল। দৃশ্য-শেষে ফুল্লরা বলিল—মদনের গানের দরকার নেই।

ইভা বলিল—যে-মেয়েটী মদন সাজবে, সে ভারী চমৎকার গান গায়। ওর মুখে যত গান দেবে, তত attraction হবে। ব্যবসার দিকে চেয়ে সেই ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে তো!

আবার তর্ক চলিল......

আর্ট মাটী হইয়া যাইবে, এই ভয়ে নাট্যকার বলিল—আপনি বিচার করুন মিসেস চাটার্জী, প্রেমের প্রথম-জাগরণ—তা ঘটে অতি-নিঃশব্দে, অতি মৃদু ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে!

হাসিয়া ফুল্লরা বলিল—ও-সব কবিতার কথা চলবে না। কথা হচ্ছে, ইভা যা বললে, businessএর দিক দিয়ে।

ক্ষুব্ধ নাট্যকার বলিল—আপনিও দেখবেন ঐ business-এর দিক! নাটক, আর্ট—তবে গিয়ে love's psychology...এগুলো উড়িয়ে দেবেন?

হাসিয়া ইভা কহিল,—শুনুন, এ তো ঘর-সংসারের কথা হচ্ছে না—এ হচ্ছে box-office-এর ব্যাপার। যে মেয়েটি মদন সাজচে, সে খুব ভালো গান গায়। গ্রামোফোনে ওর রেকর্ড আছে। রেডিওতেও গায়।

নাট্যকার আবার ফুল্লরার পানে চাহিল, মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল—কিন্তু আপনি বলুন, love…তার প্রথম স্পন্দন জাগলে স্ত্রী-পুরুষে চায় বিজন ঠাঁই, নির্জ্জনতা!

ফুল্লরা বলিল,—ও সব love-টাভ চলবে না। এ হলো business. এঁরা যা বলচেন, experience থেকেই বলচেন। এঁরা stage-play করিয়েচেন আরো; তাছাড়া জানেন, এই সব love-display…আমার কাছে কিন্তু এ-ব্যাপার ফার্শ বলে' মনে হয়।

—ফার্শ!

কথাটা বলিয়া যে-দৃষ্টিতে নাট্যকার ফুল্লরার পানে চাহিল, যেন তার চোখ দুটা ঠিকরিয়া খশিয়া পড়িবে!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ঝঞ্ঝা

প্লে'র দিন রাজসূয় ব্যাপার। পোষাক-পরিচ্ছদ আসিয়া জমা হইতেছে। ফুল্লরার গৃহে দর্জীর দল বসিয়া গিয়াছে। যে-মেয়েরা সাজিবে, সকলে আজ এ বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। পোষাক পরাইয়া তার কাট-ছাঁট চলিয়াছে অবিরাম। আর্ট-ডিরেক্টর একেবারে দশ হাত বাহির করিয়াছে। সকলের স্নানাহার আজ এই বাড়ীতে।

বেলা দুটায় একখানা টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির। রোজা টেলিগ্রাম করিয়াছে,—

> হাজারিবাগের পথে ব্রেক-ডাউন। গাড়ীর এঞ্জিন অচল। ফিরিতে বিলম্ব হইবে। চিন্তা করিবে না।
>
> রোজা

টেলিগ্রাম পড়িয়া ফুল্লরা চুপ! ইভা বলিল,—রোজার টেলিগ্রাম?

—হ্যাঁ।

টেলিগ্রামখানা ফুল্লরা ইভার হাতে দিল। টেলিগ্রাম পড়িয়া ইভা শুধু ফুল্লরার পানে চাহিয়া রহিল। ফুল্লরা বলিল—বসে আছ কি! তোমার এখন অনেক কাজ—এই সব জিনিষ ষ্টেজে পৌঁছে দেওয়া।

ইভা কহিল—কিন্তু এই **accident**?

ফুল্লরা কহিল,—মানুষ নিজের কর্ম্মফল ভোগ করবে। তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কিম্বা সাধ্য-সাধনা যদি অপরে করে, তাতে লাভ?

ইভা কহিল—এ হলো ফিলজফির কথা।

ফুল্লরা কহিল—কিন্তু ফিলজফি যা কখনো কল্পনা করে না, তার চেয়েও বড় বড় ঘটনা জগতে ঘটে। মোদ্দা, এ-কথা যাক, আমার মনের শিক্ষা যা হচ্ছে, একটার পর আর একটা ঘটনায়, তাতে ক্রমে দেখচি, fatalist হয়ে দাঁড়াবো। তুই এখন যা।

ইভা কহিল—যাই।…তুই কখন আসচিস?

—তিনটে, সাড়ে তিনটে নাগাদ আমি যাবো। ক'টা জিনিষ আসবার কথা আছে, সেগুলো এলে বেয়ারাদের কাকেও নিয়ে আমি যাবো। তুই যা। ওদিকে চা, খাবার-দাবার…এ-সবের ভার তোর হাতে।

থিয়েটারে অভিনয় যা হইল, চারিদিকে জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। ফুল্লরা বসিয়া অভিনয় দেখিল। যেন স্বপ্নলোক!

যে-মেয়েটি উমা সাজিয়াছে, তার নাম নবনলিনী; জ্যোতিরেখা সাজিয়াছে মদন। নবনলিনীর অভিনয় দেখিয়া ফুল্লরার মনে হইল, এমন যার শক্তি, বাস্তব ভুলাইয়া দর্শকের মনে অতীত যুগের এ প্রেম-সাধনাকে যে এমন জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে, সে শক্তি জাগ্রত করিয়া কেন সে সারা বিশ্বে আনন্দময়ীর বেশে দাঁড়াইবে না? আর জ্যোতির ঐ কণ্ঠ…নাচে এমন করিয়া ভাবাবেগ ফুটাইয়া তোলা…রতির ঐ বেদনা-ভরা সুর…

ইহার নাম প্রতিভা! এই প্রতিভার জোরে পাশ্চাত্য জগতে সারা বার্ণহার্ড, আনা পাবলোভা, মেল্‌বা ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া গিয়াছেন! এ-দিক দিয়া নিজেদের জীবনকে কি সার্থকতায় না ভরিয়া তুলিয়াছেন! পুরুষকে অবলম্বন করিয়া নারীর বাঁচা ভুল! নিজের সত্তা যদি না জাগাইয়া তুলিলাম, তাহা হইলে জীবন বৃথা হইল!

সংসার দেখা, রান্না-বান্না—এ সব কাজ দাস-দাসীতেও করে! খাওয়া-

খাওয়ার জন্তেই মানুষ সংসার করে না! সেক্সপীয়র খাওয়া-দাওয়া লইয়া বসিয়া থাকেন নাই! গ্যটে, বায়রন, টলষ্টয়···আর পাঁচজনের মতো খাওয়া-দাওয়া করিয়াছেন, সত্যি! কিন্তু জীবনকে এই খাওয়া-দাওয়া আর পয়সা-রোজগারের মধ্যেই সঁপিয়া দেন নাই! এ সব ছাড়িয়া মন ছুটিয়াছিল···তাই পৃথিবীর বুকে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া অমর হইয়া আছেন! আমার বুকে যে শক্তি আছে, সে শক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলা চাই···

ষ্টেজের উপর শিব তখন উমার সামনে ভিখারীর বেশে দাঁড়াইয়া-ছেন—দুই হাত অঞ্জলি-বদ্ধ···শিব বলিলেন,—আমায় ভিক্ষা দাও সুন্দরি···তোমার ঐ হৃদয়-মন! আমি ভিখারী···তোমার দানে আমি ধন্য হই!

এগুলা শুধু কথা···এ কথার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন যোগ নাই! এমনি কথা নাটকের নায়ক চিরদিন বলিয়া আসিয়াছে,—এ সব কথা না বলিলে নায়ক হয় না, তাই! এ সব কথা ভেদ করিয়া ফুল্লরার মন চলিয়া ছিল,—শাশ্বত-সত্যের সন্ধানে!···শক্তি! প্রতিভা!···

এই শক্তি···কাহার কি শক্তি আছে, সে শক্তি বিকশিত করিয়া তোলো! তবেই জীবনে মিলিবে সার্থকতা! মানুষ করিবে selfকে realise!

কাব্য-নাটক, ফিলজফি আর জীবন—একসঙ্গে সবগুলা মিশিয়া ফুল্লরার মনে তরঙ্গ তুলিয়াছিল···উচ্ছ্বাসে-বিপুল তরঙ্গমালা!···

এমনি চিন্তার তরঙ্গে ফুল্লরার মন ভাসিয়া চলিয়াছে, সহসা যেন ভীষণ হুঙ্কারে বাজ হাঁকিল। চমকিয়া ফুল্লরা দেখে, এক-বাড়ী লোক মত্ত নেশার ঘোরে অবিরাম করতালি বর্ষণ করিতেছে এবং ষ্টেজের মোটা পর্দাখানা বার-বার সরিয়া, বার-বার ফিরিয়া ষ্টেজকে আবার ঢাকিয়া

দিতেছে! ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া আছে হাসি-মুখে খুশী-মনে সাজা-পোষাকে শিব, উমা, মদন, রতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ…

দর্শকের দল নড়িতে চায় না! থিয়েটার ছাড়িয়া যাইবে না। কি তাদের উল্লাসের উচ্ছ্বাস!

ফুল্লরা বলিল,—এ আয়োজন এতখানি সফল হবে ভাবিনি!

ওদিকে দর্শকের মধ্য হইতে উপহার বর্ষণ চলিয়াছে…প্রচণ্ড উৎসাহে …বিমুগ্ধ চিত্তের প্রীতি-নিবেদন!

ইভা আসিয়া বলিল—সামনের হপ্তায় আর একবার রীপীট করো এ প্লে। সকলে বলছে, আবার দেখবে…

আবার?…ফুল্লরা কোনো জবাব দিল না…সে যেন কোন্ স্বপ্নলোকে বসিয়া আছে…চোখের সামনে যা দেখিতেছে…স্বপ্ন!

জীবন তার ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে! সোনার শিকলে বন্দী সে বসিয়া আছে মণিরত্ন-রচিত খাঁচায়। মন হাঁফাইয়া ওঠে প্রতি-নিমেষ।

কোন কাজে সুখ নাই! স্কুলের কাজ…সে যেন প্রাণহীন!

রোজা ফিরিল, ফিরিয়া ফুল্লরার কাছে আসিয়া বলিল—মাপ করো পিশিমা—I couldn't help this joy drive. It was so lovely.

গৃহে ক্রমে সে দুর্লভ হইয়া উঠিল। একদিন ফুল্লরা বলিল—তোমার পিসেমশায় এখানে থাকলে বিরক্ত হতেন। বাড়ীতে তাঁর কতকগুলো নিয়ম-কানুন আছে, এ বয়সে তোমার তা মেনে চলা উচিত, রোজা।

রোজা বলিল—কি সে নিয়ম-কানুন? লেখা কোনো নিয়ম-কানুন আমি কখনো দেখিনি।

ফুল্লরা বলিল—আমি এ কথা বলচি না, যে প্রতি ব্যাপারে দাসী করো! তা নয়…তবে কতকগুলো সহজ বিধি…আমরাও এক দিন লেখাপড়া করেছি রোজা…বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, বন্ধু-বান্ধবের

সঙ্গে এমন ট্রিপ দেওয়া...আমি জানি, দু'চার জন এ venture করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে···বড় রকমের বিপদ!

এ কথা শুনিয়া রোজা ক্ষণেক গম্ভীর হইয়া রহিল, পরে বলিল—But these my friends···they are all honourable people···কিন্তু আমার বন্ধুরা ইজ্জৎদার ভদ্রলোক!

কথাটা বলিয়া রোজা সে স্থান ত্যাগ করিল।···

ফুল্লরা ভাবিল, রোজা কি ভাবে? ভালো কথা বলিতে গেলে তার এমন জটিল অর্থ করে কেন?···তার কল্যাণের জন্য···তাকে শুধু একটু সচেতন করিয়া দিতে এ কথা তুলিতে হয়। নহিলে রোজার সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন নয়, অনর্থক তাকে ব্যথা দিবে, তার সহজ আরামে নিষেধ তুলিবে!

'নিষেধ' কথাটা মনে জাগিতে ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল।

এই নিষেধ আর শাসন—এ দুটার বিরুদ্ধে ফুল্লরা চিরদিন রুখিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে!

তবু এ-নিষেধ···আর সে-নিষেধ—দুটা সমান নয়! দুয়ে কত তফাত।

মিসেস দত্ত আসিয়া একদিন অনুযোগ তুলিলেন—স্কুলের সঙ্গে তুমি সংস্রব কেটে দিলে, মিসেস চ্যাটার্জী!

ফুল্লরা বলিল—কাটিনি। মনের অবস্থা খুব ভালো নয় বলে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।

মিসেস দত্ত মৃদু হাসিলেন, বলিলেন,—মন যে-কারণে ভালো নয়, সে কারণ তো ঘরে বসে থাকলে ঘুচবে না! এখন আরো উচিত, পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করা! চ্যারিটি প্লে নিয়ে ব্যস্ত ছিলে···ভাবলুম ভালো হয়েছে। সত্যি, দুজনে এ বয়সে বেশী দিন ছাড়াছাড়ি থাকা যায় না। আমি জানি মিসেস চ্যাটার্জী···আমারো একদিন এ-বয়স ছিল। মনে

পড়ে, মেদিনীপুরে উনি একবার যান মকর্দ্দমা করতে। সাত দিন একটানা সেখানে ছিলেন। আমার যা হয়েছিল···উনি এসে বললেন,—তোমার খুব অসুখ-বিসুখ করেছিল, মুক্তি!···এ কি চেহারা!···চলো দার্জ্জিলিং, নয় পুরী!···আমি বললুম, তুমি আর মেদিনীপুরে যেয়ো না—দেখো, আমারো কোনখানে যাবার দরকার হবে না—ঘরে থেকে সেরে উঠবো···ষোল কলায়।

ফুল্লরা মনে মনে হাসিল। ভাবিল, কি যে এঁরা ভাবিয়া রাখিয়াছেন! স্থির নেত্রে সে মিসেস দত্তর পানে চাহিয়া রহিল।

মিসেস দত্ত কহিলেন—একটি ছেলে বা মেয়ে হতো···তাহলে মন এতখানি হু-হু করতো না!···হওয়া উচিত। এখনো হলো না! সত্যি, বলো যদি তা হলে আমি এমন মাদুলি আনিয়ে দিতে পারি···ও-সবে আমার খুব বিশ্বাস আছে। দেখেচি তো চোখে!

ফুল্লরা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল—আপনি চুপ করুন মিসেস দত্ত···মিষ্টার চাটার্জ্জী বাইরে গেছেন বলে' আমার মনে এ ভাবান্তর হয় নি। আপনারা যা ভাবেন···মানে, ও-সবে আমার প্রবৃত্তি বা রুচি নেই। ছেলেবেলা থেকে একটা কথা শুধু আমার মনে জাগতো···নানা ঘটনা থেকে মনে মনে আমি পণ করেছিলুম, সাধারণভাবে সংসার পেয়ে লোকে তুষ্ট থাকে, তাদের জীবনটুকু তারা ঢেলে দেয় সংসারের পায়ে! তাতে আমার মন ওঠে না। আমার মনে হয়, নিজেদের জীবনকে কোনো একদিক দিয়ে ফুটিয়ে তোলাতেই জীবনে সত্যকার সার্থকতা! স্বামীকে দুটো ভালো খাবার করে' খাওয়ালুম, তাঁর কাছে বসে দুটো ভালোবাসার কথা শুনলুম—তার পর ছেলেমেয়ে···তাদের সাজানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো···এগুলো যেন কলের কাজ! এ কাজ করবার জন্যে কি দরকার, বলুন, মনকে শিক্ষায়-দীক্ষায় জাগিয়ে তোলায়?

কি-বা দরকার পৃথিবীতে, এত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাবার? আমাদের দেশে পুরুষমানুষ বলুন আর মেয়ে-জাতই বলুন—জগতে এসে কি করলো, তার কোনো হিসাব আমায় দিতে পারেন?

হাসিয়া মিসেস দত্ত বলিলেন,—এ নিয়ে তুমি বক্তৃতা দাও ফুল্লরা... মেয়েরা কবিতা লিখচে, উপন্যাস লিখচে, স্কুল, মহামণ্ডল খুলচে, পলিটিক্স করচে···কিন্তু তোমার মতো ফিলজফির চর্চ্চায় কেউ এখনো মাথা ঘামায়নি! কি যে তুমি বলো!···আমি বুঝেচি তোমার কেন অভিমান··· তা এসো আমার সঙ্গে···স্কুলে। যে ভার নিয়েছিলে, সে ভার নিয়ে আমাকে ভাবনার দায় থেকে বাঁচাও ভাই, সত্যি!···

ফুল্লরা কহিল,—আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস দত্ত, আমার মন সুস্থ না হওয়া ইস্তক আমি স্কুলের কাজ দেখতে পারবো না।...এ-মন নিয়ে কাজ করা চলে না।···ক'দিন ধরে ভাবচি···লেখাপড়া কেন শিখলুম? কি কাজে লাগচে? দাসী-চাকরদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে কিম্বা স্বামীর বিলাস-সহচরী হয়ে জীবনে সব পেলুম বলে তৃপ্তি বোধ করা—আর যে পারে করুক, আমি তা করতে পারচি না।...তার চেয়ে···ঐ যে আমাদের থিয়েটারে সেদিন জ্যোতি বলে মেয়েটি মদন সেজেছিল...ভাবচি, কেন মিছে ও এ বিদ্যা শিখচে! দুদিন পরে সংসারে হাঁড়িকুড়ি, হাতা-বেড়ির মধ্যে সব বিদ্যা ঢেলে নিশ্চিন্ত হবে তো! ঐ নাচ নিয়ে ওর উচিত সাধনা করা···আনা পাবলোভা ঐ নাচের কৌশল দেখিয়ে দুনিয়া জয় করে ফেললেন···এ কি কম গৌরব!

মিসেস দত্ত বলিলেন,—বেশ তো, তুমি লেখাপড়া শিখেচো—স্কুলের ভার নিয়ে তুমি শিক্ষা দাও, বাঙলার মেয়ে-জাতকে যতখানি পারো, শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করে তোলো।

ফুল্লরা বলিল—এ শিক্ষা দেওয়া···যেন প্রাণহীন ঠেকচে! মামুলি কতকগুলো গৎ গিলিয়ে দেওয়া···একে শিক্ষা বলতে আমার বাধচে, মিসেস দত্ত।

মিসেস দত্ত চট্ করিয়া কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল,—নকুলবাবু!...

ফুল্লরা বলিল—ও! তাঁকে ও-ঘরে বসাও।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন হাওয়া

মিসেস দত্ত চলিয়া গেলে ফুল্লরা পাশের ঘরে আসিল। নকুল বসিয়া একখানা খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতেছিল, ফুল্লরাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ফুল্লরা বলিল—কি খপর?

নিশ্বাস ফেলিয়া নকুল বলিল,—ভালো খপর নয়।

ভালো খপর নয়? কিসের খপর?...

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ফুল্লরার মনে হইল—তার কাছে দুনিয়ার কোন্ খপর এমন মূল্যবান্?

সমস্ত পৃথিবী যেন চোখের সামনে সবেগে দুলিয়া উঠিল। স্বামী...?

কিন্তু তিনি বিদেশে! মক্কেলের ব্রীফ পিষিয়া চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে পয়সা বাহির করিতেছেন! তাঁর খবর নকুল কোথা হইতে পাইবে?

কুতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরা নকুলের পানে চাহিয়া রহিল।

নকুল বলিল—আপনার ভাইঝি...

রোজা? রোজার সম্বন্ধে কোনো কথা ভাবিছে না, স্থির করিয়া রাখিলেও মন চমকিয়া উঠিল। ফুল্লরা কহিল—রোজা কি করেছে?

কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে নকুল কহিল—কথাটা বলতে লজ্জা হচ্ছে, অথচ না বললে নয়!

অধীর আগ্রহে ফুল্লরা কহিল—বলো...

নকুল বলিল—একখানা টু-সীটার মোটরে তিনি আর একটি ফিরিঙ্গি ছোকরা চলেছিল গড়িয়া হাটের দিকে। টালিগঞ্জের কাছে একখানা

ট্রামের সঙ্গে গাড়ীর ধাক্কা লাগে। ফিরিঙ্গি ছোকরার মাথা ফেটে গেছে। আপনার ভাইঝীরও বেশ চোট লেগেছে—তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আমরা ঐ পথে আসছিলুম। এখানে তাঁকে দেখেছি বলেই চিনতে পারলুম। খুব ভিড় জমে গেল। আম্বুলেন্স ডাকিয়ে তাঁদের দুজনকে শম্ভুনাথ হাসপাতালে পাঠানো হলো। শুনলুম, দুজনেই না কি, মানে, drink করেছিলেন···

ফুল্লরা বলিল—রোজা বেঁচে আছে ?

—আছে··

ফুল্লরা বলিল—বাড়ীতে আনা যাবে না ?

নকুল বলিল,—বোধ হয়, তারা এখন আসতে দেবে না। চোট যা পেয়েছেন, সামান্য নয়! ফিরিঙ্গি ছোকরাটির এখনো জ্ঞান হয়নি। আপনার ভাইঝীর জ্ঞান হয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি আমি এখানে এসেছি আপনাকে খপর দিতে।

ফুল্লরা কি ভাবিল ; তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তাকে আমি দেখতে যেতে পারি ?

নকুল বলিল—কেন পারবেন না ?

ফুল্লরা বলিল—তাহলে আমাকে তুমি নিয়ে চলো, নকুল। আমি তো জানি না, কোথায় কার সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করতে হবে।

নকুল বলিল—আপনি তাহলে তৈরী হয়ে নিন। আমি আপনার ড্রাইভারকে বলি, গাড়ী আনবে।

—বেশ!

হাসপাতালে আসিয়া রোজাকে দেখিয়া ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল। মাথায় মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ; দুটি চোখ শুধু আর্ত্ত করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া আছে! অশ্রুর বাষ্পে সে দৃষ্টি যেন ধুইয়া নির্ম্মল হইয়া রহিয়াছে!

ফুল্লরা কহিল—খুব কষ্ট হচ্ছে ?

রোজা কোনো কথা বলিতে পারিল না। আর্দ্র-চোখে দু'ফোঁটা জল ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিল।

নার্শ বলিল,—কথা বলতে পারচেন না।

ফুল্লরা বলিল,—কোনো ভয় নেই ?

নার্শ বলিলেন,—না।

কথায় কথায় প্রকাশ পাইল, রোজা সুরা পান করিয়াছিল···লজ্জায় ফুল্লরার মাথা যেন কাটা গেল !

ফুল্লরা কহিল—বাড়ী যেতে পারবে না ?

নার্শ বলিল,—এখন নড়াচড়া করা উচিত হবে না, দু'দিন।

ফুল্লরা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।···

গৃহে ফিরিল অনেক রাত্রে। মনে যেন চিতা জ্বলিতেছে ! জীবনে এত অস্বস্তিও মানুষকে ভোগ করিতে হয় ! কৈ, এমন অস্বস্তি তো অপরে ভোগ করে না। সংসার লইয়া কাজে-কর্ম্মে তাদের দিনের পর দিন কাটিয়া চলিয়াছে···লঘু মন, মুখে হাসি-কথা···

হয়তো তাদের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ। মনের যেমন প্রসার নাই, বাসনারও তেমনি সীমা আছে ! তাই।···সে···

কি চায়, আজো তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না ! সংসার···লোকে বলে, আরাম-নীড় ! কিন্তু কোথায় আরাম ? কিসে আরাম ?

রোজার কথা মনে পড়িল। বেচারী রোজা ! রোজা কিসের সন্ধানে এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ? গৃহে তার সুখ নাই, আরাম নাই ! আজ কোন্ অপরিচিতের সঙ্গে বাহির হইয়া সে কি করিয়া বসিল ? সুরা-পান ! সর্ব্বাঙ্গ রী-রী করিয়া উঠিল। সুরা-পান দোষের···সকলের মুখে শুনিয়া আসিতেছে আশৈশব। দাদা কি বলিবে ? মেয়ের ভার তার হাতে দিয়া

কোথায় পড়িয়া আছে কত দূরে! আর ফুল্লরা এমনি করিয়া রোজার ভার বহন করিতেছে!

সমস্ত পৃথিবী তপ্ত গোলার মতো চোখের সামনে বিপর্য্যয় বেগে ঘুরিতে লাগিল। তার ঝাঁজে প্রাণ বুঝি জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়!

দারুণ অস্বস্তির মধ্য দিয়া বিনিদ্র-রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে স্বামী আসিয়া উপস্থিত।

রোজার কথা ফুল্লরা বলিতে পারিল না। না বলিলেও সুশীল চাটার্জী জানিলেন খবরের কাগজ পড়িয়া।

তিনি আসিয়া ফুল্লরাকে বলিলেন,—রোজার এত বড় accident হয়েছে? আমায় বলোনি!

অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে ফুল্লরা স্বামীর পানে চাহিল। সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—কে এই হার্বার্ট?

ফুল্লরা কহিল—ওর কোন্ ক্লাশফ্রেণ্ডের ভাই, বোধ হয়।

—তার সঙ্গে রোজা বেরিয়েছিল! তুমি অনুমতি দিয়েছিলে?

—না।

—তবে?

ফুল্লরা বলিল রোজার কাহিনী; কবে সে চিঠি লিখিয়া হাজারিবাগ যায়, তার সঙ্গে এ ব্যাপার লইয়া আলোচনা—তাহাতে রোজা কি জবাব দিয়াছিল···সব কথা; কোনো কথা গোপন করিল না।

শুনিয়া সুশীল চাটার্জী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—সংসারী হবার কোন যোগ্যতা নেই,—তোমার নেই, আমারো নয়।···কিন্তু এ ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার দায়িত্ব অনেক বেশী, ফুল!···কিছু মনে করো না।। বিদেশে বসে আমাদের ঘর-সংসার, আমা-

দের জীবন—এ নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি।···ভেবেছিলুম, এখানে এসে তোমার সঙ্গে এ-সব কথার আলোচনা করবো। দুদিন বাদে আলোচনা করতুম,—কিন্তু এখানে আসবামাত্র রোজার এ ব্যাপার···তা কি বলো...শুনবে আমার কথা?

একটা উদ্যত নিশ্বাস চাপিয়া ফুল্লরা বলিল,—বলো।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—সংসার রচনা করে পুরুষ আর নারী দুজনে মিলে,—সে সংসারে বন্ধুভাবে দুজনে পরস্পরের উপর নির্ভর রেখে, দুজনে মিলে-মিশে আরামে বাস করবে বলে'।···পুরুষ হয়তো একা কোনোমতে দিন চালিয়ে যেতে পারে! কিন্তু সংসার না হলে মেয়েদের চলে না··· নয় কি?

ফুল্লরা কহিল—তা নয়। পুরুষেই সংসার চায়—দিনের শ্রান্তি ঘুচোবে সংসারে এসে। সংসার ছাড়া তার অন্য আশ্রয় নেই। মেয়েদের আবার সংসার কি? সংসারে সে আসবাব মাত্র। আর পাঁচটা জিনিষ— দাস-দাসী, খাট-বিছানা—এ সব জিনিষ না হলে পুরুষ যেমন সংসারে আরাম পায় না, তেমনি মেয়েদের না পেলেও পুরুষের সংসার অচল থাকে, তাই দয়া করে মেয়েদের এনে পুরুষ সে-সংসারে ঠাঁই দেয়। সংসার হলো পুরুষের পক্ষে অস্বাচ্ছন্দ্য-অস্বস্তি ঘুচোবার মুক্তি-নীড়—মেয়েদের পক্ষে সংসার কারাগার···বন্ধন! পুরুষের ঘর আছে, বাহির আছে; মেয়ে-মানুষের বাহির নেই—শুধু ঘর আছে। আলোর আরাম বোঝবার জন্য অন্ধকারের দরকার···নিছক-আলো মানুষের ভালো লাগে না। তেমনি নিছক-বাইরে পুরুষের ভালো লাগে না বলেই পুরুষ ঘর বাঁধে—ঘরে-বাইরে দু'জায়গায় পূর্ণ আরাম উপভোগ করবে বলে'।

সুশীল চাটার্জী মনোযোগ দিয়া এ কথা শুনিলেন; শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—এ কথা তুমি বলতে পারো···বলবার সুযোগ তোমার

আমি দিয়েছি...এই অবধি বলিয়া সুশীল চাটার্জী চুপ করিলেন; কুতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরার পানে চাহিয়া রহিলেন।

ফুল্লরা কোন জবাব দিল না।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—তোমায় এনে তোমার পানে কোনো দিন আমি তাকাইনি। পয়সা রোজগার নিয়ে মত্ত আছি অহর্নিশি এর ফলে তোমার মন নিভে যেতে বসেছে...সব ব্যাপারে তোমার গভীর ঔদাস্য···কোনো-কিছুতে আগ্রহ নেই—এগুলো আমি লক্ষ্য করেছি। তাছাড়া এই যে বিদেশে গিয়েছিলুম···সেখানে যাঁর বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলুম, সেখানে দেখলুম···তাঁরা স্বামী-স্ত্রী···দুজনে কি অন্তরঙ্গতা! সকল কাজে দুজনে দুজনের উপর নির্ভর করচেন! একদিন বেড়াতে যাবার কথা হলো...পঁচিশ মাইল দূরে একটা লেক আছে, সেইখানে। ভদ্রলোক বললেন, স্ত্রীকে না জানিয়ে মতামত দিতে পারবেন না! আমি ভাবলুম, বেশ তো! অথচ আমি এই মক্কেলের ব্রীফ নিয়ে চলে এলুম, এতদিনের জন্য···এ ব্রীফ নেবার আগে আমার স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করিনি!···স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্যে এতখানি ত্রুটি···ভালো নয়।··· তাই আমি ভাবতে ভাবতে আসচি, এখন থেকে আর ব্যবসাদারীর পার্টনার-শিপ নয় তোমার সঙ্গে···একেবারে পুরো: দস্তুর দাম্পত্য জীবন যাপন করবো···I a loving husband, and you a smiling wife...partners in minds. (আমি স্বামী—তোমাকে ভালোবাসিব, আর তুমি হাস্যমুখী পত্নী—মনে-প্রাণে দুজনে অংশীদার!)

স্বামীর এ অত্যুগ্র উচ্ছ্বাস ফুল্লরাকে স্পর্শ করিতে পারিল না! সে যেন কোন্ কল্পলোকে বসিয়া আছে—বাস্তব জগতের আলো-বাতাস যেন সে কল্পলোককে স্পর্শ করিতে পারে না!

মনের মধ্যে নিরবলম্ব শূন্যতা...ফুল্লরা বুঝিতে পারিল না, স্বামীর এ কথার কি জবাব দিবে!

সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—এ গেল আমাদের ঘরোয়া কথা! তার পর রোজা···কাগজে যা লিখেচে···তা যদি সত্য হয়··বড় দুঃখের কথা! She was smelling of liquor···ভদ্র-ঘরের মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না!···তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে তাকে দেখতে?

ফুল্লরা কহিল—গিয়েছিলুম।

—তাকে বাড়ীতে নিয়ে এলে না কেন?

ফুল্লরা কহিল—ডাক্তাররা বললেন, নিয়ে আসা চলবে না অন্ততঃ দু'দিন।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—আমি ফোন্ করে দিই তার জন্য আলাদা কামরার ব্যবস্থা করতে···

ফুল্লরা বলিল,—নার্শকে বলে সে ব্যবস্থা কাল রাত্রেই আমি করে এসেছি। আজ তাকে দেখতে যাবো।

—যেয়ো। এখানে আসবার ক্ষমতা হলেই তাকে নিয়ে এসো। তাকে সুবুদ্ধি দাও···সুশিক্ষা দাও, ফুল। নিজেদের ছেলেমেয়ে নেই··· ঐ রোজাকে মানুষ করে, এসো, আমরা সংসার-ধর্ম্ম পালন করি। স্নেহ-মায়া—এই সবেই মানুষ আনন্দ পায়, আরাম পায়। কথায় বলে, ছেলেমেয়ে মানুষের জীবনে আনন্দ আর কল্যাণ···সে কথা খুব ঠিক। এই রোজাকে অবলম্বন করে আমরা সংসার রচনা করবো···পয়সা বলো, খ্যাতি বলো,—মানুষ এ-সব চায় সংসারের জন্য!

ফুল্লরা চুপ করিয়া বসিয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল, কোনো জবাব দিল না।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—তোমার সঙ্গে সর্ত্ত ছিল—বিবাহের আগে···সে সর্ত্ত পাগলের প্রলাপ!···সংসার মানে স্বামি-স্ত্রীর মিলন-তীর্থ!···দুজনে পথে পথে ঘুরে সন্ধ্যার পর মাথা গুঁজে সেখানে আশ্রয় নেবে। সংসার গাছতলা নয়।···তার উপর জানো, নারীর জীবন সার্থক হয় তার গৃহিণীপনায়···এবং সে গৃহিণীপনা এই সংসারে।

কথাটা বলিয়া সুশীল চাটার্জী হাসিলেন; ফুল্লরা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল···যেন পাথরে-গড়া পুতুল!

রোজা ধীরে ধীরে সরিয়া উঠিল। সারিয়া ওঠার সঙ্গে বাহিরে উপসর্গ দেখা দিল। পুলিশ একটা কেশ করিয়াছে হার্বার্টের নামে। সে কেশের তদন্ত করিতে গিয়া এমন ক'টা বিশ্রী কথা বাহির হইল যে সুশীল চাটার্জীর দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না।

তিনি আসিয়া রোজাকে বলিলেন,—এই সব লোককে বন্ধু ভেবে এদের সঙ্গে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াও! আমাদের কথা না ভাবো রোজা, তোমার বাবার কথা ভেবো। এখানে তোমায় রেখে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন···এ খপরে মনে তিনি কতখানি ব্যথা পাবেন, বলো তো!

রোজা গুম্ হইয়া রহিল, কোনো কথা বলিল না। সুশীল চাটার্জীর সঙ্গে কোনো বিষয় লইয়া সে কখনো তর্ক করে না, আজো করিল না।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—পুরুষের সঙ্গে একই ভাবে তোমাদের শিক্ষা চলেছে বলে' তাদের সঙ্গে তোমরা সমান চালে চলতে যাও, কিন্তু তা চলা যায় না! ভগবান তোমাদের তৈরী করেছেন ভিন্ন উপাদানে! পুরুষের সঙ্গে সমান-চালে চলতে গেলে তোমাদের পক্ষে সেটা হবে nature এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম! Nature এর সঙ্গে যুদ্ধে তোমার ক্ষত-বিক্ষত হবে—

এ কথা নিশ্চয় জেনো।...এ সব সঙ্গ ত্যাগ করো। চাও যদি তোমরা পিসিমার সঙ্গে বাইরে বরং একটু ঘুরে এসো...দার্জ্জিলিং কিম্বা কাশ্মীর! মন যা চাইবে, তা করা মানুষের চলে না। ইচ্ছাকে দমন করতে শেখো...মানুষ হও। কি বলো?

এ কথার উত্তরেও রোজা কোনো কথা বলিল না। সুশীল চাটার্জ্জী আসিয়া ফুল্লরাকে বলিলেন—নিজের মেয়ে হলে শাসন করতে পারতুম—এ-ক্ষেত্রে শাসন সম্ভব নয়। পারো যদি, তুমি ওকে বুঝিয়ে সুপথ দেখাও।

ফুল্লরা বলিল—আমার কথা শুনবে না। ওর মন এক ভাবে গড়ে উঠেছে...

সুশীল চাটার্জ্জী নিঃশব্দে কি ভাবিলেন বহুক্ষণ...তার পর বলিলেন,—তোমার দাদাকে চিঠি লিখবে?

ফুল্লরা বলিল,—দাদা তো ভবঘুরে মানুষ...

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—এ ব্যাপার নিয়ে একটু কুৎসার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অন্যায়...ছেলেমেয়েকে এভাবে বেপরোয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়! পৃথিবীর-কতটুকু তারা জানে? এই জন্যই আমাদের দেশের শাস্ত্র বলেছে,—দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ! ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত শাসন-নিষেধের দরকার।

ফুল্লরা কহিল—শাস্ত্রের কথা উচ্চারণ করলেই কাজ হয় না। রোজা আমাদের এখানে এসেছে ষোল বৎসর বয়স পার হয়ে। তখন শাসন-নিষেধে কাজ হয় না।

—তাহলে উপায়?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল্লরা বলিল—কোনো উপায় দেখছি না

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—তাহলে আমি বলি, এই স্কুল আর বন্ধ ছাড়িয়ে দেওয়া যাক্। বাড়ীতেই ও থাকবে। বেড়াতে যাবে তোমার সঙ্গে, কিম্বা আমার সঙ্গে।…ছ'মাস segregation…। এই সব বন্ধুরা যদি এখানে দেখা করতে আসে তো তারা রোজার দেখা পাবে না। দরোয়ানকে আমি বলে রাখচি।…কেশটার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করচি।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যুৎ-বহ্নি

রোজা এখন স্কুলে যায় না। সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—আগে তোমার শরীর সারুক—তার পরে স্কুল।

স্কুল-যাওয়া বন্ধ হইলেও রোজা ঘেঁষ দিল না। সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—রোজাকে তোমার কাছে দেখি না যে!

ফুলরা বলিল—আসে না।

—সারা দিন কি করে?

—নিজের মনে থাকে। পড়ে, লেখে, গান গায়।

সুশীল চাটার্জ্জী ক্ষণেক কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন—বাইরে কোথাও যাবে ওকে সঙ্গে নিয়ে? মানে, change of scene?

ফুলরা বলিল—আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হয় কি ভাবে, জানি না।

হাসিয়া সুশীল চাটার্জী কহিলেন—নিজে মানুষ হয়েছ তো…সেই অভিজ্ঞতা…

ফুল্লরা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—মানুষ হয়েছি? আমার মনে হয়, হই নি। নাহলে আর পাঁচ জনের মতো সংসারকে অবলম্বন করে থাকতে পারছি না কেন?

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—তার কারণ আমরা দুজনেই সংসার গড়বার দিকে মনোযোগ দিই নি। আমি হয়ে উঠেছি পয়সা রোজগার করবার যন্ত্র! গৃহলক্ষ্মীকে জাগাবার কোনো চেষ্টা করি নি।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফুল্লরা চাহিয়া রহিল স্বামীর পানে—স্বামীর মুখে এমন কথা আজ পর্য্যন্ত সে শোনে নাই।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—উপায় যখন নেই, এমনি ভাবে চলুক। আমার কোর্ট বন্ধ হলে আমিই বেরুবো তোমাদের নিয়ে…

মাসখানেক পরের কথা। সন্ধ্যার সময় রোজা আসিয়া ডাকিল,—পিশিমা…

ফুল্লরা সদ্য-প্রকাশিত একখানা ইংরেজী বই পড়িতেছিল, রোজার আহ্বানে তার পানে চাহিল।

ভ্রূকুটি-ভঙ্গী করিয়া রোজা বলিল,—এ ভাবে পড়ে থাকা সহ্য হয় না—ভারী একঘেয়ে লাগছে।

ফুল্লরা কহিল—কি চাও?

—আমি একটু বেরুতে চাই।

ফুল্লরা বলিল,—চলো…আমিও তাহলে ঘুরে আসি।

রোজা বলিল,—আমি একলা যাবো।

ফুল্লরা কহিল—তোমার পিসেমশায়ের মানা আছে, জানো তো…

রোজার চোখের দৃষ্টিতে বিরক্তি!

ফুল্লরা বলিল—তোমার শরীর এখনো সারে নি।

রোজা বলিল,—আমি বেশ সেরেছি।

ফুল্লরা বলিল,—কোথায় যাবে ?

স্বরে একটু ঝঙ্কার দিয়া রোজা বলিল,—ভয় নেই। কোনো বন্ধু-বান্ধবের কাছে যাবো না। মাঠের দিকে ঘুরে আসবো।

ফুল্লরা বলিল—কতক্ষণ পরে ফিরবে ?

রোজা বলিল,—কতক্ষণ! এক ঘণ্টা…দু'…ঘণ্টা…তিন ঘণ্টা…তার বেশী নয়।

ফুল্লরা বলিল,—বেশ, যাও।

রোজা বাহির হইল; ফুল্লরা ড্রাইভারকে বলিয়া দিল,—দিদিমণির শরীর খারাপ—কোথাও যেন না নামেন,দেখো…

কথাটা বলিয়া দিল রোজার অসাক্ষাতে! বলিবার সময় বুকখানা একবার কাঁপিল। এ কথার অন্তরালে…

কিন্তু উপায় কি ?

ঘণ্টাখানেক পরে সুশীল চাটার্জ্জী ফিরিলেন; ফিরিয়া বলিলেন,—রোজা আর তুমি…চলো, দুজনকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি।

ফুল্লরা বলিল,—হঠাৎ ?

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—আজ সন্ধ্যাবেলায় ফ্রী আছি।

কথাটা সুশীল চাটার্জ্জীর নিজের কানেই কেমন-ধারা শুনাইল। অবসর যদি দৈবাৎ কখনো মেলে, তখন মনে পড়ে স্ত্রী বলিয়া ঘরে এক জন জীবন্ত প্রাণী আছে…তার পানে মাঝে মাঝে ফিরিয়া চাওয়া প্রয়োজন!

ফুল্লরা বলিল—রোজা বাড়ী নেই।

—নেই ?

—না। বললে, ভালো লাগছে না, একটু বেড়িয়ে আসবে।

—একা গেছে?

—তাই।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—তোমার দাসীকে সঙ্গে দিলে না কেন?

ফুল্লরা বলিল,—মানুষ যে যেমন হোক, তাকে প্রকাশ্যভাবে সন্দেহ করতে আমার বাধে।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—Still a child!

ভৎ'সনা? না, গঞ্জনা?…

ফুল্লরা কিছু বলিল না, সুশীল চাটার্জী কহিলেন—কোথায় গেল?

—জানি না। গগনকে বলে দিয়েছি,—দিদিমণির শরীর খারাপ, কোথাও যেন না নামেন, দেখো।

গগন ড্রাইভার। রোজা বেড়াইতে গিয়াছে গগনের গাড়ীতে।…

সুশীল চাটার্জী গিয়া নিজের ঘরে বসিলেন। ফুল্লরা বারান্দায় বসিয়া রহিল। একখানা বিলাতী নভেল পড়িতেছিল,—বইয়ে মন লাগিল না।

পাশের বাড়ীতে রেডিও-শেটে গান চলিয়াছে…

কি চেয়ে হায়, কিসের লোভে
বেরিয়েছিলেম পথের পরে…

সুশীল চাটার্জী উৎকর্ণ রহিলেন। কোন্ হতভাগ্যের গান এ…

আকাশে বাতাসে যেন তরঙ্গ বহিল! বহু বৎসর আগেকার স্মৃতি সে তরঙ্গে ভাসিয়া আসিল। সেই প্রথম যৌবন…তখন ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন সব-চেয়ে বড় হইয়া মনে জাগিত! সে সম্পদকে ঘিরিয়া কি প্রকাণ্ড জনতা…সে জনতা ঠেলিয়া কল্যাণীর বেশে রূপসী জীবন-সঙ্গিনী…

কিন্তু পয়সার প্রমত্ত নেশায় জীবন-সঙ্গিনীকে ঠেলিয়া গৃহ-কোণে কোথায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন…

গান চলিয়াছে,—

> চেয়েছি যা, পেলেম না তায়!
> ছিল যা, তা গেল কোথায়?
> আজ নাই রে পুঁজি, বিরাম খুঁজি—
> দু'নয়ন জলে ভরে!

সুশীল চাটার্জ্জী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—মন ভারী হইয়া উঠিল। গানের কথায়-সুরে মন এমন হইয়া ওঠে! মানুষের লেখা গান—সে গান মানুষ গাহিতেছে···

তাঁর মনের অতি-গোপন কথা কে যেন জানিয়া ফেলিয়াছে! গানের ছন্দ্রে ছন্দ্রে সে কথা জাগিয়া আজ সারা আকাশ-বাতাস ভরাইয়া দিয়াছে!···

অস্বস্তিতে মন ভরিয়া উঠিল।

ফুল্লরা বারান্দায় বসিয়াছিল কৌচে। বারান্দায় আলো নাই। এ গান তার মনকেও তরঙ্গ-দোলায় উচ্ছ্বসিত উদ্বেল করিয়া তুলিল। মনে যেন ঝড় বহিতেছে! সে ভাবিতেছিল, কি? কি? জীবনে আমি কি চাহিয়াছি? কি আমি পাই নাই? কি ছিল···যাহা হারাইয়া নিঃস্ব রিক্ত পড়িয়া আছি? তার চোখের পাতা সজল—নয়নের দৃষ্টি উদাস···

সুশীল চাটার্জ্জী আসিয়া ডাকিলেন,—ফুল!

একটা নিশ্বাস। নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল্লরা চাহিল স্বামীর পানে। মনে হইতেছিল, স্বামীর হাত ধরিয়া বলে, ওগো, নিজেকে বড় একা, বড় নিঃস্ব মনে হইতেছে, বড় অসহায়···! পারো তুমি মনের এ-নিঃসঙ্গতা ঘুচাইয়া এ-মনকে ভরিয়া তুলিতে?

সুশীল চাটার্জ্জী কৌচে বসিলেন ফুল্লরার পাশে···তার হাত নিজের

হাতে তুলিয়া লইলেন, বলিলেন—মন আজ তোমাকে চাইছে। আমার সঙ্গে কথা কও। এমন কথা কও, যাতে আনন্দ পাই···

ফুল্লরা কহিল—কি কথা কইবো ?

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—জানি না।···তবে এমন কথা শুনতে চাইছি···যে-কথা শুনে পুরোনো দিনগুলোকে ফিরে পাবো···যেদিন এত অস্বস্তি ছিল না! ছিল শুধু সুখ, স্বস্তি, আশা!

ফুল্লরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, জবাব দিল না।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—কি কথা···বুঝতে পারচি না। তবে সে কথা বাস্তব জগতের নয়···সে কথা মানুষ মনে মনে রচনা করে প্রথম যৌবনে···জীবনে যখন বসন্ত জাগে···

ফুল্লরা একটা নিশ্বাস ফেলিল।···তার মনও চাহিতেছিল এমন কথা··· যে-কথার সুরে সুরে চাওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়!

কিন্তু জানা নাই! সে কথা সে জানে না···কি চায়, তাও জানে না! কখনো এ চাওয়ার হিসাব কষিয়া দেখে নাই। জীবনের এতখানি পথ আসিয়াছে শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটিয়া, অন্ধের মতো দু'নয়ন বন্ধ করিয়া!···

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—বেশ, কথা না কও, চুপ করে দুজনে বসে থাকি, এসো···এমনি হাতে হাত রেখে। আমার বড্ড ভাল লাগছে··· তোমার পাশে এমনি ভাবে চুপ করে' বসে থাকতে!···

দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল···পাশের বাড়ীর যন্ত্রটাকে সজীব করিয়া সুরের পর সুরের ধারা বহিয়া চলিয়াছে···

কিন্তু সে সুর প্রাণে পৌঁছিল না। প্রাণ তখনো সেই আগেকার গানের কথা ধরিয়া হাহাকার করিতেছে···

স্বপ্নের আবছায়া···মাটীর পৃথিবী পায়ের নীচে হইতে সরিয়া গিয়াছে!···

নীচে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল···গাড়ীর দরজা বন্ধ হইল। বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল রোজা···

ডাকিল,—পিশিমা···

সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা আসিয়া জানাইল, এটর্ণিবাবু আসিয়াছেন কাগজ-পত্র লইয়া।

স্বপ্ন-পুরী ফাঁশিয়া গেল। সুশীল চাটার্জীর চমক ভাঙ্গিল···ভাবিলেন, বইয়ের নায়ক সাজিয়া জল-জ্যান্ত মানুষ এভাবে মেলোড্রামার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন! জীবন স্বপ্ন নয়···সত্য! বড় কঠিন কঠোর নির্ম্মম সত্য!···গানের সুরে কথায় সত্যকার এ জীবনকে গড়িয়া তোলা যায় না।

দু'তিন দিন পরের কথা।

ফুল্লরার খেয়াল হইল, ঘর-দ্বার গুছাইবে। চুপচাপ এভাবে বাস করা চলে না। আর পাঁচ ঘরের গৃহিণীর মতো সে ঘর-দ্বারের পরিচর্য্যা করিবে। চির-পরিচিত ধারায় নারী-জন্মের সার্থকতা···

রোজার ঘরে আসিয়া দেখে, রোজার ঘর বিশৃঙ্খল! ড্রেসিং-টেব্‌লের ড্রয়ার খোলা···আলমারি খোলা···বিছানার উপর কখানা সিল্কের শাড়ী পড়িয়া আছে···আয়নার উপর পাউডার···

ঘরে যেন ঝড় বহিয়া গিয়াছে!

ফুল্লরা গুছাইতে লাগিল। ড্রয়ারের মধ্যে এক-তাড়া কাগজ···চিঠি-পত্র···

সেগুলা গুছাইয়া রাখিতে গিয়া দৃষ্টি পড়িল ক'খানা ফটোগ্রাফে। পুরুষের ছবি। তরুণ মূর্ত্তি। অপরিচিত মুখ···সাত-আটখানা ফটোগ্রাফ।

ফটোর নীচে কোনোটায় লেখা—**Wishing you always by my**

side···কোনোটায় লেখা—Till we meet···কোনোটায়—With a thousand kisses···

ফুল্লরার মাথায় রক্ত ছলাং করিয়া উঠিল। চোখের সামনে রাশি রাশি অন্ধকার! একখানা চিঠি···চিঠিতে লেখা ক'টি ছত্র—My wonderful Bob···

রোজার হস্তাক্ষর। ফুল্লরা চিনিল।

পৃথিবী তার সমস্ত কলরব-কোলাহল লইয়া দূরে সরিয়া চলিয়াছে ···ফুল্লরা যেন কোন্ নিরন্ধ্র-অন্ধকার পাতালের গর্ভে নামিয়া চলিয়াছে··· তার চেতনা যেন বিলুপ্ত হইতেছে···

রোজার স্বরে চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিতে ফুল্লরা শুনিল রোজা বলিতেছে—এ ভাবে গোয়েন্দাগিরি···আমি ঘৃণা করি···আমার confidential চিঠিপত্র তুমি কি বলে' ঘাঁটো?···আশ্রয় দেছ বলে' এতখানি জুলুম! না, না, এ আমি সহ্য করবো না··· কখনো না।

বলিতে বলিতে ফুল্লরার হাত হইতে ফটো ও চিঠিপত্রগুলা রোজা সবলে ছিনাইয়া লইল।

ফুল্লরার সারা দেহ কাঁপিতেছিল···ফুল্লরা ডাকিল,—রোজা···

তীব্র ঝঙ্কারে রোজা বলিল,—না। এ সম্বন্ধে কোনো কথা আমি শুনবো না···I call it a shame···it is wicked···I call it an outrage! (এ তোমার অন্যায় অত্যাচার!)···আমার বয়স হয়েছে···আমার ভালো-মন্দ আমি নিজে বুঝি। কারো হিতোপদেশ আমি মানবো না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চক্র

ঝাঁজিয়া বকিয়া নাচিয়া মাতিয়া রোজা একশা করিয়া তুলিল ; তারপর কৌচে বসিয়া পড়িল। বসিয়া ফুল্লরার পানে চাহিয়া ফুঁশিতে লাগিল—দুই চোখে যেন মশাল জ্বলিতেছে !

ফুল্লরা তার পানে চাহিয়াছিল। প্রশান্ত দৃষ্টি। চিন্তার পর চিন্তা হু-হু বেগে মনের উপর দিয়া উড়িয়া বহিয়া চলিয়াছে···

এমনিভাবে প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল। রোজা দু'হাতে মুখ ঢাকিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল্লরা ডাকিল,—রোজা···

রোজা ফুঁপাইতেছিল,—ফুল্লরার আহ্বানে মুখ তুলিল, বলিল—কি ?···বকবে ?

ফুল্লরা কহিল—বকবো না। বকিনি। ও-সব চিঠি যদি আমায় তুমি দেখাতে, তাহলে লজ্জা পেতে।···আমি দেখেচি বলে তুমি লজ্জা বোধ করচো, তাহলে বুঝচো, এ চিঠি তোমার পাবার মতো নয় !

রোজা বলিল—আমার বয়স হয়েচে। কি চিঠির কি মানে হয়, তা আমি বুঝি।

—বোঝো যদি, তাহলে এ চিঠি জমিয়ে রেখো না। পুড়িয়ে ফ্যালো। এ-সব চিঠি রাখবার নয়। পুড়িয়ে চিঠির কথা ভুলে যাও।

রোজা কোনো জবাব দিল না···তার দুই ঠোঁট কাঁপিতেছিল।

ফুল্লরা রোজার পাশে বসিল, তাকে এক-রকম বাহুর ঘেরে ঘিরিয়া কহিল,—এ-সব চিঠি যারা তোমাকে লেখে, তারা তোমায় অপমান করে—তোমাকে নোংরা চোখে দেখে, হীন দেখে। এটুকু এখন ঝোঁকের মাথায়

বুঝতে পারচো না···কিন্তু পরে বুঝবে। আমি তোমায় বকিনি। ···এখনো তুমি ছেলেমানুষ—পৃথিবীর খপর কতটুকু জানো?···

ফুল্লরা চুপ করিল; একটা নিশ্বাস ফেলিল।

রোজা এবারও কোন জবাব দিল না।

ফুল্লরা বলিল—একটা কথা না বললে নয় রোজা, তাই বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে।···

আবার খানিক চুপ-চাপ···তারপর বলিল—তোমার মায়ের জন্য মন কেমন করে না? তোমার বাবার কথা মনে হয় না?

মা···বাবা···তাহাদের কথা কেন আসে? রোজা কৌতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরার পানে চাহিল। ফুল্লরা বলিল—তোমার বাবাকে তুমি ভালোবাসো নিশ্চয়। তিনিও তোমায় ভালোবাসেন। এখানে টাকা পাঠাচ্ছেন তোমার জন্য। ভালো যদি না বাসবেন, তাহলে টাকা কেন পাঠাবেন? তোমার কোনো খপর না নিলেই পারতেন!···

এ কথার অর্থ রোজা বুঝিল না।

ফুল্লরা বলিল—তোমার মা তোমায় ছেড়ে চলে গেছেন···কেন? কার সঙ্গে?···তোমার কি সে সব ভালো লাগে? আজ যদি তোমার মা কাছে থাকতেন···?

মায়ের কথা রোজার মনে পড়িল। প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। সত্য, মা যদি চলিয়া না যাইত! মা চলিয়া গেছে বলিয়াই চারিদিককার সব বাঁধন শিথিল হইয়া কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সব কথা পিশিমা কেন তোলে?

ফুল্লরা বলিল—তোমার বাবা তোমাকে সেখানে নিজের কাছে না রেখে এখানে রেখে গেলেন কেন? তিনি একা তোমায় দেখতে পারবেন না বলেই তো? ছেলেমানুষ···তোমাদের দেখা দরকার—তাই।···এখানে

তামার কোনো ব্যাপারে নিষেধ বা শাসন নেই···শুধু এইটুকু মনে রাখো, যারা তোমায় এ রকম চিঠি লেখে, তাদের সঙ্গে মেশা উচিত য়। তুমি ভদ্র-ঘরের মেয়ে···তোমার নিজের মান-ইজ্জৎ আছে। বন্ধু-রিচয়ে তোমার সে মান-ইজ্জতে এরা আঘাত দেবে—সেটা গৌরবের থা নয়।

এবারে রোজার কথা কহিল, বলিল,—মান-ইজ্জতে আঘাত?

ফুল্লরা বলিল,—তাই।

রোজা কহিল—এরা আমার বন্ধু!

ফুল্লরা বলিল—এ বন্ধুত্ব হলো কোথায়? কি করে? তারা তোমার ঙ্গে এক ক্লাশে পড়ে না।

রোজা বলিল—আমার ক্লাশে যে-সব মেয়ে পড়ে, এদের মধ্যে কেউ াদের ভাই, কেউ বা ভাইয়ের বন্ধু। একসঙ্গে গান-গল্প হয়। আমাদের গলো লাগে···

ফুল্লরা অবিচল দৃষ্টিতে রোজার পানে চাহিয়া রহিল; কোনো জবাব দিল না।

রোজা বলিল,—মানুষ একলা ঘরের কোণে বসে থাকতে পারে না। সে সঙ্গী চায়, বন্ধু চায়।

বাধা দিয়া ফুল্লরা বলিল—একটা কথা···

রোজা কহিল,—কি?

ফুল্লরা বলিল—এ সব বন্ধু তোমাদের স্কুলের কম্পাউণ্ডে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারে?

রোজা বলিল—স্কুলে ক্লাশ হচ্ছে, সেখানে আলাপ করবার অবসর কোথায়?

ফুল্লরা কহিল,—স্কুল থেকে মেয়েরা সে দিন ষ্টীমারে করে শিবপুরে

গিয়েছিল পিকনিক করতে—এ সব বন্ধুকে নিয়ে যেতে পেরেছিলে? না, স্কুল-অথরিটি এদের সঙ্গে নিয়ে যেতে দিত?

রোজা জবাব দিল না।

ফুল্লরা বলিল—দিত না। কেন না, এ বয়সে অনাত্মীয় ছেলেদের সঙ্গে একা-একা তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়তো উচিত নয়।···কিন্তু সে কথা যাক, তোমায় যে ভাবে ওরা চিঠি লিখেচে, সে রকম চিঠি বন্ধুকে কেউ লেখে না। বিশেষ ভদ্র ঘরের মেয়ে-বন্ধুদের।

—সে-চিঠি তুমি পড়েছো?

—না। চিঠি পড়িনি। এক-আধ ছত্র মাত্র চোখে পড়েছে। ওদের ফটোগ্রাফ তোমায় কেন ওরা পাঠায়, বলতে পারো রোজা?

—তাতে কি ক্ষতি হয়েছে? বন্ধু...বন্ধুর ফটো পাঠিয়েছে বন্ধুকে।

ফুল্লরা কহিল—আমি তোমায় যা জিজ্ঞাসা করেছি, তার জবাব দাও। বলো, কেন পাঠায়? আগে জবাব দাও। ক্ষতি আছে কি না, সে কথা পরে হবে।...আমি তোমার শত্রু নই...তোমার ভালো চাই!··· এদের সঙ্গে যদি তুমি হল্লা করে বেড়াও, তাতে আমার কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট হবে না—তাও বোঝো! এখন আমার কথার জবাব দাও··· বলো, এরা ফটো পাঠায় কেন?

কথা বাধিয়া গেল···মাথায় যেন রক্ত-স্রোত উছলিয়া উঠিল। ফুল্লরার পানে রোজা চাহিতে পারিল না—মুখ ফিরাইল।

ফুল্লরা কহিল,—বলো···

রোজা বলিল—তুমি জিজ্ঞাসা করচো···কিন্তু না, নিশ্চয় তুমি আমার চিঠি পড়েছো।···পড়োনি? বলো সত্য করে···

রুক্ষ গম্ভীর স্বরে ফুল্লরা কহিল—আমি মিথ্যা কথা বলি না, রোজা।···

রোজা সে স্বরে ভড়কাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

ফুল্লরা কহিল—তুমি যখন বলতে পারচো না, তখন আমার উচিত, চিঠি পড়া।…পড়বো ?

—না, না…

রোজার স্বর উচ্ছ্বসিত। সে কহিল—না। ও-সব আমার প্রাইভেট চিঠি। প্রাইভেট চিঠি আমি তোমায় কি করে দেখাবো ? না।

রোজা উঠিল, উঠিয়া একেবারে গিয়া দাঁড়াইল খোলা খড়খড়ির ধারে।

রোজাকে বুকের কাছে টানিয়া শান্ত স্বরে ফুল্লরা কহিল,—শোনো রোজা, এ চিঠি তুমি নিজে আমাকে দাও, আমি পড়ি। চিঠি পড়ে বুঝতে পারবো, বাইরের অজানা পুরুষের সঙ্গে এ-রকম চিঠি-পত্র চলা উচিত কি না। যদি বুঝি, তা হলে তোমায় আমি বুঝিয়ে দিতে পারবো, এ চিঠি লেখা অন্যায় কেন ! একটা কথা শুধু ভেবে দেখো, এ-সব বন্ধুর সঙ্গে নিত্য তোমার দেখা হচ্ছে, কথাবার্ত্তাও চলছে,—তবু এমন কি কথা থাকতে পারে, যে-কথা সে-দেখায় হতে পারে না ? সে কথা আয়োজন করে চিঠিতে লিখে জানাতে হবে ? এমন সে চিঠি যে তোমার আপনার লোক-জনের সামনে তুমি বার করতে পারো না !

রোজা সব কথা শুনিল। কোন জবাব দিল না ; শুধু অবিচল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

ফুল্লরা বলিল—এ চিঠি যদি আমায় দেখাতে না পারো, তাহলে আমার চোখের সামনে এ-সব চিঠি পুড়িয়ে ফ্যালো। এখনি।

রোজা আবার ফুঁশিয়া উঠিল এবং ফুল্লরার বাহু-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সঝঙ্কারে বলিল—না, ও চিঠি আমি দেখাবো না।

—তাহলে পুড়িয়ে ফ্যালো।

রোজার চোখে আবার সেই অগ্নিময় দৃষ্টি ! ঘরের চারিদিকে সে তাকাইল, কহিল—এখানে কোথায় চিঠি পুড়োবো ?

ফুল্লরা বলিল—চলো বারান্দায়। আমি দিয়াশলাই আনিয়ে দি।

রোজা নিশ্বাস ফেলিল ; তারপর চিঠির রাশি জড়ো করিয়া ফুল্লরার পানে চাহিল।

ফুল্লরা বলিল—ফটোগ্রাফগুলোও ঐ সঙ্গে পোড়াও। কোথাকার কে কক্স, হার্ডি, সনাতন হাজরা, কার্ল স্থইন্টন—এরা তোমার বন্ধু হতে পারে না—তোমায় এভাবে চিঠি লিখে ছবি পাঠিয়ে অপমান করতেও পারে না!

রোজা যেন কি-মন্ত্রে বশীভূত হইয়াছে! নিঃশব্দে সে ফটোগুলো হাতে লইল।

ফুল্লরা বলিল—এসো।

রোজা আসিল ফুল্লরার ইঙ্গিতে। বারান্দায় আগুন জ্বলিল এবং সে আগুনে রোজা চিঠির রাশি ছিঁড়িয়া কুচি-কুচি করিয়া আহুতি দিল। সেই সঙ্গে দুখানা ফটোগ্রাফও। একখানা সেই এন কক্সের—শীষ দিতে দিতে যে-ছোকরা এ বাড়ীর ফটকে আসিয়া কার্ড পাঠাইতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

নিমেষে সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। উজ্জ্বল অগ্নিশিখা চকিতে কালো ধূম-ভস্মে মিলাইয়া অদৃশ্য হইল। রোজা কাঁদিয়া উঠিল : এ সে কি করিয়াছে! নিমেষের খেয়ালে তার জীবনের আনন্দদীপ এমন করিয়া নিবাইয়া দিল! কাণের কাছে সেই অজস্র স্তুতি,...ভালোবাসা, ভালোবাসা, বাহুর উদগ্র আবেগ...

রোজার মনে হইল, নিমেষের দুর্ব্বলতায় নিজেকে সে এমন করিয়া নিজের সব পাওয়া-সমেত বিসর্জ্জন দিয়া বসিল!

ক্ষোভে অপমানে কাঁদিয়া সেইখানে সে লুটাইয়া পড়িল।

ফুল্লরা ডাকিল,—রোজা...

রোজাকে বুকে টানিয়া লইবার জন্য ফুল্লরা দু'হাত বাড়াইল। সবলে

ফুল্লরার হাত সরাইয়া দিয়া রোজা বলিল—না, না, কোনো কথা শুনবো না আমি। তোমাদের বাড়ীতে আছি···তোমার হুকুম তো আমি তামিল করেছি! আবার কেন? আরো কি চাও? দাও, আমার হাত ছেড়ে দাও···

কথাটা বলিয়া চকিতে উঠিয়া বারান্দা ছাড়িয়া ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া সে সেদিক হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নিঃসঙ্গ

গৃহে রহিল না। পায়ে হাঁটিয়া রোজা বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। নিরুপায় দৃষ্টিতে একতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ফুল্লরা সে দৃশ্য দেখিল।

এ যেন দু'পেনি দামের লক্ষ্মীছাড়া উপন্যাসের ঘটনা গৃহমধ্যে ঘটিয়া চলিয়াছে!

বারান্দার রেলিঙে হাতের ভর রাখিয়া ফুল্লরা দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি, এ কি কাণ্ড! মেয়েরা স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবে, তার স্বাধীন সত্ত্বা থাকিবে—সে দাসী নয়, বাঁদী নয়,—এ-কথা কে না স্বীকার করে? তা বলিয়া এমন বেচাল, বিশ্রী আচরণ! নিজের মান-ইজ্জতের পানে লক্ষ্য নাই! নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়া যার-তার সঙ্গে হল্লা করিয়া বেড়ানো!

রোজা যদি নিজের মেয়ে হইত? কথাটা মনে উদয় হইবামাত্র ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল। রোজা পর নয়—মায়ের পেটের ভাই নিশানাথ! তার

মেয়ে রোজা। নিজের মেয়ে আর দাদার মেয়ে—দুজনে তফাত্ কতটুকু!

এ কথা স্বামীকে বলিবে। বলা প্রয়োজন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ···

নিরুপায় বিপদে স্বামীর কথা মনে পড়িল। স্বামী-ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কাহারও সঙ্গে পরামর্শ চলে না।

সন্ধ্যার পর সুশীল চাটার্জী ফিরিলেন, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তাঁর পিছনে আসিল দু'তিন জন এটর্ণি ও মক্কেল। তাঁহাদের পরামর্শ চুকিল, রাত্রি তখন দশটা।

বসিয়া বসিয়া ফুল্লরা শ্রান্ত হইয়া পড়িল। দশটার পর সুশীল চাটার্জী আসিয়া বলিলেন—চুপ করে বসে আছো যে!

ভোজন-কামরা। ফুল্লরা বলিল,—এমনি।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—আজ বড্ড খাটুনি গেছে—কালও তাই, পরশুও এমনি খাটুনি! মানে, তিন দিন এখনও···

তিনি ভোজনে মনোনিবেশ করিলেন। ফুল্লরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিঃসঙ্গতার বেদনা কাঁটার মতো বুকে বিঁধিতে লাগিল।

নিঃসঙ্গ সে চিরদিন। তবু আজ সারাক্ষণ স্বামীর সঙ্গ-কামনায় মন ভয়ঙ্কর আকুল অধীর হইয়া আছে।

সেদিকে স্বামীর লক্ষ্য নাই! দেখিলেন, ফুল্লরা ম্লান মুখে বসিয়া আছে। তবু···

আয়নায় সে নিজের মুখ দেখিয়াছে—এমন পাণ্ডুর মলিন ছায়া তার মুখে পড়িয়াছে...সারা অবয়বে···স্বামীর সেদিকে লক্ষ্য পড়িল না!

নারী ও পুরুষের সাম্য! পুরুষই এ-কথা বলে। সে মুখের কথা! বলে, নারীর মন-প্রাণ, স্বাধীন সত্তা! ও-সব শুধু মুখের কথা! এই যে ফুল্লরা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ম্লান মলিন মুখ, জগতের বিপুল নিঃশব্দতার আবরণে

নিজেকে ঢাকিয়া মুড়িয়া···স্বামী দ্বিতীয় প্রশ্ন তুলিলেন না...কেন? ওগো, কেন? তোমার কি হইয়াছে?

বুকখানা প্রচণ্ড ব্যথায় দুলিয়া উঠিল।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—খুব একটা complicated মকর্দ্দমা... আইনের ভয়ঙ্কর technicality...রীতিমত পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

ফুল্লরা যেন কাঠের পুতুল···কথাগুলা তার মনের কোণেও প্রবেশ করিল না।

সুশীল চাটার্জ্জী তার পানে চাহিলেন, বলিলেন—কি ভাবচো?

ফুল্লরা একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—একটা কথা ছিল···

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—কি কথা, ফুল?

ফুল্লরা বলিল—রোজার সম্বন্ধে...

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—হ্যাঁ ভালো কথা, আজ কোর্টে তোমার দাদার টেলিগ্রাম পেয়েছি···দু তিন দিনের মধ্যে তিনি এখানে আসচেন। দেবো তোমায় সে টেলিগ্রাম?...আর কোন কথা নেই···শুধু আসচেন—এই খপরটুকু মাত্র।·· তা, রোজা কি করেচে?

কথার স্বরে তেমন আবেগ নাই। ফুল্লরা বুঝিল, মকর্দ্দমার খুঁটিনাটি চিন্তায় স্বামীর মন এখন ভরিয়া আছে।

নিশ্বাস রোধ করিয়া ফুল্লরা বলিল—থাক, অন্য সময় বলবো'খন।

—তাই বলো। মনে আজ আর কোন কথা ঢুকচে না যেন···

স্বামী আহার করিতে লাগিলেন। ফুল্লরা বসিয়া রহিল।

ভোজন-শেষে স্বামী উঠিলেন, বলিলেন,—তুমি শুয়ে পড়ো গে... আমার আজ নিয়মের ব্যতিক্রম, এখনো দু'চারখানা বই ঘাঁটতে হবে।

স্বামী চলিয়া গেলেন। ফুল্লরা কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে দোতলায় আসিল।

ঘরের সামনে প্রশস্ত বারান্দা। জ্যোৎস্নার আলোয় ভরিয়া গিয়াছে।

ফুল্লরা চুপ করিয়া বারান্দার কৌচে বসিয়া রহিল। সমস্ত পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধের স্পর্শহারা হইয়া যেন পাথরের কঠিন গোলার মতো দুই চোখের সামনে ঘুরিতেছে···ঘুরিতেছে! সে পৃথিবীর কোথাও যেন এতটুকু প্রাণ নাই...কিছু নাই!...

সুশীল চাটার্জীর আহ্বানে ফুল্লরা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—এখানে বসে ঘুমোচ্ছ!

ফুল্লরা কহিল—বড্ড ক্লান্তি বোধ করছিলুম।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ো···ঘুমোলে আরাম পাবে।...

ফুল্লরা বলিল—একটু পরে শুতে যাবো। এখানে বেশ ভালো লাগচে। বাতাস আছে···জ্যোৎস্না···

হাসিয়া সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—সত্যি, **you look so tempting**···

সুশীল চাটার্জী মুখ নত করিলেন। ফুল্লরা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন— **Hearts divided.** (দুটি হৃদয় দূরে-দূরে আছে!)

কথাটা ফুল্লরার মনের কোথায় বিঁধিল—সে কোনো কথা না বলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

মৃদু হাস্যে সুশীল চাটার্জী বলিলেন—হারা হৃদয় দুটির মিলন হোক অধর-পাতে!

সুশীল চাটার্জীর দুই চোখে আবেশ-বিহ্বলতা! অধরে পিপাসার আভাস!

ফুল্লরার বুকের মধ্যে আহতা, উপেক্ষিতা নারী বসিয়াছিল—সে ফুলিয়া ফুঁশিয়া উঠিল,—বটে. আমি মায়াবিনী! তোমার এখন ভালো লাগিয়াছে বলিয়া···

ফুল্লরা কহিল—না···

সে সরিয়া গেল, বলিল—No hearts···we are mere heads··· without hearts. আমাদের হৃদয় নাই। আছে শুধু মস্তিষ্ক চিন্তা বুদ্ধি!

কথাটা বলিয়া ফুল্লরা চলিয়া গেল নিজের ঘরে।

···সুশীল চাটার্জী চুপ করিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইতেছিল, স্বামী-স্ত্রী···পাশাপাশি বাস করিয়াও দুজনে রহিয়া গেছি যেন ক্ষণেকের বন্ধু! জীবনে কি চাহিয়াছিলেন, কি পাইলেন?

টাকা-রোজগারের যন্ত্র-মাত্র! টাকা আসিতেছে হুড়হুড় করিয়া···সে টাকার বিপুল ভারে মন চাপা পড়িয়া গিয়াছে! এই কি জীবন?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নব সমস্যা

সকালে নূতন উপদ্রব। ছবি আসিয়া হাজির। ফুল্লরার মনের অবসাদ এখনো কাটে নাই।

রোজার ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। রোজা এখনো বিছানায় পড়িয়া আছে।

সেই যে বাহির হইয়া গেল, কখন বাড়ী ফিরিল?

ফুল্লরা সংবাদ লইবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছে, এমন সময় ছবি আসিয়া উপস্থিত। তার সঙ্গে একগাদা লগেজ।

ছবি বলিল—দু'দিন আশ্রয় দিতে হবে, ভাই। আমি শুধু শ্রান্ত নই…আর্ত্ত, আতুর।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফুল্লরা তার পানে চাহিয়া রহিল। মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না।

ছবি বলিল,—একটু নিশ্বাস নিতে দে…যে-ঝড়ের মধ্য থেকে আসছি…

ব্যাপার কি? পৃথিবীর বুকখানা ফাঁশিয়া গিয়াছে? সে রন্ধ্র-পথে রাজ্যের অঘটন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চায়? তাছাড়া ছবির চিরদিন কাটিবে একই ভাবে?

শান্ত হইয়া ছবি তার কাহিনী বলিল।

ক'মাস পূর্ব্বের কথা। ছবির একটি ছেলে হইয়াছিল। সে ছেলে ক'দিন মাত্র বাঁচিয়াছিল। কিন্তু সেই ক'দিনেই ছবির মনে যে রেখা টানিয়া গিয়াছে …

এক মাস পূর্ব্বে লাহোরের এক ফিল্ম-কোম্পানি আসিয়া ছবিকে বলে তাদের ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় নামিতে হইবে। পাঁচ হাজার টাকা দিবে। ছবিতে ও-অঞ্চলে ছবি খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ছেলেটি মারা যাইবার পর ছবির মন ভাঙ্গিয়া যায়; পড়িয়াছিল নিজের ঘরে…বাহিরের সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়া দিয়া। লাহোরের আহ্বানে সে ভাবিল, শোকের মোহ ঘুচাইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে। আনওয়ার আপত্তি তুলিল, বলিল—ছেলে হইবার পর আনওয়ার ঠিক করিয়াছে, ছবি তার স্ত্রী হইয়া ঘরে থাকিবে—লোকের ভিড়ে আর অভিনয় করিতে নামিবে না! স্ত্রীকে আনওয়ার অভিনয় করিতে দিবে না। বিশেষ তার সঙ্গে যে-কোম্পানির যোগ নাই, তাদের দলে মিশিয়া।

ইহা লইয়া রীতিমত তর্ক চলে। আনওয়ার বলিল,—আমার মান-মর্য্যাদার কথা ছেড়ে দি…মনে আঘাত লাগবে।

ছবি জবাব দিল—তোমার নিজের কাজ নিয়ে তুমি থাকতে পারো—আর আমি মেয়ে-মানুষ বলে আমার এ-শক্তি নিয়ে আমি পড়ে থাকবো পুতুলের মতো ঘরের কোণে?

আনওয়ার বলিল,—আমি থাকবো বোম্বাইয়ে, তুমি থাকবে লাহোরে। সংসার?

ছবি বলিল—গেলে কি অপরাধ হবে?...আমার কোনো স্বাধীনতা থাকবে না...তোমার স্ত্রী হয়েছি বলে এমন দাস্য করতে হবে? আমি স্ত্রীলোক...কিন্তু আমার যে-শক্তি আছে, তার জোরে খ্যাতি পেয়েছি। পুরুষ হলে যেতে কোনো বাধা থাকতো না! মেয়ে-মানুষ বলেই আমার শক্তি আমি খাটাতে পাবো না!

আনওয়ার বলিল—পুরুষ-মানুষ চির যুগ ধরে কাজ করে আসছে। দুজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন-ধারা ভিন্ন রকমের।

ছবি বলিল—পুরুষ বলে জীবনকে নানা দিক দিয়ে তোমরা সার্থক করবে, আর আমি মেয়ে-মানুষ, তাই...

অর্থাৎ ছবি নারী, তাই তার নিজের শক্তি, সাধ, আশা, আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও সে শক্তি, সাধ-আশা তাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। নিজের সব সাধ-আশাকে স্বামীর সাধ-আশা-আকাঙ্ক্ষার নীচে চাপিয়া রাখিয়া শুধু স্বামীর আরাম আর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে!

ছবি বলিল—আমার ভবিষ্যতের দ্বারে তালা এঁটে আমায় থাকতে হবে! আমি মেয়ে-মানুষ, তাই সে দ্বার খুলে চলায় আমার নিষেধ। মেয়ে-মানুষের সামনে ফটক বন্ধ! পুরুষের সামনে শত ফটক খোলা! পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও পুরুষ যে-কোনো ফটকে ঢুকতে পারে বিশ বৎসর বয়সের আশা-আকাঙ্ক্ষা মনে নিয়ে। মেয়ে-মানুষ তা পারে না!

সে যেন পোষা কুকুর···তার গলায় থাকবে শিকল···তার গতি হবে মনিবের ইচ্ছাধীন!···

এমনি তর্কে বিব্রত হইয়া লাহোরের লোককে সে বিদায় দিয়াছে। স্বামী আনওয়ার বলে,—এখন বয়স হইতেছে—এখন অভিনয় করিয়া টো-টো করিয়া ঘুরিলে চলিবে না। সংসারের দিকে মন দিতে হইবে। সংসার গড়িয়া তুলিতে হইবে। তার উপর মেয়ে-মানুষের পক্ষে একা পথ চলায় নানা বিপদ। অর্থাৎ···

কথাটা বলিয়া ছবি হাসিল।

এ-সব কথা তার ভালো লাগে না। তাই স্বামী পুনায় চলিয়া যাইবা-মাত্র সে এখানে আসিয়াছে। দুদিন এখানে থাকিয়া শ্রান্ত অবসন্ন দেহ-মনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে; তারপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া···

ছবি বলিল, মামুলি ধরণে ঘরের কোণে বসিয়া থাকা···আর যে পারে, পারুক! সে পারিবে না।

এ-কথার উপর বলিবার কিছু নাই···ছবি আশ্রয় চাহিতেছে। বলিবার কথা থাকিলেও এখন কোনো কথা বলা চলে না। ফুল্লরা কোনো কথা বলিল না।

ছবি রহিয়া গেল।

থাকিয়া থাকিয়া ফুল্লরার মনে দারুণ অবসাদ জাগে। এত লেখা-পড়া শিখিয়াও জীবনটা কি হইয়া গেল! একেবারে এলোমেলো! চিরদিনের মতো সংসারকে আশ্রয় করিয়া যারা পড়িয়া থাকে, তাদের পানে সে চাহিত করুণার দৃষ্টিতে। জীবনের অর্থ বোঝে না, উদ্দেশ্য বোঝে না,—কোনোমতে দাস্য করিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। এত জানিয়াও নিজে সে কি পাইয়াছে?

স্কুলের কাজ, সভা-সমিতির কাজ, দেশের কাজ—কোন্‌টায় না

হাত দিয়াছে! যেন যন্ত্রের মতো!...একটা উত্তেজনা...একটা হুজুগ... একটা মাতন! দেশ যেখানকার, সেইখানে আছে! সভা-সমিতিতে সেই একই ধারায় বক্তৃতা আর চাঁদা চলিয়াছে! তাহাতে কার কি লাভ? নারী-রক্ষা-সমিতি! এ-সমিতিই বা কি করিয়াছে? কোনো বুদ্ধিহীনা নারীকে নিজের দেহ-মনের ইজ্জৎটুকু পর্য্যন্ত শিখাইতে পারিল না! স্কুল? মন যেখানে ছোট রহিয়া গেল, কতকগুলা বইয়ের পড়া সেখানে জোর করিয়া গিলাইয়া দিলে কি লাভ হইবে? ছবি! লেখাপড়া যতখানি করিয়াছে, তার ফলে নিজের জীবনকে লইয়া যেন ফুটবল খেলিয়া বেড়াইতেছে! ইভা! কোনোদিন ইন্‌সিওরেন্সের কাজ করিতে ছুটিয়াছে, কোনোদিন বা বন্যার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে! আর রোজা?

ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল। নিজেকে কোন্ পথে মত্ত আবেগে ছুটাইয়া দিয়াছে!

রোজা বলিল, আরাম পায়! কিসের আরাম? সিনেমা? মোটরে বেড়ানো? সে আমোদ তো তার নিজের আয়ত্তে আছে! তবে...?

একদল পুরুষ কাণের সামনে স্তুতি-গান করে—তাহাতে ভুলিয়া এমন করিয়া...

নিজের মনের অলি-গলির সে সন্ধান লইল। জীবনকে গুছাইয়া চালাইতে পারিয়াছে, এ-কথা বলা চলে না। তবু এমন উত্তেজনার ঝোঁকে উহাদের মতো...

গোড়া হইতে ভুল করিয়া বসিয়াছে? হয়তো তাই! সংসারে পা দিতে আসিয়া শিক্ষার গর্ব্বে স্বামীকে বলিয়াছিল, equal partnership!

কিন্তু ঘর-সংসার কি সত্যই দোকানের পার্টনারশিপ?

স্নেহ, মায়া, মমতা...?

সেগুলা নিষ্ফল হইবে বলিয়া মানুষের মনে স্থান পায় নাই, সত্য !

স্বামীই বা তাকে কবে কাছে ডাকিয়াছেন ? প্রেমের কথা আবেগ-ভরে কবে বলিয়াছেন ? বিবাহ হইয়া অবধি দেখিতেছে, স্বামী তাঁর ব্রীফ আর মক্কেল লইয়া মত্ত আছেন সারাক্ষণ ! এ সংসারের প্রবেশ-পথ-মুখে বলিয়াছিল—equal partnership ! জীবনকে না জানিয়া জীবনের সব হিসাব-নিকাশ সে সারিতে বসিয়াছিল !···তা কখনো হয় ?

লাইন কাটিয়া জীবনের পথ এখানে একেবারে নির্দ্দিষ্ট করা আছে··· একটু সরিয়া চলিয়াছ, কোথায় কত দূরে গিয়া পড়িবে, তার আর ঠিক-ঠিকানা নাই ।

পাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে মন দিয়া নিজেকে যদি সকলের সহিত সম্পর্কবিহীন রাখিত, হয়তো আজ এতখানি অস্বস্তি বহিতে হইত না !

বিবাহ করিয়া সংসারকে উপেক্ষা করা চলে না !···

বনলতা ! তাদের স্কুলে টীচারী করিত । ধ্যানে-জ্ঞানে জানিয়াছিল—স্বামী আর সংসার । হাসি-মুখে কতখানি তৃপ্তি বুকে লইয়া সে-সংসারে সে প্রবেশ করিয়াছে ।

জীবনকে সার্থক সফল করিতে আদর, সোহাগ, ভালোবাসা, প্রেমের মধুবাণী—এ-গুলার প্রয়োজন আছে বৈ কি···নহিলে যুগ-যুগ ধরিয়া মানুষ এগুলাকে এমন আদরে শিরোধার্য্য করিবে কেন ?···

দু'দিন পরে নিশানাথ আসিল । তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে ।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—ভগ্নীর সঙ্গে আলাপ করুন । আমি আজ সকাল-সকাল অতিথি বিদায় করি । তারপর আপনাদের দলে যোগ দেবো ।

সুন্দরা কহিল—দু'চার দিন থাকবে তো বড়দা ?

নিশানাথ বলিল—চেষ্টা করছি, বাকী ক'টা দিন এখানেই থাকবো ।

ফুল্লরা দাদার পানে চাহিল—দু'চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

নিশানাথ মৃদু হাসিল, হাসিয়া বলিল—অফিসের ব্রাঞ্চ খুলচে কলকাতায়। আমরা তিন জন এসেছি সে অফিসের ব্যবস্থা করতে। সীলোনের মায়া কেটেছে। বলেছি, আমার বাড়ী কলকাতায়; কলকাতাতেই যদি আমায় রাখো...বড় উপকার হবে। ডিরেক্টর বলেছে, সে ব্যবস্থা করবে।

ফুল্লরা কহিল—তাহলে বড় ভালো হয়। সত্যি, একা পড়ে আছো কোথায় কত দূরে,—তার উপরে এক জায়গায় থাকা নয়। আজ আছো ক্যাণ্ডিতে, কাল কলম্বো, পরশু চললে কোথায় সেই মরিশস! কেনই বা এমন ভবঘুরের মতো থাকো!

হাসিয়া নিশানাথ বলিল—না রে, এ হলো এ্যাডভেঞ্চার। জানিস তো, এ্যাডভেঞ্চারের নেশা আমার ছেলেবেলা থেকে!

ফুল্লরা বলিল—ছোটদার কোনো খপর জানো?

—না। তুই জানিস?

—কার কাছ থেকে জানবো? জানতে ইচ্ছা করে। ভাই-বোন তো···কিছুদিন থেকে সকলকে কাছে পাবার জন্য মন এমন লালায়িত হয়েছে।

নিশানাথ সিগার ধরাইল, তার পর বলিল,—রোজা বোধ হয় খুব জালাতন করছে?

ফুল্লরার বুকখানা ধ্বক করিয়া উঠিল। সে বলিল—এইখানেই তুমি থাকবে তো?

নিশানাথ কহিল—থাকবো?

—থাকো বড়দা, সত্যি···

ফুল্লরার স্বরে মিনতি। নিশানাথ বলিল—আমরা তিন জনে

উঠেছি ত্রিশকো হোটেলে।…তা বেশ। তোর এইখানেই থাকবো। জিনিষপত্রগুলো তাহলে আনাতে হবে।

ফুল্লরা বলিল,—জিনিষ-পত্র আনানো শক্ত ব্যাপার নয়।

নিশানাথ কহিল—রোজা জানে, আমি আসবো ?

ফুল্লরা বলিল—জানে। তবে কবে আসবে, তা কারো জানা ছিল না তো…

—কোথায় সে ?

ফুল্লরা বলিল—কি জানি ! বোধ হয়, সিনেমায় গেছে। প্রায় যায়।

—এখানেও সিনেমা ! আমার ভাবনা হয় ফুলু…সেই যে কথা আছে sins of fathers…ওর মায়ের কথা মনে হলে রোজার জন্ত সত্যি আমার ভয় হয়। কিছু বললে রোজা বলে, আমরা pioneer on path of emancipation. (মুক্তিপথে অগ্রদূত)

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বোঝাপড়া

রোজা অনেক রাত্রে ফিরিল। নিশানাথ তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ফুল্লরা জাগিয়াছিল; রোজার ঘরে আসিয়া বলিল,—তোমার বাবা এসেচেন।

রোজা সজ্জা-ভূষণ খুলিতেছিল, এ কথায় ফুল্লরার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—বাবা এখানে আছে ?

—হ্যাঁ।

রোজা কি ভাবিল, পরে বলিল—ক'দিন থাকবে ?

ফুল্লরা বলিল,—বরাবর এখন এইখানে থাকবেন। ওঁকে এখানে বদলি করেছে।

—ও! বাবা বোধ হয় ঘুমোচ্ছে? কাল দেখা হবে'খন। আজ আর পাচ্ছি না—বড্ড tired feel করছি!

ফুল্লরা কোনো কথা কহিল না, নিঃশব্দে ঘর হইতে চলিয়া আসিল।

সকালে চায়ের টেব্‌লে বসিয়াছেন সুশীল চাটার্জ্জী, ফুল্লরা ও নিশানাথ; রোজার দেখা নাই।

নিশানাথ বলিল—রোজা কখন্ ফিরলো?

ফুল্লরা বলিল—এগারোটা বেজে যাবার পর।

নিশানাথ চমকিয়া উঠিল, কহিল,—কোথায় গিয়েছিল?

ফুল্লরা পেয়ালায় চিনি দিতেছিল, বলিল,—জানি না। সে কথা জিজ্ঞাসা করিনি। বললে, বড্ড tired…

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—কিন্তু এ ভালো কথা নয়। একরত্তি মেয়ে… একা এমন ঘুরে বেড়ানো! মানে, মেয়েদের স্বধীনতটুকু আমরা এখনো ঠিক মজ্জাগত করতে পারিনি।…তা ছাড়া আমরা পরাধীন জাত—স্বাধীনতার মানে বুঝে রেখেছি, বেপরোয়া-ভাব। স্বাধীনতা আসলে কিন্তু তা নয় তো।

নিশানাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

ফুল্লরা বলিল—আমার কেমন খেয়াল ছিল না এদিকে! যেভাবে আমরা মানুষ হয়েছি, বিধি-নিষেধের কোন হাঙ্গামা ছিল না, সত্যি, তবু এ-ভাবে বাড়ী ছেড়ে ঘুরে বেড়াবার কল্পনা কোনো দিন আমাদের মনে জাগে নি।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—স্ত্রী-স্বাধীনতার মানে, বাড়ী ছেড়ে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানো নয়! এ যুগে হৈ-হৈ করে বেড়াবার হুজুগ মেয়েদের

মধ্যে বড্ড বেড়ে চলেছে, দেখছি! কলকতার বাড়ী-ঘর ভেঙে ফাঁকা ফর্দ্দা পথ যে রেটে বেরুচ্ছে, মেয়েরা দেখছি ঘর থেকে ছিটকে পথে বেরুচ্ছে ঠিক সেই রেটে!...ফাঁকা পথ ভালো, মানি। কিন্তু সেজন্য ঘরের মায়া ত্যাগ করা ভালো নয়।...আসলে কি হয়েছে, জানো? জীবনকে ক্রমশঃ আমরা সমর-ক্ষেত্র বলে গ্রহণ করচি! সে ক্ষেত্রের পিছনে যে একটু ছাউনি আছে, এবং সে ছাউনিতে বিশ্রাম নেওয়া দরকার, সে-কথা ভুলে গেছি। তার ফলে ঘর আমাদের ঘর থাকচে না... এটা ভয়ের কথা।

সুশীল চাটার্জ্জী ফুল্লরার পানে চাহিলেন। ফুল্লরা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল, কোনো জবাব দিল না।

এই আলোচনার মাঝখানে রোজা আসিয়া দেখা দিল; আসিয়া নিশানাথকে দেখিয়া সোৎসাহে বলিল—**Hallo! Good morning Dad**...ভালো আছো? ইঃ, তোমার চেহারা ভয়ানক বদলে গেছে! রঙ হয়েছে ময়লা...**you have grown much older**...(বুড়াইয়া গিয়াছ)!

নিশানাথ বলিল—বয়স বাড়চে তো! আর রঙ?...যে রকম ঘুরে বেড়াতে হয়...তবে, **I am in perfect health** (স্বাস্থ্য বেশ ভালো আছে)।

রোজা চেয়ারে বসিল, বসিয়া পেয়ালায় চা ঢালিল।

নিশানাথ বলিল—তোমার জন্য বসে অনেক রাত হলো—শুয়ে পড়লুম। ক'দিনের জার্নি!...তা অত রাত্তির পর্য্যন্ত বাইরে কোথায় ছিলে?

রোজা বলিল,—প্রথমে সিনেমায় গিয়েছিলুম...**Flaming Hearts** দেখতে। তার পর বেরিয়ে দেখি, চমৎকার জ্যোৎস্না! একটু

বেড়াবার সখ হলো। ছিলুম আমরা চারজন—এসথার, কল্প, আমি আর মিষ্টার হাজরা। ব্যারাকপুর চলে গেলুম···রাত্তির অত হয়েছে, খেয়াল হয়নি···

কথাটা বলিয়া রোজা নিশানাথের পানে চাহিল ; নিশানাথ নিরুত্তরে মেয়ের পানে চাহিয়াছিল···সে দৃষ্টি দেখিয়া রোজা থমকিয়া রহিল, পরে দুই চোখে মিনতির আবেগ ভরিয়া বলিল—তুমি রাগ করেচো ?

নিশানাথ বলিল,—তুমি যে বেড়াতে যাও, তোমার পিসেমশায় পিসিমার মত নিয়ে যাও ?

রোজা কহিল—পিসেমশায়কে বুঝি পাওয়া যায় ? যতক্ষণ বাড়ী থাকেন, শুধু বই আর কাগজ নিয়ে আছেন···

—পিসিমা ?

রোজা বলিল— আমি বড় হয়েচি···পিসিমাদের সময় মেয়েরা যেভাবে চলতো, এখন সে ভাবে চলা যায় না। পিসিমা হয়তো···

নিশানাথ নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া বলিল—হুঁ !

তারপর সকলেই চুপ···

সুশীল চাটার্জী বলিলেন ; অনেক কথা বলিলেন—অর্থাৎ তিনি বলিলেন,—এ জন্য দায়ী আমরা। ঘর-বাড়ী আমাদের আছে, এ কথা সত্য ! কোনোমতে সেখানে এসে আমরা মাথা গুঁজি মাত্র—সুখ-শান্তি, আশা-বাসনার পরিতৃপ্তি খুঁজি বাইরে। আমরা ঘর-ছাড়া হয়েছি এবং ঘরছাড়া হয়েছি বলেই ঘরের কোনো লোকের পানে চেয়ে দেখি না ! জীবন-সংগ্রাম বলে কথা আছে—সে কথা সত্য ; শুধু সংগ্রামই আমরা করছি···তার ফলে একটী নিমেষের জন্য শান্তি নেই, বিরাম নেই, আরাম নেই !···Comforts-এর জন্য মোটর গাড়ী, সোফা, কৌচ, ফ্রিজিডেয়ার, রেডিয়ো-শেট, সিনেমা—সব

আছে। কিন্তু সে সবের আমোদ উপভোগ করি ক'জন? Possess করবার মোহেই আমরা আচ্ছন্ন। যে জিনিষের বাসনা করছি, তা না পাওয়া পর্য্যন্ত মোহ! পাবা মাত্র সে মোহ সব ঘুচে যায়। সত্যি, এ কথা যত ভাবি, যেন জ্ঞান থাকে না! এবং নিরুপায় হয়ে আমরা এই জীবন-সংগ্রামে মত্ত হই! জানি, যেখানে এনে নিজেদের আজ দাঁড় করিয়েছি, সেখান থেকে ফেরবার উপায় নেই! ফিরতে গেলে চারিদিকে জাগবে বিশৃঙ্খলা—বিষম জোট পাকাবে।...আমার উচিত ছিল as guardian রোজাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া...চালাইনি! না চালানোর কারণ—প্রথমতঃ নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এই ব্যস্ত থাকার অভ্যাস মনকে এমন পেয়ে বসেছে, যে তুনিয়ার কোন-কিছুর পানে তাকাবার অবসর নেই! ছুটিছাটার দিনে বেড়াতে যাই, তার মধ্যে কোন কিছু দেখা বা শোনার আনন্দ-উপভোগ তত নেই, যত আছে ঠাট বজায় রাখবার প্রয়াস! দ্বিতীয় কারণ,—well, এইখানে আপনার ভগ্নীকে আমি accuse করি। তাঁর উচিত ছিল, রোজাকে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া—to be her teacher, her guide...তা তিনি করেন নি!

ফুল্লরার দেহ-মন এ-কথার আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। সে করিবে guide? কোন্ পথে? সে জানে এক পথ...লেখাপড়া শিখিয়া পাশ করা! তার পর...?

তার পরের পথ আগাগোড়া ধূম্রাচ্ছন্ন। সে পথে কি, তার কোনো সংবাদ সে রাখে না! চলিতে চলিতে পথের অভিজ্ঞতা সে লাভ করিয়াছে। কিন্তু চলিয়াছে, শুধু চলিয়াছে! পথের কোথাও এমন ঠাঁই দেখিল না—এমন দ্বীপ, এমন ছায়া-কুঞ্জ...যেখানে বসিয়া ত্ন'দণ্ড বিরাম আরাম পাইবে।

স্বামীর কথায় চোখের সামনে জীবনের যে-পথ জাগিয়া উঠিল, কুয়াশায় তাহা পরিম্লান, অস্পষ্টতার ছাঁয়ায় তাহা আচ্ছন্ন!

রোজা বলিল—আমায় কি করতে হবে,—কি ভাবে চলতে হবে, শুনি।

নিশানাথ বলিল—আপাততঃ লেখাপড়া করবে এবং তোমার পিসিমা-পিসেমশায়ের কথা মেনে চলবে। যা কিছু করবে, ওঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বা ওঁদের অনুমতি নিয়ে…

রোজা বলিল—আমার নিজের কোনো স্বাধীন মতামত থাকবে না? কোন বিষয়ে privacy (গোপনতা)? নিজের individuality (ব্যক্তিত্ব)?

Individuality! Privacy! নিশানাথের দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। রোজার মা এ কথা বলিত এবং এ কথার ছোঁয়াচ হইতে রোজাকে সে বরাবর বাঁচাইয়া আসিয়াছে!

নিশানাথ বলিল—না। আগে বড় হও, মানুষ হও, তার পর individuality. এখন তুমি just a maid…unmarried…(অবিবাহিতা কুমারী)

রোজা ফোঁশ করিয়া উঠিল, বলিল,—Unmarried (অবিবাহিতা)! And for that, you want me to be a slave (এজন্য তোমরা চাও, আমি হবো ক্রীত-দাসী)?

তার দুই চোখে আগুন জ্বলিল।

ফুল্লরা দেখিল। মনে পড়িল, এমনি অগ্নিশিখা তারো মনে জ্বলিত এক দিন…

কিন্তু তার তুলনায় এ শিখা? সুশীল চাটার্জ্জী ডাকিলেন,—রোজা…

রোজা তাঁর পানে চাহিল।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—তোমাদের মধ্যে আমি কোনো দিন দাঁড়াইনি, তবু আজ একটা কথা না বলে থাকতে পারচি না···

সুশীল চাটার্জ্জী চকিতের জন্য স্তব্ধ হইলেন; রোজার চোখে অগ্নিশিখা তখনো মিলায় নাই···নিশানাথ স্তম্ভিত···যুন্নরার বুক দুলিয়া উঠিয়াছে···

শান্ত স্বরে সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—বাপের সঙ্গে অমন করে কথা ক'বে না! **Education means restraint** (শিক্ষার অর্থ সংযম)।

এ কথায় রোজার মনে কি যে হইল···দারুণ চাঞ্চল্য···চেয়ার ঠেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিমেষ-মধ্যে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সুশীল চাটার্জ্জী চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—দোষ আমাদের! ছেলেমেয়েদের পানে ফিরে তাকাতে আমরা ভুলে গেছি। ভাবি, ওরা ঠিক স্ব-ভাবে গড়ে উঠবে। তা হয় না। কোথাও তা হয় না···বনে প্রকৃতির বুকে যে গাছপালা জন্মায়, আলো-বাতাস পেয়ে তারা যেভাবে বেড়ে ওঠে, লোকালয়ের আবছায়ায় জন্মানো গাছপালা সেভাবে বাড়ে না। লোকালয়ের গাছপালা চায় বড়-বেশী আদর, পরিচর্য্যা। তার আশপাশে আগাছা জন্মায়, সে-আগাছা সাফ করা চাই। নাহলে তারা মৃতকল্প থাকে। এও ঠিক তেমনি। লোকালয়ের আইন আর বনের আইন—দুয়ে তফাৎ আছে। আমরা সে কথা ভুলে গেছি···শুধু পয়সায় সাধনায়, আরামের মোহে আলস্যে-ঔদাস্যে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার দিকে যে দৃষ্টি নেই, তার কারণ, আমাদের উদারতা নয়···তার কারণ, আমাদের আরাম-প্রিয়তা। দেখাশুনা করতে হলে যে চিন্তা, যে পরিশ্রম প্রয়োজন, আমরা তা করি না—শুধু আমাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটবে বলে।

নিশানাথ বলিল—But we love them—more than anything (কিন্তু পৃথিবীর সব-বস্তুর চেয়ে আমরা ছেলেমেয়েকে ভালোবাসি)

সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—It is not love for them but for us···(এ ভালোবাসা নিজেদের উপর যতখানি, ওদের উপরে ততখানি নয়) যতটুকু আমাদের তৃপ্তি, যতক্ষণ আমাদের তৃপ্তি, ততক্ষণ এ ভালোবাসা! It is self-love. (এ ভালোবাসা স্বার্থপরের ভালোবাসা)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

উমাচরণ হাজরা

রোজার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া নিশানাথ বলিল—আমার পক্ষে দেখছি, এখানে থাকা চলবে না। আমি কলম্বোয় ফিরে যাই রোজাকে নিয়ে।

ফুল্লরা কোনো জবাব দিল না। নিজের অক্ষমতার ভারে বুক তার ভারী হইয়া আছে,—জবাব দিবার সামর্থ্য ছিল না।

নিশানাথ বলিল—কলম্বোয় গিয়ে ওকে ছেড়ে দি...ওর ভাগ্যে যা হয়, হোক্! আমি আর পারবো না···জীবনটাকে বেঁধে চালালে হয়তো একটু আরাম পেতুম! যে পথে সকলে চলেছে, সে পথে বৈচিত্র্য নেই ভেবে বেরিয়ে পড়েছিলুম···তখন ভবিষ্যতের কথা ভাবি নি।

নিশ্বাসের বাষ্পে কথা শেষ হইল না।

সহসা ফুল্লরা যেন কূল দেখিল; কহিল—এক কাজ করো। ওর বিয়ে দেবে?

নিশানাথ বলিল—কিন্তু কে বিয়ে করবে? যে-সব মেয়ে এ-ভাবে হল্লা করে বেড়ায়, তাদের উপরে কারো শ্রদ্ধা থাকে না। বিবাহের

মূলে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তা হলে সে বিবাহ হয় নিষ্ফল। বিবাহ বিবাহ হয় না। অর্থাৎ যে ভুল আমি করেছি···সকলে সে ভুল করে না, ফুল।

এ কথার পরে আর কথা নাই। বেচারী দাদা! ফুল্লরা কহিল—সেখানে নিয়ে গিয়েই বা কি করবে? তোমার অশান্তি তাতে ঘুচবে না তো।

নিশানাথ কহিল—আমার না ঘুচুক, তোমরা রক্ষা পাবে। তোমরা জানো না ফুল, আমি জানি, এ নাটকের যবনিকা কোথায় পড়বে।

নিশানাথ ছাড়িল না। রোজার কাছে প্রস্তাব করিয়া বসিল—বিয়ে কর্···তোর এই বন্ধুদের মধ্যে কাকে তোর ইচ্ছা, বল্···

রোজা বলিল—বিয়ে! কিন্তু এ সম্বন্ধে কারো সঙ্গে কোনো কথা হয়নি কখনো। আমরা শুধু বন্ধু, সহচর।

নিশানাথ বলিল—বিয়ে না করো, কথা কয়ে দেখতে হবে।

—আমি সে কথা কইতে পারবো না।

নিশানাথ সন্ধান লইল। সনাতন হাজরা, কবি...কেহ থাকে ফ্ল্যাটে একখানা কামরা লইয়া, কেহ বাপের কাছে; কাজ-কর্ম্ম করে না; টু-সীটার গাড়ী আছে, তাহাতে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

নিশানাথ রোজাকে বুঝাইল; বুঝাইয়া সে গিয়া দেখা করিল সনাতন হাজরার সহিত। তাকে বলিল—আমার মেয়ে রোজা। তার সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব···তাকে বিবাহ করো।

বিবাহ! হাজরা চমকিয়া উঠিল, কহিল—তা কি করে হবে?

—কেন হবে না?

—আমার মা আছেন, বাপ আছেন। তাঁদের মত চাই।

নিশানাথ কহিল,—কেন তাঁরা অমত করবেন, শুনি? তুমি বলবে,

রোজা তোমার বন্ধু, তাকে তুমি জানো—এবং সে তোমার চেয়ে কোনো অংশে নীচু নয়…equally respectable (সমান সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম)।

হাজরা কোন জবাব দিল না। নিশানাথ কহিল—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করবো। দেখা করে বলবো, আমার মেয়ে রোজা…এবং যে-সমাজে আমার বাস, সে সমাজের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সমান-চালে পা ফেলে চলে। বলবো, তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বন্ধুত্বের কথা। এমন বন্ধুত্ব যে দুজনে মোটরে চড়ে বিশ ক্রোশ টুর করে আসো। তা ছাড়া সিনেমায় যাওয়া, রেস্তঁরায় যাওয়া—সকলে জানে, এ বন্ধুত্বের কথা। আমার মেয়ে বড় হয়েচে—দুজনে এতখানি অন্তরঙ্গতা! অন্য পাত্র বিবাহ করতে চাইবে না—বলবে, why, they are almost like lovers…তোমার বাবার অমত কেন হবে? তিনি ভদ্রলোক…বয়স হয়েচে—ভাল-মন্দ বোঝেন।

সনাতন হাজরার চোখের সামনে হইতে শ্যামল পৃথিবী যেন সরিয়া গেল! ছায়া-কুঞ্জ, বিরাম-নীড় সব যেন পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং সারা পৃথিবী সাহারা মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করিতেছে! বাপ জানে, ছেলে খুব স্পোর্টস্‌ম্যান—পাওয়েলের বাবার কারখানায় যায় মোটরের কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া ব্যবসা শিখিতে! সে যে…

সনাতন কহিল,—না, না, বাবাকে বলবেন না। তিনি মত দেবেন না। আমার বিবাহের জন্য মেয়ে দেখছেন সনাতন সমাজে। তাঁর মতামত তো আমি জানি।

নিশানাথ কহিল—বটে! নিজেকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ রেখে পরের গায়ে যাও অস্ত্র বিঁধতে…! তা হবে না মাষ্টার হাজরা…আমি এক জন এ্যাডভেঞ্চারার। কিন্তু দুনিয়ায় এই মেয়ে আমার একমাত্র

আকর্ষণ, অবলম্বন। আমিও আঘাত পেয়েছি—এবং সে আঘাত বারে-বারে সহ্য করবো, এতখানি মহত্ত্ব আমার নেই!...আমি সব সংবাদ সংগ্রহ করেছি। জেনেছি, তুমি ঐ পাওয়েলের আড়ালে নিজেকে রেখে রোজাকে নিয়ে রাঁচি ঘুরে এসেচো! তার সঙ্গে বিবাহ অসম্ভব বলে যদি বুঝেছিলে, তাহলে কোন্ সাহসে এতখানি liberty নেবার সাহস তোমার হয়?...তুমি জানো, আদালত্ আছে? এবং সে আদালতে সুশীল চাটার্জী মস্ত একটা **legal power?**

নিশানাথের কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় সনাতন হাজরার মনে যতখানি আতঙ্কের না সঞ্চার হইয়াছিল, আদালতের উল্লেখে সে-আতঙ্কের আর সীমা রহিল না!

নিশানাথ কহিল—চলো তোমার বাবার কাছে। এসো...

সনাতন হাজরা ভড়কাইয়া গেল। নিশানাথ তার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—আসা চাই...**No, I won't leave you. Rosa is** my **daughter**...(তোমাকে আমি ছাড়িব না। রোজা আমার মেয়ে)... **and her hononr is concerned here** (এবং এ আমার মেয়ের ইজ্জতের কথা)।

তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া একটা ভৃত্য এ দিকে আসিয়াছিল; নিশানাথ তাকে প্রশ্ন করিল—কর্ত্তাবাবু কোথায়?

ভৃত্য কহিল—দোতলার বৈঠকখানায়।

—তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করবো। দরকার আছে। জরুরি।

নিশানাথের ভঙ্গী দেখিয়া ভৃত্য নিবৃত্ত করিতে পারিল না এবং সনাতন হাজরার পিতার কাছে সে নিশানাথকে লইয়া আসিল।

সনাতন হাজরার পিতা উমাচরন হাজরা। মোটা একখানা খাতা

লইয়া কি সব লেখার উপর চোখ বুলাইতেছিলেন ; নিশানাথকে দেখিয়া বলিলেন—কি চান আপনি ?

নিশানাথ সংক্ষেপে পরিচয় দিল, দিয়া বলিল, সে খৃষ্টান। তার মেয়ে রোজা—maid। থাকে কৌতুলী সুশীল চাটার্জীর গৃহে। সুশীল চাটার্জী তার ভগ্নীপতি। রোজা এ-কালের মেয়ে—একটু বেশী রকম স্বাধীনতার উপাসিকা। নিশানাথ থাকে শীলোনে। রোজা স্কুলে পড়ে ; এবং এই পড়ার অন্তরালে উমাচরণের এক ভাগিনেয়ী সহপাঠিনী নিভাননী—তার মারফৎ সনাতনের সঙ্গে হয় রোজার আলাপ। সে আলাপের ফলে হতভাগা-মেয়েকে ভুলাইয়া সনাতন হাজরা রাঁচি লইয়া যায়···এ ক্ষেত্রে মেয়ের সঙ্গে সনাতনের বিবাহ দেওয়া উচিত। নচেৎ···

কথা শুনিয়া উমাচরণ যেন আকাশ হইতে পড়িল! বাপের প্রাণ ভুলিল। ছেলেমেয়ের সম্ভ্রম! মানুষ নিজের ইজ্জৎ-সম্ভ্রমের চেয়েও ছেলেমেয়ের ইজ্জৎ-সম্ভ্রমের দাম বেশী করিয়া দেখে। বিশেষ, মেয়ে···

এবং দু'চারি কথার পর সনাতনের ডাক পড়িল। আরো দু'চারি কথার পর সনাতনকে উমাচরণ বলিল—তোমায় বিয়ে করতে হবে এই মেয়েকে।

সনাতন হাজরা বলিল—অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব ? ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করবে ইতরের মতো···তার ইজ্জতের মান রাখবে না ?

সনাতন কহিল—She is a regular flirt. (সে একজন তরলচিত্তা সাহসিকা)...কক্সের সঙ্গে সে একবার চন্দননগর গিয়েছিল। আপনি বলতে চান, জেনে-শুনে এমন মেয়েকে বিয়ে বরবো ? Cox is more intimate with her... (কক্সের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা অনেক বেশী)।

উমাচরণ কহিল,—তা হবে না বাপু। এ মেয়েকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। যদি করো, কিছু টাকাকড়ি দেবো—আলাদা গিয়ে থাকবে। খৃষ্টান এ ঘরে বাস করবে না। এক জনের জন্য আমি আর-সকলকে ত্যাগ করতে পারবো না। তবে তোমাদের আমি ছেঁটে দেবো না। ভাখো, রাজী? নাহলে একটি পয়সা তোমায় আমি দেবো না। তুমি নিজের পথ দেখতে পারো—gentleman at large—আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

কথা শুনিয়া নিশানাথ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্! একালেও মানুষ এতখানি ভালো হয়! এমন করিয়া বিবেক মানিয়া চলে!

সনাতন কোনো কথা কহিল না; নিরুত্তরে গুম্ হইয়া রহিল।

উমাচরণ কহিল—কি বলো?

সনাতন মুখ তুলিয়া বাপের পানে চাহিল। বাপের মুখ গম্ভীর—যেন শ্রাবণের মেঘ ঘনাইয়া রহিয়াছে! এ মুখের পরিচয় সে ভালো করিয়া জানে। তার বাপ!···ভালোবাসিতে যেমন, শাসন করিতেও তেমনি ···দুয়ের মধ্যে রক্ষা করিবে, সে উপায় নাই!

সনাতন বলিল—আমাকে এক দিন সময় দিন...

উমাচরণ কহিল—বেশ। কাল ঠিক বেলা আটটা দশ মিনিট··· yes or no! এবং তার উপর তোমার ভবিষ্যৎ—মনে রেখো।

সনাতন চলিয়া গেল। নিশানাথের পানে চাহিয়া উমাচরণ কহিল—দয়া করে কাল একবার আসবেন...বেলা আটটায়।...যদি রাজী হয়, ভালো। না হলে আপনার এ অপমানে আমার সহানুভূতি ছাড়া আর কি করতে পারি, বলুন?

নিশানাথ নিশ্বাস ফেলিল।

উমাচরণ বলিল—আমরা মুখে বলি, মেয়েদের ছেলেদের সমান

স্বাধীনতা দেওয়া উচিত—দু'জনে তফাৎ করতে মনে ব্যথা বাজে। কিন্তু উপায় নেই। ভগবান দু'জনকে দু'রকম উপাদানে গড়েচেন—natureএর ব্যবস্থা...উল্টে দেওয়া চলে না। এ সম্বন্ধে আমি অনেক ভেবেচি, দেখেওচি অনেক।...মেয়ে-জাতের মনে ভগবান যে এতখানি সারল্য দেছেন, এতখানি বিশ্বাস আর আবেগ...সেগুলো বড় যত্নে রক্ষা করতে হয়। নাহলে খেয়ালী পুরুষের ফন্দী-অভিসন্ধি কোথা দিয়ে যে তাকে আক্রমণ করবে, কিছু বোঝা যায় না। শ্রী স্ত্রী...এমনি নানা কথা শুনতে পাই! দেহে-মনে স্বাতন্ত্র্য আছে, অনেক পণ্ডিতে এ-কথা বলচেন, লিখচেন—কিন্তু সে শুধু কথার কথা। সভ্য মানুষ মানুষকে অমর করবার জন্ত যেমন সাধনা করচে, তেমনি মারণাস্ত্র-আবিষ্কারেও তার সাধনার অন্ত নেই। রক্ষক ভক্ষক বলে যে কথা আছে, সে কথা সভ্যতা-শিক্ষার দিনেও মিথ্যা হলো না! হতে পারে না। অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। যে পুরুষ নারীকে স্বাধীনতা দিয়ে তাকে সুখী দেখতে চায়, সেই পুরুষই অলক্ষ্যে কখন সে স্বাধীনতার সুযোগে তাকে নিঃস্ব, রিক্ত, প্রবঞ্চিত করবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। বড় বড় চিন্তাশীল পণ্ডিতদের ইতিহাস খুলে দেখুন...গ্যটে, বায়রণ... দারুণ মনস্তাপে এ কথা আপনাকে স্বীকার করতে হবে, what man has made of man? এই কথা আমি বোঝাবার চেষ্টা করচি সকলকে বই লিখে। এখন আপনার মন ভালো নয়—আগে সুস্থির হন, তার পর অবসর-মতো এক দিন পড়াবো আপনাকে আমার সে লেখা।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

ছবি

দুপুর বেলায় কোথা হইতে ছবি আসিয়া হাজির।

ফুল্লরা বলিল,—এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি ?

ছবি বলিল—নিজের ভবিষ্যতের সন্ধান নিচ্ছিলুম।

—তার মানে ?

ছবি বলিল,—বড় শ্রান্ত হয়েছি, ফুলু। পৃথিবীর চারিদিকে পথ পড়ে রয়েছে —সে পথের ধারে ঘর-বাড়ীও আছে—ঘরের মধ্যে কোন দিন উঁকি পাড়তে পারলুম না। পথের মায়ায় মন ভরে আছে। ঘর দেখলেই মন কেমন শিউরে ওঠে—ও-ঘরের চারিদিক দেওয়াল আর পাঁচিল! সে কল্পনায় অস্বস্তি জাগে। কিন্তু আর পারচি না। পথে পথে ঘুরে বড় শ্রান্তি বোধ করচি। মনে হচ্ছে, হোক বন্দিশালা, তবু চুপ করে দু'দণ্ড সেখানে পড়ে থাকতে পাবো।

ফুল্লরা কহিল,—কবিত্ব ছেড়ে সহজ ভাষায় বল্ তো, কি তুই করছিস ? বললি, এখানে থাকবি। রইলি ক'দিন—তারপর না বলে-কয়ে একবারে উধাও! ভাবনা হয় তো, মানুষটার কি হলো? গাড়ী চাপা পড়লো, না, আর কি ঘটলো ?

কথাটা বলিয়া ফুল্লরা সপ্রশ্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবির পানে চাহিয়া রহিল।

উদাস নেত্রে ছবি বাহিরের পানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল ; একটু পরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—হারীত্ বাঁড়ুয্যেকে জানিস ?

—জানি। গড়িয়া-হাটায় বাড়ী।

—হ্যাঁ।

—সে এসে জীবনের পথে দাঁড়ালো না কি?

ছবির কপোল আরক্ত হইয়া উঠিল। সলজ্জভাবে সে মুখ নত করিল এবং নত মুখেই বলিল—এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলুম এক বন্ধুর ওখানে—সেখানে দেখা হলো হারীৎ ব্যানার্জির সঙ্গে। সে একজন প্রোডিউসার হতে চায়। অনেক aristocratic মেয়ের সঙ্গে আলাপ আছে। আমার বোম্বাইয়ের কাহিনী শুনে তার উৎসাহ বেড়ে উঠলো; বললে, আপনি আসুন, আমার সঙ্গে যোগ দিন। আমরা ফিল্ম তুলবো। এতে art and commerce (শিল্পকলা ও ব্যবসা) দুয়ের আশ্চর্য্য সমন্বয়। আমরা একটা দল গড়ে ছবি তুলবো। মস্ত career··· নানা জনে নানা আপত্তি তুললো। ব্যানার্জী বললে, মেয়েরা যদি টিচারী বা প্রফেশরি করতে পারেন তো ফিল্মে নামতে কি দোষ হয়েছে? এও তো একটা respectable profession (মর্য্যাদার কাজ)।

—তারপর?

—ক'দিন সেই খানেই ছিলুম। ঘোরাঘুরি করচি। টাকার জোগাড় হয়েছে। ষ্টুডিয়ো ভাড়া নিয়ে ছবি তোলা হবে। বাঙলা আর হিন্দী—দুটো version। আমি এতে যোগ দিয়েছি। হপ্তা-খানেকের মধ্যে এদিককার কাজ পাকা হবে।

ফুল্লরা কহিল—তাই এখান থেকে বিদায় নিতে এসেচো?

ছবি জবাব দিল না, নিরুত্তর রহিল। তারপর আর একটা নিশ্বাস। নিশ্বাস ফেলিয়া ছবি বলিল,—একটা কথা ছিল, মানে পরামর্শ।

—আমার সঙ্গে?

ছবি বলিল,—ঠিক তোমার সঙ্গে নয়। পরামর্শটা মিষ্টার চাটার্জীর সঙ্গে—তবে through you (তোমার মারফৎ)!

—তিনি এখন বাড়ীতে নেই।

—তা না থাকুন, কথাটা তোমাকে বলচি। তাঁর সাম্‌নে এ-কথা আমি নিজের মুখে বলতে পারবো না। কথাটা তুমি তাঁকে বলো—বলে তাঁর মতামত নিয়ো আমার আড়ালে।

ফুল্লরার দুই চোখে কৌতূহল আরো সীমাহীন হইয়া উঠিল।

ফুল্লরা বলিল,—বল্ তোর গোপন-কথা।

ছবি বলিল,—না বুঝে ঝোঁকের মাথায় আমরা এক-একটা কাজ করে বসি,—তা যেন শিকলের মত আমাদের বন্ধন করে···সত্যি!

কথার শেষে মৃদু একটা নিশ্বাস।

ফুল্লরা বলিল,—ভূমিকা রেখে বলো, কি কথা।

ছবি বলিল,—তোমার অজানা কিছু নেই। ঐ আনোয়ারের কথা—আমার স্বামী। ফিল্মে নামি—এতে তার অমত। বলে, আর ও-সব খেলাধূলো নয়। বিবাহ হয়েছে—এসো, সংসার পাতি। কিন্তু আমারো নিজের একটা ambition আছে···to express myself (নিজেকে প্রকাশ করিবার)···তাতে বাধা দেওয়া তার অন্যায়। নয় কি?

ফুল্লরা কোন জবাব দিল না; মনের কোথায় যেন ছোট একটা ছুঁচ বিঁধিল!

ছবি বলিল,—তাই সেখান থেকে চলে এসেছি। আমি বলি, তোমার যেমন ambition আছে, আমারো তেমনি আছে। তুমি মানুষ, আমিও মানুষ। আমার যদি শক্তি থাকে, কেন তার অপব্যয় করবো? তিনি বলেন,—না, তুমি স্ত্রী—পাঁচ জনের চোখের সামনে এ ভাবে তোমাকে expose করতে পারবো না··hungry gaze of the multitude (সাধারণের ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখে)! আমি বলি, আমার পানে লোকে যদি চেয়ে দেখে, তাতে আমার দেহ ক্ষয় হয়ে যাবে না! I can stand such gaze and with dignity. (সে

দৃষ্টি আমি নিজের মর্য্যাদা-ভরে উপেক্ষা করিয়া তাদের সামনে দাঁড়াইতে পারিব)।···তোমার কি মত ?

ফুল্লরার সারা দেহে রোমাঞ্চ ফুটিল। মন যেন রী রী করিয়া উঠিল। মনে পড়িল, বন্যা-রিলিফে গিয়া সেই ভিড়ে দাঁড়ানোর দৃশ্য! সে-ভিড়ে বিবিধ বিচিত্র দৃষ্টি-ভঙ্গিমা!

উপেক্ষা করা সহজ; কঠিন নয়! কিন্তু কি কষ্টে যে সে উপেক্ষা করিয়াছিল!···

ছবি বলিল,—আমার এখন মনে হচ্ছে, আনওয়ার যদি আপত্তি তোলে, যদি কোর্টের সাহায্য নেয়, তা'হলে আমার ফিল্মে নামা বন্ধ করতে পারে?···এ প্রশ্নটুকুর জবাব চাই মিষ্টার চাটার্জীর কাছ থেকে। তুমি আমাকে সাহায্য করো।

ফুল্লরা কহিল,—আইনের কথা ছেড়ে দি। আমার শুধু একটা প্রশ্ন আছে।

—কি?

—মিষ্টার আনোয়ারকে তুই বিবাহ করেছিস ভালো বেসে? না'হলে অত অনিচ্ছা—তার পর বিবাহ! হাজার হোক···

কথাটা বাধিয়া গেল! ফুল্লরা এ কথা সমাপ্ত করিতে পারিল না।

ছবি বলিল—মুশলিমকে···এই কথা বলতে চাস?

—তাই।

ছবি বলিল—ঠিক যে ভালোবেসে বিবাহ করেছি, তা বলতে পারি না। নতুন careerএর মোহ! আমার চোখের সামনে তখন জেগেছে নতুন পৃথিবী। সে পৃথিবীর সবটুকু আমার অজানা। তাই একজন সঙ্গী চাইছিলুম পাশে—একজন বন্ধু—যে আমার হাত ধরে নতুন পৃথিবীতে নিয়ে যাবে। সে যে কি প্রচণ্ড মোহ! সে মুহূর্ত্তে আমার

চোখে আনোয়ার যেন তীব্র ঝলক্, একটা স্বপ্ন। নতুন জগতে প্রবেশ করছি! বোধ হয়, সেই উৎসাহের ঝোঁকেই বিবাহ করেছিলুম। ভালোবাসার কথা মনে জাগে নি!

ফুল্লরা কহিল—তারপর বিবাহ হলে…?

ছবির মুখ আরক্ত হইল। সলজ্জ মৃদুভাষে ছবি বলিল,—হাঁ, আর পাঁচজন স্বামি-স্ত্রীর মতো স্বামি-স্ত্রী সম্পর্কেই আমরা বাস করেছি… কিন্তু শেষে জাগলো এই বিরোধ। কিছু দিন পরে আনোয়ার যখন নারীর উপর পুরুষের সেই আদিম শক্তি-প্রয়োগের চেষ্টা করতে লাগলো, —স্পষ্ট নিষেধ করলো,—না, তুমি আমার স্ত্রী—তোমাকে ফিল্মে নামতে দেবো না—পাঁচ জনের সঙ্গে ছবির গল্প-হিসাবে বিবিধ সম্পর্কে বেশী রকম অন্তরঙ্গতা…না, তা হবে না! তখন…সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস! সে ইতিহাসের কতক তোকে বলেছি—তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে আমি শ্রান্ত হয়েছি…ও রকম বদ্ধ ঘরে আমি বাস করতে পারবো না। আমি চাই career, যশ, খ্যাতি, জীবন!… আমার ঐ প্রশ্নের জবাবটুকু শুধু তুমি আদায় করে দাও...আমি কৃতার্থ হবো।

ফুল্লরা কোন তর্ক তুলিল না, বলিল,—বেশ, এর জবাব তুমি পাবে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কর্ত্তব্যের নিরিখ

রোজাকে লইয়া নিশানাথ সারাদিন টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। বৈকালের দিকে দুজনে আসিয়া বসিয়াছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে পার্কের মধ্যে। নিশানাথ রোজাকে জীবনের কথা ভালো করিয়া বুঝাইতেছিল—স্পষ্ট ভাষায়, কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ না রাখিয়া। কথার কতকগুলি

রোজার কাণে যাইতেছিল। কখনো বা রোজার মাথায় রাজ্যের ঘটনা হট্টগোল তুলিয়া ফৌজের মতো কুচ্‌কাওয়াজ করিয়া চলিয়াছে, কখনো বা সে নিথর, নিস্পন্দ! সে এক বিশৃঙ্খলার ব্যাপার!

নিশানাথ বলিল—যে সমাজের কথা তোলো, সব সমাজেই মেয়েদের চলতে হয় বড় সাবধানে। পুরুষের অসংযমের কথা সমাজ এক দিন ভুলে যায়—কিন্তু মেয়েদের বেলায় সমাজ কোনো কথা ভোলে না। তার ফলে মেয়ে-জাতিকে কবেকার এক মুহূর্ত্তের বে-চালের জন্য আজীবন সমাজের ঘৃণা-অবজ্ঞা মাথায় বয়ে চলতে হয়! সাম্যের কথা নিয়ে যত দিগ্বিজয় করে বেড়াও, আমাদের এ সমাজও মেয়েদের ত্রুটি উপেক্ষা করতে পারে না, ক্ষমা করতে পারে না!

রোজা বিরক্ত হইতেছিল। এ ভাবে বন্দিনী করিয়া তাকে লইয়া ঘোরা কেন? কেন?

সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বেশ রূঢ় স্বরে বলিল—কি আমি করেচি যে, তুমি এ সব কথা বলচো? সমাজ! ঘৃণা! অবজ্ঞা! আমি যদি বলি, তোমার সমাজের এ ঘৃণা, এ অবজ্ঞা আমি গ্রাহ্য করি না? যদি বলি, আমি সমাজ-ছাড়া হয়ে বাস করতে চাই?

নিশানাথ চটিল, কহিল,—নিজের মাথা গোঁজবার নিরাপদ-আশ্রয় আছে, তাই এ কথা বলতে পারচো! ধরো, যদি এ আশ্রয়টুকু থেকে বঞ্চিত হও, তখন তুমি কোথায় থাকবে? কোন্ আশ্রয়-তলে দাঁড়িয়ে এমন কথা তুমি বলতে পারবে—এতখানি বেপরোয়া ভাবে? তোমার যে সব বন্ধু আজ তোমাকে এতখানি নাচিয়ে তুলেছে, তারা তোমার পানে ফিরেও তাকাবে না! সংসারে এ-রীতি চলে অসচে সেই সনাতন যুগ থেকে!...তারা তোমায় আশ্রয় দেবে? কুকুর বিড়ালের আশ্রয় নয়, —বন্ধুর আশ্রয়, আত্মীয়-জনের স্নেহ-মমতার আশ্রয়!...সে আশ্রয় তোমার

কোথাও মিলবে না, রোজা। তুমি হবে সকলের উপেক্ষিতা, পরিত্যক্তা... তারো বেশী অধোগতি হবে! এ কথা...তুমি মেয়ে হলেও তোমার মঙ্গলের জন্য আমায় স্পষ্ট করে বলতে হচ্ছে...তোমার আচরণে, তোমার দুর্বুদ্ধির জন্য!

রোজা কহিল,—দুর্বুদ্ধি!

—তাই।...আমার একদিন এমনি দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। তার ফলে...

প্রদীপ্ত দুই চোখের দৃষ্টি মেলিয়া রোজা চাহিল নিশানাথের পানে।

নিশানাথ তাহা লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া বলিল,—তুমি জানো... তোমার মাকে আমি বিয়ে করি...তিনি তখন তোমারি মতো প্রমত্ত-বিলাসে মশগুল হয়ে বেড়াতেন। সে বিলাস-লীলায় আমি উন্মাদ হই। তাঁকে বিবাহ করি—তাঁর নানা খেয়ালের পরিচয় জেনে! ভেবেছিলুম, বিয়ে হলে এ সংসর্গ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে আমার ভালোবাসায় তাঁকে নতুন মানুষ করে তুলবো!...

নিশানাথ চুপ করিল, তার পর ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল,—হয়তো তোলা যেতো...যদি তাঁকে কিছুদিন শাসনে রাখতুম!...এ সব প্রবৃত্তি...রোগের মতো! দেহে যেমন রোগ হয়, মনেও তেমনি রোগ হয়। আহারে অসংযম করলে তার ফলে হয় রোগ...মনের অসংযমেও তেমনি মন হয় ব্যাধিগ্রস্ত। তখন বিচার-বিবেকের কোনো শক্তি থাকে না। আমি যদি সংসারকে সংসার বলে স্বীকার করতে পারতুম, দিনান্তে বিশ্রামের তাঁবু বলে না ভাবতুম, তাহলে তোমার মার প্রমোদ-লালসা অন্য স্রোতে বইতো...হয়তো কতকটা চালাতে পারতুম!...এত ঠেকে তবে আমি শিখেছি,—এ সব সত্য। তাই তোমাকে সেখানকার সেই নিরাশ্রয়তার আব-হাওয়া থেকে এখানে এনে

রাখি। কিন্তু তুমি আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করে দেছ তোমার অবিবেচনায়, তোমার মূঢ়তায়।

এ সব বক্তৃতা রোজার ভালো লাগে না। বক্তৃতা সহিবার একটা সময় আছে! তার রাগ হইল, সকলে তাকে এমন অপদার্থ মনে করে কেন? মন যা চায়, সে তা করে, সত্য! সে চাওয়া রোধ করিতে তার সামর্থ্যে কুলায় না, এ কথাও সত্য! তাই বলিয়া এ-চাওয়ার ফলে নিজেকে আহত ক্ষত-বিক্ষত করিবে, এতখানি কাণ্ডজ্ঞানহীনতা তার নাই। সে যা চায়, নিজের তৃপ্তির জন্যই তা পাইতে চায়!

এ কথাটা অসঙ্কোচে বাপের মুখের উপর সে প্রকাশ করিয়া বলিল।

নিশানাথ বলিল—তুমি যদি চাও, এরোপ্লেন চালাবে! চালাবার কশরতি না জেনে চালাতে গেলে এরোপ্লেন ভেঙ্গে চূর্ণ হবে, সেই সঙ্গে তুমিও আহত, ক্ষত-বিক্ষত হবে। শুধু তাই নয়, প্রাণে মারা যাবে। এতখানি আশঙ্কা সত্ত্বেও যদি তুমি এরোপ্লেন চালিয়ে তৃপ্তি পেতে চাও, সে-তৃপ্তির কাঙাল হও...তাহলে তরে পরিণাম?

ঝাঁজালো স্বরে রোজা বলিল—এ সব তোমার যা নয়, সেই কথা টেনে এনে তর্ক করা! এ তর্ক আমি শুনবো না...আমি মানবো না।... এ বয়সে গম্ভীর হয়ে ঘরের আড়ালে পড়ে আমি থাকবো না—পাথরের ঢ্যালার মতো! পৃথিবীর সঙ্গে আমি পরিচয় করতে চাই।

তার অত্যুচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া নিশানাথ বলিল—একে পরিচয় বলে না। একে বলে মৃত্যু!

—না, না, আমি শুনবো না এ-সব কথা!...

রোজা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাগে দুঃখে অপমানে তার দুই চোখে জল-ধারা! চকিতের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ছুটিল... উদ্‌ভ্রান্তের মতো...

নিশানাথ ডাকিল,—রোজা…রোজা…

দূরে গিয়া রোজা দাঁড়াইল…ধনুকের মতো বাঁকিয়া। নিশানাথ কাছে আসিল, বলিল,—বাড়ী চলো। আর কোনো কথা বলবো না…

ক্ষণকে স্তব্ধতা। অদূরে কাথিড্রালের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিল…

নিশানাথ কহিল,—এসো।

নিশানাথ অগ্রসর হইল, রোজা নিঃশব্দে তার সঙ্গী হইল। চলিতে চলিতে নিশানাথ আপন-মনে বলিল,—নিজের তৃপ্তির কথা ষোল আনা ভাবো, রোজা…সেই সঙ্গে আমার কথা যদি একটু ভাবতে… তোমার বাপের কথা! যে-বাপের তুমি ছাড়া আর কেউ নেই…তোমার জন্য যে বাপ জীর্ণ মন, জীর্ণ দেহ নিয়ে আজো ছুটোছুটি করচে…যে বাপ তার বুকের অগ্নিদাহ মুছতে চায় তোমাকে সুখী দেখে, তোমার মর্য্যাদা-গৌরবে…

নিশানাথ নিশ্বাস ফেলল। রোজা পাশে পাশে চলিয়াছে মৌন মূক …নিঃশব্দ ধীর গতিতে।

নিশানাথ আবার বলিল—একটা কাজ…সেটার শেষ করে আমার এখানকার কর্ত্তব্য চুকিয়ে আমি চলে যাবো। ভদ্রলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছি। উমাচরণ বাবু…সনাতনকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, নিশানাথবাবুর মেয়েকে তোমার বিবাহ করতে হবে—না করো, তোমায় ত্যজ্য পুত্র করবো! কাল বেলা আটটায় এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হবে। দেখি, কি হয়…কাল বেলা আটটায় আমার এ দুশ্চিন্তা, আমার এ কর্ত্তব্য আমি শেষ করে ফেলবো।

রোজা কোনো জবাব দিল না…নিশানাথও গম্ভীর।

দু'জনে নিঃশব্দে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল এবং গাড়ী আসিল সুশীল চাটার্জীর গৃহে।...

রাত্রে নিশানাথ আহার করিল না, ফুল্লরাকে বলিল—আমায় বড্ড মাথা ধরেচে, ফুলু। আমি শুয়ে পড়ি। যদি ঘুম না ভাঙ্গে, কেউ যেন আমায় না ডাকে।

ফুল্লরা বলিল,—ওষুধ খাবে?

ম্লান-মলিন মৃদু-হাস্যে নিশানাথ জবাব দিল,—ওষুধের দরকার নেই। ঘুমোলেই সেরে যাবে'খন।

নিশানাথ গিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল। ফুল্লরা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বড়দা সারাদিন বাহিরে বাহিরে কাটাইয়াছে—সঙ্গে ছিল রোজা। নিশ্চয় দু'জনে...

ফুল্লরার মাথা ঘুরিয়া গেল। কাছে সোফা ছিল,—সোফায় বসিল। চিন্তার তরঙ্গ সাগরের ঢেউয়ের মতো মনকে নিমেষে আঘাতে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

ছেলেবেলা হইতে আজিকার দিন পর্য্যন্ত—প্রতি নিমেষের সহস্র কথা সে চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া আসিল।

সেই নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত জীবন-ধারা...একটিমাত্র লক্ষ্য লইয়া ধরণীর পথে সে অগ্রসর হইতেছিল। তার পর...

সুশীল চাটার্জী...সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের জটিল প্রবাহ! অধীর মন কোন্‌টার পিছনে না ছুটিয়াছে! ছুটিয়া কি পাইয়াছে? কোনোটায় সঙ্গে মনকে মিলাইতে পারে নাই! কেন?

এ প্রশ্ন প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া মনকে পিষিতে লাগিল!

জীবনে সবার আগে মানুষ চায় শান্তি, তৃপ্তি! সে-ও তাই চাহি-

য়াছে! স্বামীকে বলিয়াছিল মিলনের সেই প্রথম ক্ষণে,—you live your own life, and I mine...(তুমি তোমার জীবনে বাঁচো, আমি বাঁচিতে চাই আমার জীবনে)···তার অর্থ? স্বামী তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি বিকশিত করিয়া তুলিবেন এবং সে করিবে তার!

সে বিদ্যা বুদ্ধি-বিকাশের ক্ষেত্র···?

পৃথিবী যেন :সরিয়া সরিয়া সুদূর-প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে! এ সীমাহীন প্রসারের শেষ কোথাও নাই! একটা জীবনে মানুষ ও-অসীমের পিছনে কত ছুটিবে?

প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠিল! ধু-ধু মরু-প্রান্তরে সে চলিয়াছে··· আশে-পাশে কোথাও এতটুকু স্নিগ্ধ ছায়াময় তরু-কুঞ্জ নাই···এক বিন্দু জল নাই! মাথার উপর প্রখর সূর্য্য অনল-তাপ বর্ষণ করিতেছে!··· তার উপর এ প্রান্তর-পথের কোনো হদিশ সে জানে না!

সেই স্কুল লইয়া মাতন...বন্যা-রিলিফের কাজে অজানা সঙ্কট-ভূমিতে বিচরণ···থিয়েটারের রিহার্শাল লইয়া মত্ত উচ্ছ্বাস...কত রকমের লোক আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে···আবার কোথায় তারা চলিয়া গেছে...

ফুল্লরার চোখের সামনে সমস্ত অতীত যেন ছায়ার বেশে সরিয়া সরিয়া চলিয়াছে! কোনোটা দাঁড়ায় না যে দু দণ্ড ভালো করিয়া তার পানে চাহিয়া দেখিবে!

পাশে কণ্ঠস্বর জাগিল,—ফুলু···

চমকিয়া ফুল্লরা চাহিয়া দেখে, স্বামী।

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—তোমার দাদা কি বললেন? রোজাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারলেন?

নিশ্বাস! সে নিশ্বাস রোধ করিয়া ফুল্লরা কহিল—জানি না! জিজ্ঞাসা করিনি। বড়দা এসেই শুয়ে পড়েচে···বললে, মাথা ধরেছে!

সুশীল চাটার্জী শুধু বলিলেন,—হুঁ।...

নিঃশব্দে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ফুল্লরার মনের উপর হইতে সে মরু-প্রান্তর তার কঠিন পাহাড়ের বিকট ভার সরাইয়া লইতেছিল...মনে স্বস্তির হাওয়া! মনে হইল, বাঁচিয়া গিয়াছে! প্রান্তর-পথে যেন এক জন সাথী মিলিয়াছে।

ফুল্লরা উঠিয়া দাঁড়াইল। পা টলিতেছে। সুশীল চাটার্জী লক্ষ্য করিলেন, ফুল্লরার হাত ধরিলেন, কহিলেন,—তোমার পা কাঁপছে...

ফুল্লরা বলিল,—কেমন ভয় করছিল...

ভয়!

ফুল্লরা হাসিল।...গায়ে রোমাঞ্চ-রেখা!

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—কিসের ভয়?...এসো, বারান্দায় বসি দু'জনে। আজ অবসর করে নিয়েছি...feeling tired and I must refresh myself with your company (বড় শ্রান্ত! তোমার সঙ্গে বসিয়া একটু তৃপ্তি পাইতে চাই)।

ফুল্লরার মনে হইল, এতক্ষণ শূন্যে নিরবলম্ব কোথায় সে ভাসিয়া চলিয়াছিল—স্বামীর কর-স্পর্শে মাটীতে যেন আশ্রয় পাইয়াছে, অবলম্বন মিলিয়াছে! সে বলিল—চলো।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অঘটন

সকালে উঠিয়া নিশানাথ চলিল উমাচরণ বাবুর গৃহে। বুকে স্পন্দন চলিয়াছে তীব্র-রকম। বহুবার মনে হইয়াছে, থাক এ গণ্ডগোল! রোজাকে লইয়া শীলোনে চলিয়া যাই। কিন্তু পরক্ষণে ভাবিয়াছে, রোজা

নিজের মেয়ে! কঠিন সত্যকে যদি এখন দু'হাতে ঠেলিয়া রাখি, পরে…? হয়তো নিশানাথ তখন ইহলোকে থাকিবে না!…নিজের মেয়ের সম্বন্ধে উদাসীন রহিবে?

উমাচরণ বাবুর গৃহে গিয়া দেখে, উমাচরণ বাবু গম্ভীর মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন! নিশানাথকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—আসুন…

নিশানাথ কহিল—বেশীক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। মানে, কি স্থির হলো?

উমাচরণ বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন,—আপনি সে কথা জানলে মনে ব্যথা পাবেন। কিন্তু ব্যথার কথা ভেবে রোগের বৃত্তান্ত গোপন করে তো লাভ নেই!

ভূমিকা শুনিয়া নিশানাথের বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

টেবিলের ড্রয়ারের মধ্য হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া উমাচরণ বাবু সে চিঠি দিলেন নিশানাথের হাতে। চিঠি দেখিয়া নিশানাথ চমকিয়া উঠিল…রোজার হাতের লেখা। উমাচরণকে রোজা চিঠি লিখিয়াছে।

সে চিঠি!…যে-বাপকে এমন চিঠি পড়িতে হয়, তার দুর্ভাগ্য কতখানি, নিশানাথ তার কল্পনাও করে নাই—কখনো না!

রোজা চিঠিতে লিখিয়া জানাইয়াছে—তার জীবনের পথে সনাতন একা নয়,—বহু বন্ধু আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সনাতনের সঙ্গে রোজার অন্তরঙ্গতা এমন নয় যে, দু'দিনের মেলামেশার জন্য চির দিনের মতো নিজের জীবনকে রোজা বাঁধিয়া দিবে সনাতনের সঙ্গে! না, না…সনাতনকে সে মুক্তি দিতে চায়। পিতার সঙ্গে রোজা এ ব্যাপারের বোঝাপড়া করিতে পারিবে ইত্যাদি।

চিঠি পড়িয়া নিশানাথ স্তম্ভিত! এই তার মেয়ে! এই মেয়ের জন্ম সে ভাবিয়া সারা! এই মেয়ে···

নিশানাথের মনের মধ্যে আগুন জ্বলিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—তা হলে সব চুকে গেছে। আমিও বেঁচেছি। আপনি ক্ষমা করবেন। মিথ্যা আপনাকে বিরক্ত করে গেছি!

উমাচরণ বাবু কহিলেন,—আপনার কোন অপরাধ নেই! এক্ষেত্রে কোনো বাপ উদাসীন থাকতে পারে না!···

নিশানাথ প্রস্থানোদ্যত হইল। উমাচরণ বাবু কহিলেন—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি। আমি ছেলেমেয়ের বাপ—আপনিও তাই···মানে, সে হিসাবে আমার একটু কথা আছে।···মেয়েটিকে এখানে আর রাখবেন না। নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। নিজের কাছে কাছে রাখবেন। শুধু রাখা নয়, এত বড় মেয়েয় বিয়ে যখন দ্যাননি, তখন তাকে সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখবেন। পৃথিবীর পরিচয় যেন সে জানতে পারে! পৃথিবীর সত্যকার পরিচয় তার কাছে গোপন রাখবেন না।··· তবে সব চেয়ে ভালো হবে যদি তার বিয়ে দিতে পারেন। আমার যতখানি অভিজ্ঞতা, তা থেকে বলতে পারি, মেয়েদের স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে গড়ে তোলবার বাসনা খুবই সাধু,—কিন্তু কে গড়বে? আমরা? আমরা নিজেরা যখন গড়ে উঠিনি, তখন অপরকে গড়বো কি করে? এ ব্যাপারের সম্পর্কে যেটুকু আমি তদারক করেছি, তাতে এও বুঝেছি, এ-দলটি···যাকে বলে, বোহেমিয়ান্···তাই। মান-ইজ্জৎ, দেহ-মনের দাম, সম্ভ্রম-মর্য্যাদা তার কিছু এরা জানে না, বোঝে না। এবং বুঝতে বা জানতে চায় না! এ-রকমভাবে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি না। তবে হ্যাঁ, আপনার যদি সে-মত না হয়···

ম্লান-মৃদু হাস্যে নিশানাথ বলিল—দেখবো, আপনার উপদেশ কত-খানি শিরোধার্য্য করতে পারি···

নিশানাথ চলিয়া আসিল...

পথে আসিয়া ভাবিল, কোথায় যাই ? চলার পথ যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। এই যে ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে, পয়সা রোজগারের জন্য এই যে পরিশ্রম, উদ্বেগ, আকুলতা···এ পয়সা কেন ? আরামে থাকিবে ? সে-আরাম মানুষ চায় স্ত্রী-পুত্রকে কেন্দ্র করিয়া! হয়তো এমন মানুষ আছে—স্ত্রী-পুত্রের সুখের ধার ধারে না! তাদের জীবন শুধু নিজেদের লইয়া। তারাই সুখী!

সে'ও তো তাই ভাবিয়াছিল; এবং নিজের আরাম, নিজের সুখের কথা ভাবিয়াই রোজার মাকে বিবাহ করিয়াছিল—নিজেদের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া! এত ভালোবাসিয়া, মা-বাপ সকলকে ছাঁটিয়া যে-স্ত্রীকে অবলম্বন করিয়াছিল, সে স্ত্রীর কাছে কি পাইয়াছে ?

সে না হয় স্ত্রী···কিন্তু রোজা ? নিজের মেয়ে রোজা! সেই রোজা নিমেষের জন্য বুঝিল না, বাপের একটা অস্তিত্ব আছে—বাপের মান আছে, ইজ্জৎ আছে! রোজার আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বাপের লক্ষ্য কতখানি!

মিথ্যা সে ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে! রোজা এ ছুটাছুটির মর্ম্ম বোঝে না, কোনো দিন বুঝিবে না।

মা-বাপের মতো হতভাগা আর নাই! যে-সন্তান বারে-বারে আঘাত দেয়, তার জন্য মা-বাপের কি এ আকুলতা!

পথে নিশানাথ স্থির করিয়া ফেলিল, মেয়ের জন্য লোকের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ানোর মতো দুর্ভাগ্য আর বহন করিবে না! তার চেয়ে রোজাকে লইয়া শীলোনে ফিরিবে।

গৃহে ফিরিয়া নিশানাথ দেখে, সেখানকার বাতাসে দারুণ চাঞ্চল্য।

ফুল্লরা ডাকিল,—দাদা···

নিশানাথ কহিল,—কি বলচো ফুলু ?

ফুল্লরা কহিল,—একবার এ-ঘরে এসো···

ঘরে আসিয়া নিশানাথ শুনিল, রোজা এখানে নাই। চলিয়া গিয়াছে,—ফুল্লরাকে ছোট কথায় বলিয়া গিয়াছে, এখানে সে থাকিবে না। তার জন্য আর-কাহারো মাথা ব্যথার কোনো প্রয়োজন নাই। নিজের উপায় নিজে করিবে···তেমন সামর্থ্য তার আছে! এ বয়সে কাহারো কাছে সে কোন কাজের কৈফিয়ৎ দিতে পারিবে না—কৈফিয়ৎ দিবে না।

ফুল্লরার দুই চোখে দারুণ উদ্বেগ!

নিশানাথ হাসিল. কহিল,—রোজা এখানে নেই ?

—না দাদা। আমি চুপ করে বসে আছি তোমার পথ চেয়ে। উনি আছেন বাইরে কন্‌শালটেশনে··তুমি বাড়ী নেই, চাকর-বাকরের কাছে কোনো কথা তুলতে পারি না! বলতে পারি না, কোথায় গেল রোজা ? খোঁজ করো···

নিশানাথ কহিল—সে জন্য এত দুর্ভাবনা কেন, ফুলু ? বেঁচে গেছি যে রোজা আমায় ছুটি দেছে। সে জন্য মুখ-ভার, মন-ভার কেন ?

—দাদা···

নিশানাথ কহিল,—আমি গিয়েছিলুম উমাচরণ বাবুর কাছে। রোজা সেখানে তাঁদের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছে—অনেক কথা। জীবনে নীতিজ্ঞতার কোনো পরিচয় আমি দিতে পারি নি, তবু সে-চিঠির কথা মনে করতে আমারো বুক লজ্জায় দুলে ওঠে! সে কথা

যাক্, আমি বেঁচে গেছি। জীবন-ভোর শুধু পাপই করেছি,—এত বড় বিপদে যে মুক্তি পেলুম, এ শুধু মা আর বাবার পুণ্যে, ফুলু।... এখানকার কাজ চুকলে আমি সীলোনে ফিরবো। বাঙলা দেশকে মূঢ়তা-বশে ত্যাগ করে গেছি, তাই বুঝি এত বাসনা সত্ত্বেও আর এ বাঙলা দেশে ফিরতে পারছি না। বাঙলা দেশের মাটিতে বুঝি আমার আর স্থান হবে না। রাক্ষসের দেশ লঙ্কা-দ্বীপ···না রে? সেইখানেই আমার জন্যে মাটী রিজার্ভ আছে।

নিশানাথ হাসিল।

ফুল্লরা কহিল,—রোজার কোনো সন্ধান করবে না?

নিশানাথ কহিল—লাভ?

ফুল্লরা কহিল,—মেয়ে! সে পর নয়, পথের লোক নয়।

নিশানাথ বলিল,—সে-কালে ছেলেমেয়ে ছিল কামনার ধন। একালে তা আর হচ্ছে কৈ? আমাদের নিজেদেরও দোষ আছে। সে কর্ম্মফল ভোগ করতে হবে ফুলু। এ বেদান্তের কথা নয়—সরল সহজ সত্য কথা। কর্ম্মফল মানুষ কবে এড়িয়েছে? এড়াতে পারে না। অসম্ভব।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খাঁচার বাহিরে

গৃহে এই অপ্রিয় আলাচনা—পিতার ভর্ৎসনা, এবং তাকে লইয়া এত কলরব—রোজার ভালো লাগিল না! তার বয়স হইয়াছে—সে মাটীর মানুষ নয় বা কাহারো ক্রীতদাস নয় যে সকল কাজে সকলের মুখ চাহিয়া বাস করিবে! সে মানুষের মত বাঁচিতে চায়! কৈফিয়তের কোনো ধার ধারিতে পারিবে না!

ওয়েলেশলি ষ্ট্রীটের কাছে ক্রেশেন্ট ম্যান্‌শন্‌স্‌! চার-তলা ফ্ল্যাট-বাড়ী। সেই বাড়ীর তিন তলায় সে একখানা কামরা ভাড়া লইল। সজ্জিত কামরা। পয়সা-কড়ি হাতে কিছু ছিল। নিশানাথ যে টাকা পাঠাইত, সুশীল চাটার্জ্জী কিংবা ফুল্লরা কোন দিন তাহা স্পর্শ করে নাই; সে টাকাটা রোজার হাতেই পৌঁছিত; এবং সে-টাকা ধর্ম্মতলার ছোট একটি ব্যাঙ্কে সে জমা দিত। তাহা হইতে সখের যা-কিছু ব্যয়, তাহা করিত।

ক্রেশেন্ট ম্যান্‌শন্‌সে কামরা লইয়া সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অধীনতার নাগপাশ হইতে আজ মুক্তি মিলিয়াছে।

ভবিষ্যৎ? টাকার উপরে সে ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু টাকার অভাব কেন ঘটিবে? টাইপিষ্টের কাজ করিবে। নয়, ক্যানভাসার, শপ্‌-গার্ল। ফিল্ম-ল্যাণ্ড আছে। বিবাহ করিয়া দাস্তে সারা জীবন নিয়োগ করিবে, সে কথা মনে করিতে রোজা যেন শিহরিয়া ওঠে।

সন্ধ্যার পর সাজসজ্জা করিয়া সে গেল সিনেমায়। বন্ধু-বান্ধবের অভাব ছিল না; তাদের সঙ্গে দেখা করিল না। যে সব অপ্রিয় ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, মনে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। সবচেয়ে বেশী বাজিতেছিল সনাতনের কথা! যে ভাবে বিবাহ-প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, রোজা যেন পারিয়া!

আক্রোশে মন ফুঁশিতেছিল! সনাতন নিজেকে এত-বড় ভাবিল কি বলিয়া? রোজাকে বিবাহ করিলে তার জীবনটা যেন কালি হইয়া যাইবে! অথচ জুতা পরাইয়া দিতে রোজার পা দুখানি হাতে ধরিতে পারিলে সনাতন মনে করিত, হাতে স্বর্গ পাইয়াছে!...
ক্যাড্‌!

সনাতনকে রোজা কোনদিন কি মানুষ বলিয়া ভাবিয়াছে? তার পয়সায় মোটর-ট্রিপ—তার পয়সায় কার্ণিভাল; আমোদ-প্রমোদ। তাই শুধু সেই পয়সার খাতিরে সনাতনকে রোজা [illegible]ইয়াছে মুখের মিষ্ট কথা, হাসি; সঙ্গ-দানে তাকে চরিতার্থ করিয়া[illegible]।

এই সব দলের সহিত অন্তরঙ্গতা করি[illegible] রোজা নিজের দাম যেমন বুঝিয়াছে, তেমনি এ লোকগুলার মধ্যে [illegible]াকে কি ভাবে কতখানি ঘুরাইতে পারে, তাহাও তার বুঝিতে ব[illegible] নাই।

সনাতনকে বিবাহ? অসম্ভব! বা[illegible] উপর তার রাগ বা অভিমান শুধু এই কারণে! যেন সনাতন [illegible]কে বিবাহ না করিলে রোজার জীবন মরুভূমি হইয়া যাইবে! [illegible] বাপ নিজের মেয়ের দাম জানে না—নিজের মেয়ের জন্য পরের দ্ব[illegible] ভিখারীর মতো গিয়া দাঁড়াইতে পারে প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া, [illegible] বাপকে মানিয়া চলা রোজার পক্ষে সম্ভব নয়। এ সব ব্যাপার [illegible]গোড়া বিশ্রী, silly!

সিনেমার ইন্টারভ্যালে ছবির সঙ্গে রোজ[illegible] দেখা। ছবির সঙ্গে ছিল আরো দুইটি তরুণী এবং দুজন পুরুষ। ছবি বলিল—একলা এসেচো রোজা?

রোজা কহিল,—হ্যাঁ।

ছবি কহিল,—ভালোই হয়েছে। তোমার পিশিমার সঙ্গে আমার একটু দরকারী কথা ছিল। তাকে বলো, কাল দুপুর বেলায় আমি যাবো।

রোজা কহিল—আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না।

—কেন? ফুলু এখানে নেই?

রোজা কহিল—আছেন। আমি ও-বাড়ীতে থাকি না এখন, আলাদা আছি।

—আলাদা থাকো ?

রোজা কহিল—হ্যাঁ ।

বয় আইস-ক্রীম আনিল। রোজা কহিল—ইয়েস্...তারপর ছবির পানে চাহিয়া কহিল—নেবেন ?

—দাও ।

ছবি কহিল—তোমার বাবা বুঝি আলাদা বাসা নেছেন ?

রোজা কহিল—না। আমি ওঁদের সঙ্গে থাকি না···একলা আছি।

—ও !

ছবির মনে বিস্ময়-কৌতূহলের সীমা রহিল না। ছবি কহিল,—হঠাৎ···?

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না ; সঙ্কোচে বাধিয়া গেল।

ছবিকে রোজা ভালো করিয়াই জানে। মৃদু হাসিয়া রোজা কহিল—আসল কথা কি জানেন, বরাবর এক রকম ভাবে আমায় মানুষ করে এসে এঁরা এখন চান আমি সেই মামুলি' সেকেলে goody-goody ষ্টাইলে বাস করবো অর্থাৎ ওঁরা একটা পাত্র ধরে আনবেন এবং তাকে বিবাহ করে তার পায়ে দাসখৎ লিখে আমাকে বাস করতে হবে। যেন আমার নিজের কোনো দাম নেই, নিজের মন নেই, জীবনে কোন সাধ নেই, বাসনা নেই—পরগাছার মত বাস করতে হবে ! এমন জীবনে আমার ঘৃণা ধরে।

ছবির দলে যে দুটি তরুণী ছিল, তাদের মধ্যে একজনের কাণে এ-কথা প্রবেশ করিল। সে বলিল—ইনি মিষ্টার চাটার্জীর কে হন্—না ?

ছবি কহিল—হাঁ, মিসেস চাটার্জীর ভাইয়ের মেয়ে।

তরুণীটি বলিল—বেশ স্মার্ট ! ওঁকে দেখেছিলুম সে দিন ঐ ম্যাকেয়ার কোর্টে টেনিশ খেলতে। চমৎকার খেলেন।

রোজা কহিল—ছেলেবেলা থেকে টেনিশের দিকে আমার ঝোঁক আছে ভয়ঙ্কর। কাণ্ডিতে থাকতে গার্লস টুর্ণামেণ্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলুম।

তরুণী চাহিল পশের তরুণের পানে, ডাকিল,—মিষ্টার আয়ার...

তরুণটি জাতে মাদ্রাজী—নাম আয়ার। আয়ার বলিল,—Yes···

তরুণী কহিল,—এঁকে ধরো তোমাদের টেনিশ টুর্ণামেণ্টের জন্যে। এঁর কথা তোমাদের বলেছিলুম সেদিন···a niece of Mrs. Chatterjee...চমৎকার টেনিশ খেলেন।

আয়ার বলিল,—বেশ তো, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও···

আলাপ-পরিচয় হইল। আয়ার বলিল—কাল সকালে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবো,—আপনি এ টুর্ণামেণ্ট সম্বন্ধে নিশ্চয় interested হবেন মিস্···

রোজা কহিল—চৌধুরী। তার চেয়ে বলুন, রোজা···plain and simple রোজা···

ঘণ্টা-ধ্বনির সঙ্গে আলো গেল নিবিয়া; আবার ছবি সুরু হইল।

সিনেমা ভাঙ্গিলে রোজা কহিল,—আসি।

ছবি বলিল—কোথায় থাকো তুমি, চলো, এক সঙ্গে যাই, দেখে আসি।

রোজা কহিল,—আমি ট্রামে যাবো।

ছবি কহিল—আমাদের গাড়ী আছে। মিষ্টার ব্যানার্জ্জির গাড়ী। ইনি মিষ্টার ব্যানার্জী···হারীৎ ব্যানার্জী। তোমার পিসিমা এঁকে চেনেন।

যে-তরুণকে লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলা হইল, হাসিয়া সে রোজার দিকে চাহিল, চাহিয়া বলিল—যদি আপনার আপত্তি না থাকে···

রোজা কহিল,—আপত্তি থাকতে পারে না। আমাকে সম্মান করছেন।

হারীতের গাড়ীতে চড়িয়া ক'জনে আসিল ওয়েলেস্‌লির ক্রেশেণ্ট ম্যান্‌সন্‌সে। রোজা নামিল।

ছবি কহিল—রাত হয়ে গেছে, আজ নামবো না। আর একদিন আসবো। বিশেষ যখন তুমি একলা আছো, আমায় উচিত, মাঝে মাঝে এসে তোমায় দেখা···তুমি আমার নিকট-আত্মীয়···ফুলুর দাদার মেয়ে!

রোজা কহিল—আসবেন আপনি।

ছবি বলিল—কোন্ তলায় তুমি থাকো?

—তেতলায় দক্ষিণের কামরা।

আয়ার বলিল—আমি কিন্তু কাল আসচি মিস্ চৌধুরী।

রোজা কহিল—বেশ।

গাড়ী চলিয়া গেল। রোজা খুশী-মনে নিজের কামরায় আসিল।

বেয়ারা আসিয়া প্রশ্ন করিল—খানা মেম-সাব?

রোজা কহিল,—আধ-ঘণ্টা পরে।

আহারাদির পর রোজা ঘরের আলো নিবাইয়া খোলা খড়খড়ির ধারে চেয়ার টানিয়া আনিয়া চেয়ারে বসিল; বসিয়া বাহিরের পানে চাহিল।

যতদূর দেখা যায়, বাড়ীর পর বাড়ীর সার! নীচে পথ হইতে কোলাহলের একটা মিশ্র সুর ঊর্দ্ধে উঠিয়া বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে। যেন উপরের বাতাসে ও-কোলাহল থিতাইতে পারে না! উপরে ও-কোলাহল যেন অতি তুচ্ছ! ধূসর আকাশ জমাট স্তব্ধতা বুকে লইয়া পৃথিবীর পানে চাহিয়া আছে। আলোর অজস্র বিন্দু পথে-প্রান্তরে ইতস্ততঃ ছড়ানো—প্রাণের লক্ষ বাসনা-কামনা যেন বুকের কোটর ছাড়িয়া দিক্-প্রান্তে পড়িয়া আছে!

রোজা ভাবিতে লাগিল নিজের জীবনের কথা। ক'দিন সে এখানে আসিয়াছে—এই সহর কলিকাতায়। তাঁর পূর্ব্বে সেই সীলোন।

ফ্রক পরিয়া ছুটাছুটি করিত। মনে পড়িল, জীবনটা মনে হইত যেন ছোট গণ্ডী দিয়া কে ঘিরিয়া রাখিয়াছে! মনে হইত, পৃথিবী বড়, অনেক বড়। সেই অনেক-বড় পৃথিবীর মধ্যে কতটুকু জায়গায় সে বন্দী! মনে হইত, আকাশ ঐ চারিদিক্ দিয়া নামিয়া তার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া রাখিয়াছে! মনে হইত, সীলোন! তারপর আছে ইণ্ডিয়া…ইণ্ডিয়ার ওদিকে টিবেট, চায়না, আফগানিস্থান!··অপর দিকে প্রকাণ্ড সাগর, তার পূর্ব্বে জাপান। দূরে আমেরিকা।…এত বড় পৃথিবী…কোথায় বিন্দুর মতো সে পড়িয়া আছে!

মন হাঁফাইয়া উঠিত! সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র গণ্ডী—এ গণ্ডী অতিক্রম করিতে হইবে।

তারপর আসিল কলিকাতায়। এখানেও সেই গৃহ-প্রাচীর—প্রাচীরের বাহিরে ক্ষণেকের জন্য স্কুল।

সেখানে বন্ধু-বান্ধব, হাসি-গল্প, মুক্তির প্রবাহ।

ঐ মুক্তি-প্রবাহে জীবনকে ভাসাইয়া চলিবে। সাগর-বুকে তরঙ্গ আছে, গোপন-গিরি আছে, কুমীর আছে, হাঙ্গর আছে। থাকুক! তবু ঐ অসীমের বুকে তরঙ্গ ঠেলিয়া ভাসিয়া চলা…যদি বাঁচিতে চাও, বাঁচিবার মত বাঁচো! মরণ হয়, ক্ষতি নাই! এ-মরণ সে চায় ঐ মুক্তির বিরাট প্রবাহে!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আঘাত

মেয়ের জন্য নিশানাথ সত্যই কোনো সন্ধান করিল না। ফুল্লরা বার-বার বলিল,—দাদা, সত্যি তুমি…

ম্লান হাসি হাসিয়া নিশানাথ বলিল—না, ফুলু, তাকে আমরা রাখতে পারবো না। সে যখন আমাদের চায় না তখন মিছিমিছি ছুটাছুটি করে কোনো লাভ নেই।

তারপর এখানকার কাজ চুকিলে নিশানাথ চলিয়া গেল আবার সেই শীলোনে; যাইবার সময় বলিয়া গেল,—সায়েন্সে একটা কথা পড়েচিস্ তো ছেলেবেলায়,—reaction…সে কথাটা দুনিয়ার সব বিষয়ে খাটে। জলের বুকে ঢিল পড়লে ঘূর্ণীচক্রের সৃষ্টি হয়—সে ঘূর্ণীচক্র কেউ রোধ করতে পারে না। আমাদের জীবনেও ঠিক তেমনি হয়। মস্ত আবেগে আমি একদিন সকলকে ত্যাগ করে গিয়েছিলুম, তাই যার জন্য সকলকে ত্যাগ করেছিলুম, সেই স্ত্রী—সে আমাকে নিষ্ঠুর আঘাতে অপমানে, কলঙ্কে জর্জ্জরিত করে চলে গেল আমাকে ছেড়ে। মেয়ে রোজাও তাই করেছে। সেজন্য আমার দুঃখ নেই। দেশের মাটী, জল-বাতাস—এ'সবের দিকে না চেয়ে মনকে যদি নকল সাজে গড়ে তুলি, তাহলে সে-মনকে ব্যথা পেতে হবে। অনাচার বলে একটা কথা আছে, মা প্রায় বলতেন—সে কথার দাম আছে, ভাই।

নিশানাথ চলিয়া গেলে ফুল্লরার মন নানা চিন্তার তরঙ্গে দুলিতে লাগিল। সুশীল চাটার্জীর কাজের প্রসার আরো বাড়িয়াছে। তার

উপর পাঁচজনের কথায় তিনি দেশের পানে চাহিয়া দেখিতেছেন। দেশের রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি—সেগুলা যেন সুশীল চাটার্জীকে না পাইলে একান্ত নিঃসহায় নিরুপায় থাকিয়া যাইবে!

তাঁর অবসর নাই, পুরানো দিনের মতো ফুল্লরার সঙ্গে বসিয়া দুটা গল্প করেন। ফুল্লরার কাছে মিসেস দত্ত মাঝে মাঝে আসেন—আরো দু'চারিজন আসেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কথায় আলাপে ফুল্লরার মন ভরে না। কোথা দিয়া যে অন্তরাল রচিয়া উঠিয়াছে—ফুল্লরা নিজেকে একান্ত নিঃসঙ্গ ভাবে! যেন পথের মাঝখানে আপনাকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে! কোথায় যাইবে, কোন্ দিকে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না! সে যেন গতি-হারা!

বসিয়া বসিয়া ভাবে, যে জীবন-প্রবাহে ভাসিয়া চলিবে স্থির করিয়াছিল, সে-প্রবাহ ছাড়িয়া মোড় বাঁকিয়া কখন বদ্ধ জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছে; জানে না! ভাসিয়া চলিবে, উপায় নাই! বদ্ধ জলাশয়ে দেহ-মন একান্ত মন্থর অবসাদে ক্লান্ত। প্রতিক্ষণ কামনা করিতেছে, এমন কেহ নাই, এ বদ্ধ জলাশয় হইতে টানিয়া যে তাকে উদ্ধার করিয়া সচল জীবন-স্রোতে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়?

কেহ নাই! কেহ নাই!

আর সকলে কি লইয়া আছে, ফুল্লরা বুঝিতে পারে না। আরামে-শান্তিতে তারা বাস করিতেছে? কে জানে, হয়তো তাই। তাদের পানে চাহিলে মনে হয় না, অশান্তি বা অস্বস্তির ছোপ তাদের মনের কোথাও লাগিয়া আছে!

ফুল্লরার মনে হয়, চিরদিনকার পৃথিবী যেন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে! মাথার উপরকার ঐ নীল আকাশ যেন পৃথিবীর বুকের উপর নামিয়া আসিতেছে—কঠিন আবরণের মতো! রূপ-রস-সুর—সে আবরণের

নীচে ঢাকিয়া একাকার হইয়া যাইবে। প্রাণ তার থাকিয়া থাকিয়া হাঁফাইয়া ওঠে!

জীবনে কি ভিড় জমিয়াছিল—চারিদিকে কি বিচিত্র কলরব! স্কুল, থিয়েটারের রিহার্শাল, চ্যারিটি, বন্যা-রিলিফ, সেই বিরাট যাগ-যজ্ঞ—কোনো কিছুতেই মন ভরিল না তো! যেন দুদিনের নেশা! নেশায় মন আচ্ছন্ন হয়, তৃপ্তি পায় না। ফুল্লরা নিজের জীবনে ভালো করিয়া তাহা উপলব্ধি করিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় সেদিন সে গেল গঙ্গার ধারে। গাড়ী দাঁড় করাইল প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটের সামনে এবং গাড়ীতেই সে বসিয়া রহিল, নামিল না।

নদীর বুকে আঁধার নামিয়াছে; পথে ছুটিয়া চলিতেছে কত মোটর—সংখ্যা নাই!

ওপাশে লনের উপর ক'জন লোক পদ-চারণা করিতেছে। একজন বাঙালী ভদ্রলোক, সঙ্গে একটি মহিলা, চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। ছেলে-মেয়েরা ছুটাছুটি করিতেছে—মহিলাটি কাছেই এক বেঞ্চে বসিয়া আছে ভদ্রলোকটির পাশে। স্বামী-স্ত্রী। ওগুলি ছেলেমেয়ে।

অবিচল দৃষ্টিতে ফুল্লরা তাদের পানে চাহিয়া রহিল। একটি প্রশ্নের ভারে মন অধীর হইয়া উঠিল। মনে হইতেছিল, গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়া মহিলাকে প্রশ্ন করে—তোমার মনের কোথাও এতটুকু শূন্যতা আছে? কোনো অভাব? কোনো অভিযোগ? কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত জনকে এ কথা কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে?

মনে হইতে লাগিল, শিক্ষা-দীক্ষা এ-সবে কি ফল, মনে যদি স্বস্তি-সুখ না মিলিল? বাড়ী হইতে মাঠে আসিতে পথে অত গৃহ…ও-সব গৃহে কোনো নারী তার মতো এমন শূন্যতা বোধ করিতেছে? এমন অস্বস্তি?

মন হু-হু করিতে লাগিল। গাড়ীতে বসিয়া থাকা গেল না। ফুল্লরা

গাড়ী হইতে নামিল, নামিয়া লনে আসিল। পাদ-চারণা করিতে লাগিল। বুকে অধীর স্পন্দন!

ছেলে-মেয়েরা ছুটাছুটি করিতেছে। কি সাবলীল ভঙ্গী! জগতের কোথাও কোনো অশান্তি বা অস্বস্তি আছে, জানে না! সে যদি আজ উহাদের মতো অমনি মত্ত আবেগে ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতে পারিত!

কিন্তু ঐ খেলা লইয়াই জীবন?

তাও নয়! তবে?

বেঞ্চে বসিয়া ভদ্রলোকটির সঙ্গে মহিলার কি এত কথা হইতেছে? দেখিলে মনে হয়, ঘরে যেন দুজনের কথা শেষ হয় না—বাহিরেও সে কথার জের চলিয়াছে!

কাজ নাই? হয়তো কাজের ভিড়ে দুজনে এমন করিয়া ঘরে বসিয়া কথা কহিতে পারে না—তাই বাহিরে আসিয়াছে সে-কথা কহিবার জন্য।

প্রণয়-কাকলী?

স্বামীর সঙ্গে এতদিন ঘর করিয়াও ফুল্লরার কখনো এমন ঘটে নাই—মুক্ত আকাশ-তলে বসিয়া স্বামীর সঙ্গে কথার এমন উচ্ছ্বাস!

ফুল্লরা নিশ্বাস ফেলিল।

পা-দুখানা বড় শ্রান্ত। সে একটা বেঞ্চে বসিল; বসিয়া চাহিয়া রহিল এই পরিবারটির পানে।

মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়াইল; নাম ধরিয়া ছেলেমেয়েদের ডাকিল—গৃহে ফিরিবে।

পথে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। ক'জনে গিয়া মোটরে উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিল যেন ফুল্লরার বুকের হাড়-পাঁজরার উপর দিয়া... সেগুলাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া!

ফুল্লরা ভাবিল, হয়তো আরাম আছে, আনন্দ আছে সব সংসারে! স্বামি-স্ত্রী ছেলেমেয়ে...প্রেম, স্নেহ, মায়া-মমতায় সুখ আছে, স্বস্তি আছে। নহিলে এতদিন ধরিয়া গৃহ-সংসারগুলা টিঁকিয়া আসিল কি করিয়া? তার মতো অস্বস্তি যদি সকল ঘরের মানুষকে সহিতে হইত, তাহা হইলে এ-সংসারের অস্তিত্ব কবে লোপ পাইত!

মন আকুল হইয়া উঠিল। ফুল্লরা বসিল না—গৃহে ফিরিল। সারা পথ গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতেছিল, স্বামীর সামনে গিয়া বলিবে, আমার বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। শূন্য মন লইয়া এ ঐশ্বর্য্য আর ভোগ করিতে পারি না। ঐশ্বর্য্যে মন ভরে না গো, মন ভরে না! আমায় তুমি কাছে ডাকিয়া লও। কথা কও,—এমন কথা—যে-কথায় আমার মন আশ্রয় পায়, অবলম্বন পায়!

গৃহে ফিরিয়া দেখে, গাড়ীর ভিড়। স্বামীর ঘরে বহু লোক জমিয়াছে—কোলাহল-কলরবের অন্ত নাই।

[illegible] মলিন মুখে ভারী মন লইয়া ফুল্লরা সোফায় হেলিয়া পড়িল।

ঘর নয়, যেন কারাগার! বেদনায় ছেঁচিয়া পিষিয়া মন যেন নিশ্চেতনতার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছেন!

চেতনা ফিরিতে দেখে, সামনে বনলতা।

চমকিয়া ফুল্লরা উঠিয়া বসিল, কহিল,—বনলতা!

হাসি-মুখে বনলতা কহিল—আপনার কাছে এসেছিলুম।

—বসো।

বনলতা বসিল। ফুল্লরা কহিল—ভালো আছ?

হাঁ।

ফুল্লরা কহিল—স্বামী ভালো আছেন?

—হাঁ।

ফুল্লরা কহিল—রাজসাহীতে আছো তো ?

বনলতা বলিল—স্বামী বদলি হয়েছেন হুগলি কলেজে। এখন ছুটী আছে। কলকাতায় এসেছি। মানে…

বনলতার কপোলে সরমের রাঙা-আভা। ফুল্লরা লক্ষ্য করিল। বনলতা মাথা নত করিল।

ফুল্লরা কহিল—কি ? বলো…

সরম-সঙ্কোচে-ভরা নয়নে বনলতা বলিল,—আমার ছেলের অন্নপ্রাশন হবে কাল। সেজন্ত আপনাদের আশীর্ব্বাদ কামনা করি। দয়া করে' কাল একবার আমার ওখানে পায়ের ধুলো দিতে হবে।

মনে কোথায় যেন আঘাত লাগিল। একটা নিশ্বাস...সে নিশ্বাস রোধ করিয়া ফুল্লরা বলিল—বটে ! তোমার ছেলে হয়েছে ! শুনে ভারী খুশী হলুম…

বনলতা কোন জবাব দিল না। লজ্জা-রাঙা অধরে মৃদু হাসির অমলিন দীপ্তি ! ফুল্লরার অন্ধকার বিরস মনে সে দীপ্তির স্পর্শ লাগিল।

বনলতা বলিল,—যেতে হবে।

ফুল্লরা কহিল—নিশ্চয় যাবো।…

ফুল্লরা বনলতার পানে চাহিল,—যেন আনন্দের প্রতিমা ! এই বনলতা কি কষ্ট সহিয়া, কি ধৈর্য্য করিয়া একদিন মাষ্টারী করিয়াছে ! লেখাপড়া শিখিয়া সেই সংসারের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে…এ গণ্ডী কেমন লাগে ? কহিল,—শুধু সংসার করচো ? না, কোনো রকম প্রফেশন ?

মৃদু হাস্যে বনলতা কহিল—না। সংসার নিয়ে আছি। সময় কোথায়, আর কিছু করবো ?

—অস্বস্তি বোধ করো ?

—না। সংসার আমার খুব ভালো লাগে।

তাই। সব মেয়েরই বোধ হয় সংসার ভালো লাগে! সংসারে এমন মায়া এবং সে মায়ায় সকলে এমন ভুলিয়া থাকে যে, দুনিয়ার আর কোনো দিকে চাহিয়া দেখিবার কথা মনে থাকে না! ফুল্লরা ভুল করিয়াছে? স্বামী চাহিতে বাধে নাই—বাধিয়াছে শুধু স্বামীর সঙ্গে সংসার করিতে! এ যে বড় অদ্ভুত খেয়াল! মাটীর পৃথিবীতে বাস করিব, অথচ মাটীকে করিব তুচ্ছ—পৃথিবীর মাটী স্পর্শ করিব না! তা কখনো হয়?

তা হয় না বলিয়াই ফুল্লরার মন আজ শূন্যতায় ভরিয়া এমন খাঁ-খাঁ করিতেছে।

বনলতা বলিল, স্বামীর প্রেমে তার কোথাও কোনো অভাব নাই! অতীত দুর্দ্দিনের কঠিন স্মৃতি মনের কোণে ছোট রেখার আকারেও পড়িয়া নাই! এ যে কি সুখ…কতখানি আনন্দ…

বনলতা চলিয়া গেল,—প্রতিশ্রুতি লইয়া গেল, কাল সন্ধ্যার সময় ফুল্লরা যাইবে তার গৃহে ছেলেটিকে আশীর্ব্বাদ করিতে। ছেলে যেন সুস্থ দেহে-মনে বাস করে—সে যেন মানুষ হয়।

সেদিন সে বিবাহ করিয়াছে—ইহার মধ্যে ছেলের উপরে এত মায়া, এমন স্নেহ! ছেলের কথা বলিতেছিল প্রাণের কি পরিপূর্ণ আবেগে! এ ছেলে কোথায় ছিল দুদিন আগে—আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বনলতার সমস্ত নিখিল ভরিয়া দিয়াছে!

সকল সংস্কার চূর্ণ করিয়া পায়ে দলিয়া নারীর চিরন্তন কামনা ফুল্লরার মনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ছেলে! ছেলে! সেই ছেলের মা ফুল্লরা!

নিজের ছেলের কথা তার মন হইতে মুছিয়া দিয়াছ, ভগবান! বেড়াইতে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে মায়ের চোখ লইয়া ছেলেমেয়েদের আনন্দ মেলা! বনলতা আসিয়া বলিয়া গেল মাতৃত্ব-গৌরবের ইতিহাস।

মা হইয়া ছেলেকে বুকে লইবে, এ সাধ তার বুকে কখনো জাগে নাই! আশ্চর্য্য!

সুশীল চাটার্জী আসিয়া কহিলেন—এই যে তুমি! কি যেন স্বপ্ন দেখছো! আমার পানে অমন-চোখে চেয়ে আছ যে!

ফুল্লরা নিশ্বাস ফেলিল।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—অসুখ করেনি তো?

—না।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন—জানো, কাউন্সিলে দাঁড়াচ্ছি! সকলে ভারী ধরেছে…to oblige…তা ছাড়া ভাবচি, একটা মান, ইজ্জৎ…কি বলো তুমি?

উদ্গত নিশ্বাস রোধ করিয়া ফুল্লরা বলিল,—ভালো।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—সামনে ছুটী আসছে। একবার বেরুতে হবে মফঃস্বলে। সকলে বলছে, যাওয়া দরকার মানুষ-জনকে চিনতে জানতে; নিজের পরিচয় দিতে।

সুশীল চাটার্জী ফুল্লরার পানে চাহিয়া রহিলেন। ফুল্লরা বুঝিল, স্বামী তার তার উত্তরের প্রার্থী। বলিল,—বেশ।

বুকের মধ্যে অশ্রুর পাথার উথলিয়া উঠিল; নিজের নিরুপায় নিঃসঙ্গতার কাহিনী বলিয়া স্বামীর কাছে কত-কি প্রার্থনা করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু স্বামী মাতিয়াছেন খ্যাতির মোহে!

পুরুষ-মানুষ! শক্তি আছে! সে শক্তির বিকাশ চান্! সে সম্ভাবনার স্বপ্নে স্বামীর মন ভরিয়া আছে! ও-মনে তার স্থান কৈ? কি প্রার্থনা লইয়া হীন ভিখারীর মতো সে দাঁড়াইবে আজ স্বামীর কাছে?

মন রুখিয়া নিষেধ তুলিল, না! ভিক্ষায় দরদ-স্নেহ মিলে না।

আপনা হইতে যেখানে দরদ-স্নেহ উৎসারিত হয় না, সেখানে ভিক্ষা চাহিয়া তাহা পাওয়া যায় না।

ভিক্ষা সে চাহিবে না, চাহিতে পারিবে না! অভাবের বেদনায় মরিয়া গেলেও ভিক্ষা চাহিবে না!

ফুল্লরা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—আর কোন কথা আছে?

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—না।

মানস-নয়নের সামনে জাগিতেছিল বিরাট কলধ্বনি—মান যশ খ্যাতি গৌরব! সে দৃশ্যের অন্তরালে ফুল্লরার বেদনা চাপা পড়িয়াছে। ফুল্লরা তাহা বুঝিল। সে দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাতাসের দোলা

ফুল্লরার মন আক্রোশে ফুঁশিয়া উঠিতেছিল। তুমি পুরুষ, তাই তোমার সামনে হাজার পথ খোলা! যে পথে খুশী, তুমি চলিবে! আর নারী বলিয়া এই ছোট গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া দুঃখে হতাশ্বাসে গুমরিয়া মরিব আমি!

আমায় তুমি কি দিয়াছ? বড় লোকের যেমন বাড়ী থাকে, গাড়ী থাকে, সৌখীন আসবাব থাকে—তেমনি থাকে রূপসী স্ত্রী...বড়লোকের বড়ত্বের তারিফ চারিদিকে বিঘোষিত করিবে বলিয়া!

কিন্তু আমি কি তোমার সেই স্ত্রী? দেহে শুধু রূপের দীপ্তি লইয়া বিশ্বজনের সম্ভ্রম-শ্রদ্ধা কুড়াইব? মনে আমার যে দীপ্তি আছে···

সে দীপ্তির জোরে কোন্ দিকে কি আলো না বিকীর্ণ করিতাম!

ছবির কথাই ঠিক। যদি শক্তি থাকে, সে শক্তির চমক কেন দিব

না? তার স্বামী আনওয়ার চাহিয়াছে খ্যাতি, মান—ছবিও তাই চাহিয়াছে। স্বামী তাকে নিষেধ করিয়াছিল, না! তোমার শুধু ঘর-সংসার,—খ্যাতি-মানে স্বামীর অধিকার; তোমার নয়। ছবি সে কথা মানে নাই।

মানে নাই বলিয়া ফুল্লরা অনুযোগ করিয়াছিল। সে অনুযোগ মিথ্যা। স্নেহ-দয়া যদি পাই, কোন মতে ভুলিয়া থাকিতে পারি—ঐ বনলতার মতো! তা নয়, শুধু ভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকিব—এত তুচ্ছ ভাবো তোমরা নারী-জাতিকে!

রোজার কথা মনে পড়িল। রোজার মায়ের কথা মনে পড়িল। ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল। তারা শক্তি বিকশিত করিতে চাহে নাই—তাদের মনের গতি রসাতলের দিকে! রোজা যে স্বাধীন-মনের গর্ব্ব করে, সে স্বাধীনতা নয়—স্বেচ্ছাচার। সে নেশা। নেশার সঙ্গে মনের বিকাশের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

ভালোবাসার কথায় চিরদিন মনে হইয়াছে—কাব্য! নভেলিয়ানা! হাতে হাত রাখিয়া ভালোবাসো? ভালোবাসি! এ যে হাস্যকর ছেলেমান্সী! ভালো যদি বাসো, মুখে তাহা বলিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন কি? ভালোবাসা তো মুখের কথা নয়—মনের ব্যাপার! ভালোবাসা বেসাতি-পণ্যের বিজ্ঞাপন-প্রচার নয়! সে মনের আবেগ—সে কথার ভর সহিতে পারে না!

স্বামী ভালো বাসিয়াছেন তাঁর ব্যবসাকে, তাঁর ব্রীফগুলিকে। তাই এমন নিষ্ঠা-ভরে তাদের সেবা করিতেছেন চিরকাল। ফুল্লরাকে ভালোবাসেন?

আপন-মনে ফুল্লরা তত্ত্ব লইতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্বে সেই প্রে আলাপ—আবেগের উচ্ছ্বাস ...

করি, সে টাকায় তোমাকে তোয়াজ রাখিব। কিন্তু ছবি তো সংসার লইয়া মাতিয়া থাকিতে পারে না। সে চায় মান, যশ, খ্যাতি। রাণী-পদ্মিনী ছবি তোলা হইতেছে।

ছবি বলিল,—Leading lady রাণী পদ্মিনী সেজেছি। জোর গলায় বলতে পারি, রুথ চ্যাটারটন, নর্ম্মা শীয়ারারের মতো না হোক, তাদের চেয়ে নিরেস হবে না!

ফুল্লরা কহিল,—এ হলো তোমার ছবির পাব্লিসিটি। তোমার স্বামী অনোয়ারের কথা বলো।

ছবি বলিল,—বলছে, ছবির পালা শেষ করে দাও। এজন্য তোমার কোম্পানিকে খেশারৎ দিতে হয়, আমি দেবো। আমার সঙ্গে যদি না যাও, তাহলে তুটি মাত্র উপায় থাকবে অর্থাৎ restitution of conjugal rights, না হয় ডিভোর্স।

ফুল্লরা কহিল,—আমাকে চাই সলিশিটর হয়ে কৌশুলী ধরে দিতে হবে তোমার জন্য?

ছবি বলিল,—তামাসা নয়, ভাই। কোনো-কিছুর লোভে আমি ফিল্মের মায়া ত্যাগ করতে পারবো না, এ আমার স্পষ্ট কথা। তুমি একবার মিষ্টার চাটার্জ্জীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কও। আমি জানতে চাই, আনওয়ার জোর করে আমাকে এ কাজ থেকে সরাতে পারে কি না।

ফুল্লরা কহিল,— কিন্তু এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ···

ফুল্লরার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া ছবি জবাব দিল,—হাজার জন স্বামীর জন্যও আমি নিজের কেরিয়ার ত্যাগ করবো না, করতে পারবো না···when I am certain, I could make a mark (যখন নিশ্চয় জানি, এ পথে খ্যাতি লাভ করিব।) কেন? উনি স্বামী

আছেন, স্বামীই আছেন, তা বলে নিজে যাতে আনন্দ পাই, তা আমাকে ত্যাগ করতে হবে? আমি ওঁর সে স্ত্রী নই যে, রেঁধে-বেড়ে অন্ন দেবো, পা টিপে দেবো···বাঙলা দেশের পঞ্চাশ বৎসর আগেকার গিন্নী-স্ত্রী নই···I am his companion and mate··· এ সম্পর্ক বজায় রাখতে আমার অনিচ্ছা নেই। উনি করুন ওঁর কাজ—আমি করি আমার কাজ। তারপর কাজের শেষে দুজনে মিলবো ঘরে as lovers. (প্রেমিক-প্রেমিকার মতো)।

কথাগুলা ফুল্লরার মনে বাজিল আঘাতের মতো। বেদনার্ত্ত মন সে আঘাতে চূর্ণ হইবে, এমন সে তীব্র।

কথাটা শেষ করিয়া ছবি ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিল; তারপর ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া ছোট তুলি লইয়া কপালে গালে ঘষিয়া ছোট আয়নায় মুখ দেখিল, দেখিয়া আয়না রাখিয়া ফুল্লরার পানে চাহিয়া ছবি বলিল,—উপায় করো, ভাই। আমার সময় বড় কম। আজ স্যুটিং আছে বেলা তিনটেয় দমদমার মাঠে···ট্রাক, লোকজন সব সেখানে গেছে। আমাকে এখনি ছুটতে হবে।

ফুল্লরা কহিল—কিন্তু ও-ঘরে ভিড় কেমন, দেখেছিস?

—হ্যাঁ। গোলমাল শুনচি।

—ইলেক্‌সনের আয়োজন। তোমার মিষ্টার চাটার্জ্জী ক্যাণ্ডিডেট দাঁড়াচ্ছেন।

—বটে! ছবির দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

ফুল্লরা বলিল—তোর খুব আনন্দ হলো শুনে···না? তুই চাস কেরিয়ার, তোর মিষ্টার চাটার্জ্জিও চান কেরিয়ার।

ছবি কহিল—তুমিই শুধ রইলে বাকী। সত্যি, আমার বড় দুঃখ

হয়, যখন তোর কথা ভাবি। With such education and intelligence… (এমন বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়া)

ফুল্লরা হাসিল…হাসিয়া কহিল—কি করবো, বলতে পারিস, ছবি? তামাসা নয়, আমি তোর পরামর্শ চাইছি। ঘরের কোণে বসে বসে জীবনে ধিক্কার ধরে গেল! হেলাফেলা ছুটোছুটি করেছি একদিন—সে কাজের নেশায় নয়। মনকে বলতুম, পুরুষের সঙ্গে মেয়েদেরও সমান অধিকার, সে অধিকারকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করবো বলে। সে উপলব্ধির শিকড় অন্তরে ছিল না, তাই বোধ হয় দুদিনের ছুটোছুটিতে বাসনা-তরু মুঞ্জরিত হলো না, শুকিয়ে গেল। এখন হাঁফিয়ে মরচি এ আলস্যে। আমায় দিবি উপদেশ?

ছবি কহিল—দেবো। কিন্তু তার আগে আমার ব্যবস্থা! এই যে রীতিমত আতঙ্ক চলেছে মনে…যদি একটা কাণ্ড করে বসে আনোয়ার?

ফুল্লরা কহিল—একটু সবুর কর্। আমি না হয় শ্লিপ লিখে পাঠাচ্ছি।

সুশীল চাটার্জ্জী আসিলেন, ছবির কথা শুনিয়া পরামর্শ দিলেন—এ কারণে ডিভোর্শ হতে পারে না. Restitution of conjugal rights? তা সে মামলা দু-একদিনে ফয়শালা হবার নয়। আপনি চান ছবি তোলাতে, তোলান। তবে একবার আসবেন আমার কাছে…কেতাব-পত্র দেখে opinion দেবো। মানে, এই ছুটির পরে আসবেন। আমি এখন ব্যস্ত আছি। ক্ষমা করবেন।

ছবি বলিল—সে কথা শুনেছি। I wish you all success, Mr. Chatterji (আপনার সাফল্য কামনা করি সর্ব্বান্তঃকরণে, মিষ্টার চাটার্জ্জী)

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পথ-মাঝে

ছুটীতে সুশীল চাটার্জ্জী বাঙলার পল্লী-ভ্রমণে বাহির হইলেন; সঙ্গে চলিল নিশান-ধারীর দল। গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা চলিল। সেই সঙ্গে কোথাও হরি-সভার উন্নতি বা বারোয়ারির সংস্কার-কল্পে চাঁদা-বর্ষণ চলিল। দলের লোক বঙ্গ-জননীর দারুন দুর্দশার ছবি আঁকিয়া দেখাইতে লাগিল; সেই সঙ্গে সকলকে বুঝাইল, এবার সুশীল চাটার্জ্জী তুলি হাতে লইয়া শ্যামাঙ্গিনী মায়ের মলিন বর্ণে যে সোনালি রঙ ফলাইবেন, তাহাতে সকলের মন-নয়ন ঝলসিয়া যাইবে। অতএব, সাবধান ভাই সকল, মেকির মায়ায় ভুলিয়া নিজের ও দেশের সর্ব্বনাশ করিয়ো না; দেশের কৃতী সন্তান শ্রীযুত সুশীল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অবলম্বন করো।

রীতিমত শো! এ-শোয়ে কি মাদকতা!

সুশীল চাটার্জ্জী মানস-নয়নে দেখিলেন, কচুরি-পানার জঙ্গল ঠেলিয়া মা বঙ্গ-জননী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন! তাঁর দু'চোখের দৃষ্টিতে কি মিনতি! যেন সুশীল চাটার্জ্জীর পানে চাহিয়া বলিতেছেন, এতদিন কোন্ প্রাণে আমাকে ভুলিয়া ছিলি, বৎস!

সেজন্য বৎসের কুণ্ঠার সীমা নাই। কিন্তু দুঃখ কি একটা? না এক রকম? কোন্ দিকে কোন্ দুঃখ ঘুচাইবেন? এত অভাব কি করিয়া মোচন হয়?

সঙ্গীরা বলিল, ঐ কৌন্সিল! একবার ঐ কৌন্সিলে ঢুকিয়া পড়ুন, দেখিবেন, সেখানে সব মজুৎ! হাতে তুলিয়া শুধু দেশের বুকে ছড়াইয়া দিবার ওয়াস্তা!

যত বড় কঠিন মকর্দ্দমা হৌক, তার সুমীমাংসা করিতে সুশীল চাটার্জ্জী কখনো টলেন নাই! আজ দেশের মাটীতে দাঁড়াইয়া চারিদিকে সমস্যা দেখিয়া তাঁর বুক কাঁপিল। এ সমস্যার কথা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে কোনদিন তাঁর মনের কোণে উদয় হয় নাই।

কাগজে কাগজে এই পল্লী-অভিযানের কাহিনী ছাপিয়া বাহির হয়। ফুল্লরা কলিকাতায় বসিয়া ছাপা কাগজে সে কথা পড়ে। কি সমারোহ চলিয়াছে সেখানে! দেব-তরু-পত্র-পল্লবের মালা দুলিতেছে, শঙ্খ-ঘণ্টা-রোল উঠিয়াছে। মস্ত পাণ্ডাল—সে পাণ্ডালে জড়ো হইয়া সকলে স্বামী সুশীল চাটার্জ্জীকে অর্ঘ্য দিতেছে।

মনে পড়িল, বহুকাল পূর্ব্বে বন্যা রিলিফে সেই সমারোহের কথা। কাগজে আর-সব লেখা প্রায় মুছিয়া, উবিয়া গিয়াছিল, ছাপিয়া বাহির হইত শুধু তার কথা। সুভদ্রা জননী··ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল···Ministering angel!

আজ কোনো কাগজ ভুলিয়াও সে সুভদ্রা দেবীর কথা ছাপে না! কোথায় গেলেন সুভদ্রা দেবী? কি করিতেছেন? দেশের আর্ত্তি বেদনা সব কি মুছিয়া গিয়াছে—তাই আজ প্রয়োজনের সঙ্গে-সঙ্গে সুভদ্রা দেবীর নামও সকলে ভুলিয়া গেল? শুধু মুখের কথায় সুভদ্রা দেবীর অস্তিত্ব! হায়রে, পাব্লিক কাজের মত্ত আবেগ!

কোথায় তবে সুখ-স্বস্তি? এ মানের কীর্ত্তন কতক্ষণ? জলের বুকে অজস্র বিম্বের মতো চকিতে উদয় হইতেছে, চকিতে তার বিলয়! এ জলবিম্ব লইয়া মানুষ কি সুখে সুখী হইবে? এ জলবিম্বে তার মনের কোন্ কোণ পূর্ণ হইবে?

নিজের জীবনে সে দেখিয়াছে, যতটুকু দেখিবার সুযোগ মিলিয়াছিল, নাম, যশ, খ্যাতি, মান···সে সবে মন ভরে না।

বনলতার কথা মনে পড়িল। ছোট গৃহ! স্বামী! শিশুপুত্র! তার মন তাহাতেই ভরিয়া আছে কাণায় কাণায়। এত-বড় পৃথিবীতে কোথায় কি অভিযান চলিয়াছে, কোথায় কি যুগ-বিপ্লব—কোন্ গ্রহ কক্ষচ্যুত হইতেছে—চারিদিকে ঘটনার কত সমারোহ—সেদিকে সে ফিরিয়া তাকায় না! চাহিবার অবসর নাই! প্রয়োজনও নাই! সেজন্য তার কোথায় কি বাধিতেছে? ঘর, ঘর, ঘর! এ ঘরে বনলতা কি পাইয়াছে যার জন্য বাহিরের পানে তার কোনো লোভ, কোনো আকর্ষণ নাই?

ছবি? উল্কার মতো বুকে তীব্র দাহ লইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে! এ কি জীবন?

মিসেস দত্ত! স্কুল লইয়া কত সাধনা! কিন্তু প্রাণের মূল লাগিয়া ছিল সংসারে। সেখানে যেই আঘাত লাগিল, অমনি মনের সবটুকু গেল ছিঁড়িয়া চূর্ণ হইয়া!

চোখের সামনে মানবের সমাজ-সংসার তার চিরন্তন ধারায় ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রেম, স্নেহ, বিরাগ, বিঘ্ন, আশা, নিরাশা, সুখ, দুঃখ, জীবন-মৃত্যুর বিচিত্র তরঙ্গ-দোলায় দুলিয়া চলিয়াছে, ডুবিয়া যায় নাই! এবং মানুষ ঐ সব আশ্রয় করিয়া শান্তি পাইতেছে, সুখও পাইতেছে।—শত অভাব-অভিযোগেও সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করে নাই! এ কি সত্যই এতকাল ধরিয়া মানুষ মরীচিকার সাধনা করিতেছে?

ইভা! সেদিন তার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে। মুখে-চোখে সে দীপ্তি নাই—অঙ্গে লাবণ্য নাই! বলিতেছিল, অনিশ্চিতের পিছনে প্রচণ্ড দুরাশা লইয়া নিত্য এ ছুটাছুটি...আর সে পারে না! বড় ক্লান্তি-ভরে মন যেন মাটিতে লুটাইয়া পড়িতে চায়। সান্ত্বনার একটু ভাষা,

একটু দরদ চাহিয়া মন একেবারে আকুল! সে সান্ত্বনা, সে দরদকে দিবে? বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়।

হয়তো সংসারের বাহিরে আছে কোথাও শান্তির পাথার···ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তাই সংসার ছাড়িয়া বাহিরে গিয়াছিলেন,—পাইয়াছিলেন শান্তি, সুখ, আরাম!···বুদ্ধদেব···

কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের মেলায় সে কজন?··· একজন নাইটিঙ্গেল, একজন বুদ্ধ···

মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন ধূম-বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল!

সন্ধ্যার দিকে ফুল্লরা বেড়াইতে বাহির হইবে, টেলিফোনে আহ্বান আসিল।

—কে?

উত্তর আসিল, নাম বলিলে চিনিবেন না। চাই মিষ্টার চাটার্জীকে। মিষ্টার চাটার্জীর এক আত্মীয়ের প্রয়োজনে। কুমারী রোজা চৌধুরী বিপন্ন। দেখা করিতে চান। তিনি আছেন ১২ নম্বর টেম্পলটন ষ্ট্রীট, এণ্টালি।

আবার রোজা! এবং সে বিপন্ন!

ফুল্লরা কহিল,—মিষ্টার চাটার্জী এখানে নেই। আমি লোক পাঠাবো আপনার ঠিকানায়।

কিন্তু কাহাকে পাঠাইবে? কি বিপদ? পাঠাইয়া লাভ আছে?

বেয়ারাকে ধরিয়া রামগোপাল বাবুকে ডাকাইল। রামগোপাল বাবু আসিলে ফুল্লরা বলিল,—আপনাকে একবার এণ্টালি যেতে হবে। রোজা সেখানে আছে—কি না কি বিপদ হয়েছে···

রামগোপাল বাবু গাড়ীতে করিয়া এণ্টালি গেলেন; ফিরিলেন প্রায় দু'ঘণ্টা পরে—একা।

আকুল উদ্বেগ বুকে লইয়া ফুল্লরা বসিয়াছিল।

রামগোপাল বাবু ফিরিলে ফুল্লরা প্রশ্ন করিল—কি হলো?

রামগোপাল বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—সে কথা বলতে লজ্জা হয়, মা!

ফুল্লরা বিস্মিত হইল। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল,—তবু...

রামগোপাল বাবু কহিলেন, রোজা থাকিত কোথায় এক বোর্ডিং-হাউসে। হতভাগা সঙ্গী জুটিয়াছিল। তাদের সঙ্গে মোটরে বেড়ানো, সিনেমা, হোটেল—একটু-আধটু সুরা পান। সম্প্রতি এক হতভাগা বন্ধুর সঙ্গে গিয়াছিল জুয়েলার প্রতাপ জিউয়ের দোকানে। সেখান হইতে একটা দামী সোনার রিষ্ট-ওয়াচ লয়। বন্ধু চেক দেয়। সে চেক্ ফেরত আসে। প্রতাপ জিউ পুলিশ কোর্টে নালিশ করিয়া দুজনকে গ্রেপ্তার করায়। এণ্টালির এ-ভদ্রলোকটি পুলিশ কোর্টে ওকালতি করেন। মিষ্টার চাটার্জীর সঙ্গে রোজার সম্পর্কের কথা শুনিয়া তাকে জামিন করাইয়া নিজের গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। সেই প্রতাপ জিউয়ের পাওনা দেড়শো টাকা। সে টাকা আনিয়া দিলে তারা মামলা তুলিয়া লইতে রাজী আছে।

ফুল্লরা বলিল,—এ-টাকাটা আপনি দিয়ে আসুন, মাষ্টার মশাই—এ ব্যাপার যেন এইখানেই চোকে।

রামগোপাল বাবু বলিলেন—বেশ!...আর রোজা?

ফুল্লরা কি ভাবিল; তারপর বলিল,—না, এখানে তার আসা চলে না। সামলে রাখা সম্ভব হবে না। তবে তাকে বলবেন, যদি কিছু টাকা

চায়, পাবে—কিন্তু এই শেষ। যদি মানুষ হ'তে পারে, তবে যেন আমাদের আপন-জন বলে সে মনে করে। না হলে সে আমাদের কেউ নয়—আমরাও তার কেউ নই। তার বাবা বড় দুঃখে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন। এ-কথাটা তাকে বলবেন, মাষ্টার মশায়।

রামগোপাল বাবু বলিলেন—বলবো, মা।

ফুল্লরা কহিল—তাহলে সকালেই দয়া করে টাকাটা দিয়ে আসবেন, মামলা যেন তারা উঠিয়ে নেয়।

রামগোপাল বাবু চলিয়া গেলেন।

আকাশ যেন জমাট মেঘে ভরিয়া অন্ধকার! ফুল্লরা ভাবিল, কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি? দুনিয়ায় মানুষের চলার পথ এমন সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে যে, সে-লাইন ছাড়িয়া একটু এদিকে ওদিকে বাঁকিবার উপায় নাই। বাঁকিলে ··

সিধা পথ ছাড়িয়া সে-পথে যে গিয়াছে, আরাম পায় নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জয়-পরাজয়

মফঃস্বলে দিগ্বিজয় সারিয়া অক্ষৌহিণীসহ সুশীল চাটার্জ্জী গৃহে ফিরিলেন। ফুল্লরা দেখিল, স্বামীর নূতন রূপ! মাদকতার মোহে প্রমত্ত মন! কোর্টের কাজ-কর্ম্ম শিথিল। নানা জন আসিয়া কোলাহল তুলিয়া দিন কাটায়। ফুল্লরা কোথায় পড়িয়া আছে, সেদিকে সুশীল চাটার্জ্জীর দৃষ্টি নাই। আগে খুব বেশী দৃষ্টি ছিল, তা নয়,—তবু যেটুকু ছিল, এখন তাও নাই।

প্রতিদ্বন্দী দলের দামামা-নির্ঘোষ শুনা যায়! দশ-বিশখানা দৈনিক

পত্র গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে শুধু এই ভোটের ব্যাপার লইয়া ইতর টীকা-টিপ্পনী! সে কাগজগুলা এ বাড়ীতে আসে—দু'চারি খানা বাহিরের ঘর হইতে উড়িয়া ভিতরে আসিয়া পড়ে! ফুল্লরা সময় কাটাইবার জন্য সে-কাগজ খুলিয়া বসে···

যে-সব লেখা ছাপার হরফে দেখে, মন একেবারে রী-রী করিয়া ওঠে! ভদ্র শিক্ষিত সমাজে এ কি ইতর কুৎসা! এ কি বর্ব্বর ধারা! একজনের পক্ষ লইয়া অপরকে যে ভাষায় যে-সব কথায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলিয়াছে, তেমন ইতর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মঞ্চে চড়িয়া দেশের কোন্ মহাব্রত কোন্ মহাত্মা সাধন করিবেন, ভাবিয়া ফুল্লরা কূল-কিনারা পায় না!

রোজার মকর্দ্দমা চুকিয়া গিয়াছে—তার কোন সংবাদ নাই।

বসিয়া বসিয়া বসিয়া ফুল্লরা ভাবে অতীতের কথা! কি ভাবিয়াছিল, —জীবনটা কি হইয়া গেল!

বনলতা চিঠি লেখে। তার ঘর-সংসারের কথা লেখে; ছেলের কথা লেখে। পড়িয়া ফুল্লরা ভাবে, তার জানা একজন নারী তবু জীবনে আরাম পাইয়াছে!

ভোটের ব্যাপারে প্রমত্ততা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। অস্ত্রশস্ত্র শাণাইয়া যোদ্ধার দল সৈন্য-সামন্ত খাড়া করিতেছিল। এক দিন রব উঠিল, যুদ্ধং দেহি!

সারা সহর সে দিন মাতিয়া উঠিল। মোটরের ছুটাছুটি-হুড়াহুড়ি —লোকের চীৎকার—যেন আজিকার দিনের যুদ্ধশেষে বঙ্গ-জননীর আসনখানা এরা মনুমেণ্টের উপরে তুলিয়া দিবে।

সুশীল চাটার্জ্জী গৃহে নাই। গৃহের অবস্থা মুশাফিরখানার মতো! যে-সে লোক আসিতেছে, ভৃত্য-পরিজনকে যা-তা ফরমাশ করিতেছে

ফুল্লরার মনে জাগিতেছে একটি উপমা—কলেজের কেতাবে পড়া সেই প্যাণ্ডেমনিয়াম!

দুপুর বেলায় ছবি আসিয়া হাজির, বলিল,—আনোয়ার ডিভোর্সের নালিশ রুজু করিয়াছে। সে একদিন শুটিং দেখিতে গিয়াছিল। সেদিন শীন্ ছিল, রাণী পদ্মিনীর সহিত রাণা ভীম সিংহের প্রণয়-লীলা। ভীমসিংহ সাজিয়াছিল হারীত ব্যানার্জী। শীন্টা খুব touching··· অভিনয় খুব রিয়ালাষ্টিক হইল। শুটিংয়ের পরে ছবিকে লইয়া হারীত যায় কাশানোভায়। একটু শ্যাম্পেন পান করিয়াছিল, তারপর মোটর ড্রাইভ···

অর্থাৎ লোক লইয়া আনওয়ার তার পিছনে ছায়ার মত অনুসরণ করে। এবং ঐ হারীৎ ব্যানার্জ্জীর নামের সহিত ছবির নাম জড়িত করিয়া ডিভোর্শের মকর্দ্দমা···

হাসিয়া ছবি কহিল—তার ভয় করি না। It was a marriage for convenience—হোক ডিভোর্শ। হারীৎ ব্যানার্জী প্রমিস্ করেছে, he would marry me. হারীত আমাকে বিবাহ করতে পেলে ধন্য হবে, বলেছে। এক সঙ্গে আমরা ছবি তোলার কাজ নিয়ে থাকবো।

ফুল্লরা কোনো জবাব দিল না। ছবি বলিল—সত্যি ফুলু, ডিভোর্শ সিষ্টেম খুব ভালো। আনওয়ার অমন obstinately রুখে দাঁড়ালো! ভাবো, কি ভয়ানক স্বার্থপর! আমাকে বাঁদীগিরি করতে হবে—slave to all his wishes! এ যুগে মানুষ কি করে এ কথা ভাবে! এই সব স্বার্থপর স্বামীর জন্যে ডিভোর্শ-প্রথা চালানো উচিত। মিষ্টার চাটার্জী তো কৌন্সিলে ঢুকচেন—I wish him success···ওঁকে বলবো, ডিভোর্শ-বিল কৌন্সিলে প্রেস্ করতে!

ফুল্লরা এ-কথার জবাব দিল না। সে চুপ করিয়া শুনিতেছিল ছবির

কথা এবং আকুল দৃষ্টিতে মার পানে চাহিয়াছিল। স্বামী-স্ত্রী···বিবাহ না করো, তার অর্থ বুঝিতে পারি। কিন্তু বিবাহের পর একটু মনান্তর ঘটিলে স্বামী আর একটা স্ত্রী গ্রহণ করিবে, এবং স্ত্রী করিবে স্বামি-বদল!

এ কথা মনে হইলে মন বিরাগে ভরিয়া ওঠে! ছেলে-মেয়েরা কবে বলিবে, বাপ-মার সঙ্গে মন মেলে না, মা-বাপ বদল করিব! এ ব্যাপার যদি চলে তো যে সংসার রচিতে মানুষের এত সাধনা, সে সংসারের অস্তিত্ব কি করিয়া থাকিবে? মানুষ কার উপরে বিশ্বাস, নির্ভরতা রাখিবে?

অনেক রাত্রে সুশীল চাটার্জী ফিরিলেন। সঙ্গে লোকজন। বাহিরের ঘরে তর্ক চলিল। কেহ বলিল,—আপনি ভারী অন্যায় করেছিলেন ঐ হতভাগা বন্ধুটাকে প্রশ্রয় দিয়ে। আপনার নিমক খেয়ে আপনার শত্রুকে করলো সাহায্য!

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—বাঙলার মাটী! এ মাটীতে মীর জাফর, ভবানন্দ জন্মাবে না তো কি ভক্ত হনুমান জন্মাবে!

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—আমি ওকে ধরেছিলুম···পাঁচজন ভোটারকে নিয়ে ও যখন গিয়ে বিশু সরকারের ক্যাম্পে ঢুকলো, বললুম, ব্যাপার কি, বন্ধু? বললে, না, না, এঁর এক আত্মীয় এসেছে বিশু সরকারের ক্যাম্পে, তাকে যদি চাটার্জী সাহেবের দিকে আন্‌তে পারি···

চতুর্থ ব্যক্তি কহিল—আমি প্রহার দিতে উঠেছিলুম, দিই নি পাছে মিষ্টার চাটার্জীর বদ নাম হয়, তাই। যে করে' সয়েছি, তা আমিই জানি···

ভক্তি ও নিষ্ঠার এমনি কাহিনী বলিয়া শেষে বলিল—ভাববেন না মিষ্টার চাটার্জী, সলিড্ ভোট্‌গুলো আপনাকে দিইয়েছি···দুটো দিন··· আপনিই রিটার্নড্ হবেন নির্ঘাৎ!